আমাব দিল্লি প্রবাস-জীবনের অন্যতম দীক্ষাগুরু
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক
ড. শিশিরকুমার দাশ-এর স্মৃতিতে

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থটি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশ থাকাকালীন লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংকলন। নিজের চিন্তাভাবনা ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের বক্তব্য নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে এই লেখাগুলিতে। এই ধরনের রচনা সংযোজিত ও পরিবর্ধিত হতে হতেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে অথবা আরও উৎকর্ষের অপেক্ষা রাখে।

এই গ্রন্থের কাজ করতে গিয়ে বহুজনের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হয়েছি। এঁদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অরুণকুমার বসুর কাছেই আমার ঋণ সর্বাধিক। তাঁর সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. মণিলাল খান, ড. মানস মজুমদার, ড. বিশ্বনাথ রায় এবং আরো অনেকের কাছেই আমি সম পরিমাণে ঋণী। যাঁরা কাছ থেকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা হলেন ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ড. জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, ড. নন্দিতা বসু, ড. অচ্যুত মণ্ডল, অধ্যাপিকা কল্পনা কীর্তি, ড. অজন্তা দত্ত এবং ড. সিমি মালহোত্রা। সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. অর্চনা বসু লেখাগুলি সংশোধন করে দিয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। নানা সময়ে অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভৌমিক যে সাহায্য করেছেন তা ভোলবার নয়।

সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় ড. শিশিরকুমার দাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে জানাই, তাঁর নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর তিরোধানের মর্মান্তিক বেদনাঘাত বক্ষে নিয়েই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

টেকনো গ্রাফিকের শ্রী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং পুস্তক বিপণির শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত এবং শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্যে করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র শ্রীমান সুশান্ত বিশ্বাস প্রুফ সংশোধন করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার মা শ্রীমতী কল্পা চৌধুরী, আমার স্বামী শ্রী অভীক বিন্দু ও আমার ছেলে শ্রীমান ঋজু---এঁদের সকলের শুভেচ্ছা ও সংস্পর্শ আমার এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত রইল। ধন্যবাদ দেবার সম্পর্ক না হলেও এঁদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। চেষ্টা করেও মুদ্রণপ্রমাদ রয়েই গেল, এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী! এই গ্রন্থের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়দায়িত্ব বিনীতচিত্তে বহন করছি।

অন্তরা চৌধুরী

সূচি

প্রাগাধুনিক বাংলা-সাহিত্য অন্বীক্ষা

চর্যাপদ

পূর্ব ভারতীয় নব্য আর্য ভাষাগুলির বিবর্তনের ইতিহাসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'চর্যাপুঁথির' আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ থেকে আরও তিনটি পুঁথির সঙ্গে (দুটি অপভ্রংশ ভাষায় দোহা এবং মিশ্রভাষায় রচিত একটি ডাকার্ণব) 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

'চর্যাপদ' ও 'দোহাকোষ' দুখানি পাওয়া গিয়েছিল নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থশালায়। প্রাচীন অনেক বাঙলা ও সংস্কৃত পুঁথি এই ভাণ্ডার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উদ্ধার করেন। বাঙলা ভাষার জন্মরহস্য নির্ণয়ে যার মূল্য অপরিসীম। চর্যাপদগুলিতে একদিকে যেমন বাঙলা ভাষার আদি রূপের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তেমনই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতির রহস্যময় ইতিবৃত্তটি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলার লোক-জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য ও সংস্কৃতির দিকটিও এর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

'চর্যাপদে'র মূল পুঁথিখানি ১৪ শতকের বলে অনুমান করা হয়। যদিও পুঁথিখানির প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু পদগুলি বেশ প্রাচীন। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে সঠিক কালনির্ণয় কখনোই সম্ভব নয় তাই চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে খ্রিস্টিয় ৭ম শতকের লেখা। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন—চর্যাগুলি অত প্রাচীন নয়, রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টিয় ৯৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' এক বিশেষ ধরনের রচনারীতি অনুসৃত হয়েছিল। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রকাশিত হবার পর থেকেই এর ভাষা বাংলা কিনা তা নিয়ে যে মতান্তর শুরু হয়েছিল তার সম্পূর্ণ নিরসন এখনও হয়নি। ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of Bengali language-এ ধ্বনি, ছন্দ, ব্যাকরণ আলোচনা করে চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলার যথাযথ নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেন। এ ভাষার বুনিয়াদ মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীন বাংলার উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও আদি বাংলায় তখনও শৌরসেনী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের প্রভাব রয়ে গেছে। এক রহস্যময় দুর্বোধ্য ভাষায় এর পদগুলি রচিত—এর নাম সন্ধ্যা ভাষা। যে ভাষা রহস্যময়, যা বুঝতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় এবং যার অর্থ সম্যক্ ধ্যানের দ্বারা বুঝতে হয়, তার নামই সন্ধ্যা ভাষা। প্রাচীন

ধর্মচর্চায় যখন গোপনীয়তার দরকার হত তখন গুরুরা এই সাঙ্কেতিক বচনের মাধ্যমে শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতেন। বৌদ্ধসহজিয়াদের সাধনপদ্ধতি তন্ত্রনির্ভর, তাই তন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা কায়িক ও বাচনিক গুহ্যতা রক্ষা করে চলতেন। তাই তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকথাকে ভিন্ন অর্থবহ্ শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ করতেন। তাই প্রতিটি শব্দের একটি বাহ্যিক বা লৌকিক এবং একটি গূঢ় বা পারিভাষিক অর্থ থাকতো। যেমন—

শব্দ (চর্যায় ব্যবহৃত)	লৌকিক অর্থ	গূঢ় অর্থ
হরিণা	হরিণ	চিত্ত
হরিণী	হরিণী	জ্ঞানমুদ্রা

বিষয়বস্তুর দিক থেকে চর্যাপদের দুটি রূপ—একদিকে বহিরঙ্গসম্বন্ধ স্থূল চিত্রকলা, অন্যদিকে গুহাচারী, ব্যাখ্যাতীত গুরুবাদী তত্ত্বকথা। গোপন গূঢ় তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে সিদ্ধাচার্যগণ কতগুলি বাহ্যিক প্রতীকের মোড়কে আবৃত করেছেন। এই জাতীয় রহস্যবাদী সম্প্রদায় কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্বের গহন-গভীরে নিমজ্জমান হননি, সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে একটি স্থূল দেহমার্গীয় চর্চাও অনুশীলিত হত। চর্যাপদ মূলতঃ সহজিয়া মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে মহাযান, হীনযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও নাথ সাহিত্যের প্রভাব আছে। এঁরা তত্ত্বকথা ব্যাখ্যাত করার জন্য যোগ ও তন্ত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও অদ্বৈতবাদী হওয়ার জন্য অন্য কোন মত স্বীকারে প্রবৃত্ত হননি। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব চর্যাপদে মহাসুখতত্ত্বে পরিণত। তাঁদের কাছে মুক্তিলাভের সহজ উপায় হল—'উজুবাট'—যার অর্থ হল সহজানন্দ বা মহাসুখ। এই মহাসুখ চিত্ততলেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই চিত্ত ভাব-বিকল্পের অতীত নির্বিকল্প—বোধিচিত্ত। এছাড়া চর্যাপদে সাধারণ ছোট-বড় মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের সরলসুন্দর, সহজ-স্বচ্ছ বর্ণনা রয়েছে। সাধারণতঃ ডোম-ডোম্বী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক ইত্যাদির কথা এখানে বলা হয়েছে। এরা দূরে টিলার ওপরে বাস করতো, ব্রাহ্মণরা এদের স্পর্শ করতো না।—

'নগর বাহিরেঁ রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়ি আ।'

—রে ডোম্বী, নগর বাইরে তোর ঘর, তুমি নেড়া ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ডোমদের জীবিকা ছিল তাঁতবোনা, চাঙারী বোনা, নৌকা বাওয়া। কাহ্নুপাদের একটি পর্যায়ে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার বর্ণনা আছে। মাংসের মধ্যে তাদের প্রিয় ছিল হরিণের মাংস। চর্যাপদে দেখা গেছে, সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নস্তরের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে স্পষ্টই বলা আছে—

'ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা
মোইনি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কন্তাখা পুনবন্তা।'

—গরম গরম ভাত কলাপাতায় ঢেলে গাওয়া ঘি, দুধ, মৌরলা মাছের ঝোল নালতে

শাক দিয়ে দানশীলা কান্তা পরিবেশন করছেন, আর পুণ্যবান স্বামী খাচ্ছেন। আমোদপ্রমোদের মধ্যে দাবাখেলার বিবরণ পাওয়া যায় ১২ নং পদটিতে। এছাড়া নৃত্যগীতের ব্যাপক প্রচলন যে ডোম্বীদের মধ্যে ছিল তার প্রমাণ নিম্নোক্ত পদটি—

'একসো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

—এক হয় পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি-অতে চড়ে নাচে ডোম্বী বাছা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মাদল; হেরুক-বীণাডমরু, একতারা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। স্থলযানের মধ্যে রথের ব্যবহাব দেখতে পাওয়া যায়। কঙ্কণ, বাজননূপুর ও মুক্তাহারের প্রচলন ছিল রমণীসমাজের মধ্যে। প্রাকৃত রমণীর বেশভূষার মধ্যে খোঁপায় ফুল, ময়ূরের পাখা, গলায় ফুলের মালা, ফুলের কর্ণাভরণ ব্যবহৃত হত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নানা ছবি চর্যায় আছে—নদীবিলের গহন জল, কাদায় মাখা তীর, প্রবল মাঝনদীতে এসে ভীত হওয়া—ইত্যাদি নানা ছবি চর্যাপদে পরম ভালবাসাব সঙ্গে চিত্রিত।

মহাসুখতত্ত্ব বা সহজানন্দকে প্রকাশ করতে গিয়ে চর্যাকারগণ বহুক্ষেত্রেই সহজানন্দকে নারীরূপে কল্পনা করেছেন। এই নারীরা বা প্রিয়ারা হলেন নীচবংশজাত। এঁরা হলেন ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী অথবা শবর। এদের অস্পৃশ্যা ও নীচ জাতীয়া বলে বর্ণনা করার কারণ আছে। সাধনার দ্বারা এই অপরিশুদ্ধা আনন্দরূপিণী রমণীগণকে পরিশুদ্ধা রূপে পেতে চান। সহজানন্দ বা মহাসুখলীলায় মগ্ন থাকা চর্যাকারগণের মূল লক্ষ্য। সেইজন্য চর্যার অধিকাংশ পদে এই মহাসুখের কথা বারে বারে এসে গেছে। এই মহাসুখ চিত্তস্থলেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই চিত্তভাব বিকল্পের অতীত—এ এক নির্বিকল্প বোধিচিত্ত। গুহ্য সাধনতত্ত্বের আধারে গ্রথিত চর্যাপদগুলির গুরুমুখী জ্ঞান। তাই গুরুর নিকট থেকে না জানলে যে কেউ এসব পদের অর্থ বুঝবে না তাও তাঁদের কথায় স্পষ্ট। সেই তান্ত্রিক যোগসাধনার সারাংশ হল :— চিত্তের সঙ্গে বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ও সমস্ত ভেদ জ্ঞান বিলুপ্ত করে মনকে শূন্যতাবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শূন্যতাবোধের সঙ্গে সমদর্শিতর জন্য করুণার (দেবী) সংযোগ হলে চিত্ত নিধান লাভ করবে। নির্বাণের মধ্যে দিয়ে এক মহাসুখের গভীরতায় চিত্ত বিলীন হবে।

চর্যাপদে শুধু গূঢ় সাধনতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা নয়। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে গভীর মানবিক আবেদন ও মনোবম কাব্য সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। চর্যাপদ বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও পরম রহস্যময় জগৎ ও জীবনের কথা চর্যাকারগণ ভুলে যাননি। সেইজন্য চর্যাপদের মধ্যে একটা কাব্যিক আবেদন, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক অনুভূতি ও সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশও আমবা লক্ষ্য কবি। সাধনমার্গের কঠিন কথা অতিক্রম করে চর্যাপদ আমাদের মনে নিবিড় রসানুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়। একথা ঠিক যে চর্যাপদকর্তাগণ সচেতনভাবে কাব্য রচনায ব্রতী হননি তবুও তাঁদের মধ্যে যে অনেকেরই অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃত অর্থে চর্যা কবিরাই বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি। ধর্মের নিষ্প্রাণ

তত্ত্বকে তাঁরা কাব্যরসের স্পর্শে সজীব করে তুলেছেন। শুধু তত্ত্বের কঠিনতা নয়—সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনে ভরপুর বৈচিত্র্যময় জগৎ ও জীবন চর্যাকরগণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। তাঁরা শুধু ধর্মের তত্ত্বকে প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি, তাঁরা আমাদের মানবরসের অমৃতসাগবে পৌঁছে দিয়েছেন। শবরপাদেব একটি পদে এই কথাটি স্পষ্ট হবে—

'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরীবালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছু পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জুরি মালী।।
উমত্ত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।'

অথবা-এইপদটিতে—

'গুরুবাক্ পুঞ্চিআ বিন্ধ নিঅমণে বাণে
একে মবসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পবম নিবাণে।
উমত সবরো গরুআ বোযে।
গিবিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।'

এই পদটিতে একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি কবা হয়েছে। জনবসতি থেকে দূরে নির্জন পর্বত চূড়ায শবর শবরীর উদ্দাম প্রণয়লীলা ব্যক্ত করা হয়েছে। ময়ূরের পুচ্ছ পবিধান করে, গলায় গুঞ্জুর ফুলেব মালা দুলিয়ে শবরী শবরকে আকর্ষণ করত। ঘরের খাটিয়া ছিল তাদের মিলনশয্যা। পত্রে পুষ্পে গাছগুলো তখন ভরে যেতো। তাম্বুল-কুঙ্কুম-কর্পূর-এই আসঙ্গ লিপ্সাকে করে তুলতো আরও প্রবল, আরও নিবিড়। আবার এক সময়ে ক্রোধপরায়ণ শবব পর্বত কন্দর ছেড়ে চলে যেত অনেক দূরে। তখন বিষণ্ণা শবরী তাকে একা একা খুঁজে বেড়াত।

তত্ত্ব বিমুক্ত করে এই পদকে উপলব্ধি করতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়না। বস্তুত এই পদটি এক বোমান্টিক প্রেমভাবনার জগতে আমাদের নিয়ে যায। মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমলীলার মধুব আস্বাদ বহন কবে নিয়ে এসেছে এই শবব-শবরী।

'কঙ্গুচিনা পাকেলা বে শবব শবরি মাতেলা।
অণুদিন সবরো কিংপি ন চেবই মহাসুঁহে ভেলা।
চাবিবাসে গড়িলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো দাহ কএলা কান্দল শিআলী।'

—এই পদটিব তত্ত্বকথা ছেড়ে দিলে আমবা দেখি জ্যোৎস্নালোকিত কার্পাসফুল বেষ্টিত উঁচু পাহাড়ে ছিল শবব-শববীদের আবাসস্থল। কঙ্গুচিনা পাকলে তারা আনন্দে মেতে উঠত। বাঁশেব কঞ্চি দিয়ে তারা শস্য রক্ষা করত—কারণ মাঠে ছিল শিয়াল-শকুনের উপদ্রব। কাকনীর দানা থেকে তৈবী পানীয়তে তারা মত্ত হয়ে উঠত।

'টালত মোর ঘব নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীতে ভাত নাঁহি নিতি আবেশী'।

—পদটিতে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য যাই থাক না কেন—দাবিদ্র্যলাঞ্ছিত বিড়ম্বিত

জীবনের মর্মন্তুদ ছবি আমাদের মানসপটে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হয়ে যায়। আসল কথা চর্যাকারগণ নিজেদেব সাধনতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে উপমা সঞ্চয় করেছেন প্রান্তীয় সমাজের বাস্তব জীবন থেকে। বস্তুত সাধনমার্গের উত্তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করলেও মাটির কথা, বাস্তবজীবনের কথা একবারও ভুলে যাননি। মর্ত্য জীবনের পথ ধরেই তাঁবা অমর্ত্য জীবনে প্রবেশ কবতে চেয়েছেন। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'—এই তীক্ষ্ণ বাস্তব জীবন সত্য তারা আপন অভিজ্ঞতা দিয়েই অর্জন করেছেন। বস্তুতঃ এই পংক্তিটি প্রবাদ-বাক্যের মতো আজও আমাদের মনে চমক সৃষ্টি করে।

কোথাও কোথাও পদকর্তাগণ আরও বাস্তবজীবনের কাছাকাছি এসেছেন। রাতে বধূ ঘুমিয়ে আছে, সেই অবসরে চোর এসে তার কর্ণভূষণ চুরি করে নিয়ে গেল (কানেট চৌরে নিল কা গই মাগ অ)। শ্বশুর ঘুমে অচেতন কিন্তু বধূ ভাবনাচিন্তায় জেগে আছে কাবণ পরদিন সকালেই তাকে আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা শুনতে হবে। ভীত বিহ্বলা রমণীর শঙ্কাকুল চিত্তের নীরব বেদনা তত্ত্বের মাঝখানে মানবিক আবেদনকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যাকারগণ কোথাও বাস্তবজীবনের নিবিড় চিত্র এঁকেছেন, কোথাও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের দুর্বিষহ বেদনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আবার কোথাও বাধাহীন মুক্ত জীবনের অনাবিল আনন্দকে প্রকাশ করেছেন। তাদের আবেদন সুখ-দুঃখে মিশ্রিত বৃহত্তর জীবনেব মানব-সমাজের কাছে। জীবনের গভীর বাণী তারাও শোনাতে চেয়েছেন, জীবনের আনন্দ তারাও উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। জীবনপ্রান্তরে মুক্তির গান তারাও গাইতে চেয়েছেন। আর চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বা মানবিক আবেদন এইখানেই নিহিত।

সাহিত্য সমাজ-জীবনের পরিচয় বহন করে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই একটা বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা ফুটে ওঠে। ফলে যে-কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সমাজজীবনের ছায়া পড়তে বাধ্য। ফলে সকল যুগেব সকল সাহিত্যে আমরা সমাজজীবনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি। চর্যাপদেও আমরা হাজার বছর আগেকার প্রাচীন বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতির পরিচয় নানাভাবে লাভ করি। তবে চর্যাপদে বর্ণিত সমাজচিত্র আলোচনা করার আগে তৎকালীন বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধাবণা করে নেওয়া উচিত। চর্যাপদের মধ্যে যে বাঙলাদেশের ছবি আছে তা বর্তমান বাঙলাদেশ ছাড়াও বিহাব ও উড়িয্যার কিছু অংশ, এমনকি আসামের বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত। এই সত্য অস্বীকার কবলে চর্যাপদ সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

চর্যাপদের বহু পদে যেভাবে নদ-নদী খাল-বিলের উল্লেখ আছে তা কেবল নদীমাতৃক বাঙলা দেশেব ছবিই নয় আমাদের গোটা পূর্বভারতের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'ভবনই গহন গম্ভীরা বেঁগে বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে না থাহী।'

উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল নদীব মাঝখানে জাল ফেলে জেলেরা বসে থাকে। জালে হঠাৎ মাছ পড়লে জাল টেনে মাছ তুলতে হয়।

'বাম দাহিন মো খাল বিখলা।
সরহ ভনই বপা উছুবাটি ভইলা।।'

দু-একটি পদে চৌর্যবৃত্তি ও চোর ডাকাতের কথার উল্লেখ আছে। এই চৌর্যবৃত্তিব জন্য বাসগৃহে প্রহরার ব্যবস্থা থাকত।

'সুন বাহ তথতা পহারী
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী।'

সেযুগে বিবাহ উৎসব ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদের একটি পদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে—

'ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম।'

বিবাহে যে যৌতুক গ্রহণ করা হতো উপরোক্ত পদে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এমনকি ভাল যৌতুক পেলে নীচু বর্ণেব মেয়েকে বিবাহ করতেও আপত্তি থাকত না। কাহ্নপাদের পদটি পাঠ করলে জানা যায় যে ডোম্বীকে বিবাহ করে বর অত্যন্ত খুশী কারণ ভাল যৌতুক হস্তগত হয়েছে।

দাবাখেলা তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কাহ্নপাদের লেখা ১২ নং পদে এই দাবাখেলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শুঁড়ি বাড়ী ও মদের ব্যবসা তখন প্রচলিত ছিল। বিরুআপাদের একটি পদে আছে—

'এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চাঅন বাকলঅ বোরুণী বান্ধঅ।'

দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে তৎকালীন সমাজ-জীবন ছিল জর্জরিত। হতাশা দুঃখবেদনার মধ্যে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষেরা কোনোক্রমে জীবিকা নির্বাহ করত।

আমাদের মনে রাখতে হবে চর্যাপদগুলি লিখিত হয়েছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে। ফলে সামাজিক বৈষম্য, ব্যভিচাব, নিম্নশ্রেণীর মানুষের বঞ্চনা ও হাহাকারে স্বাভাবিক ছিল। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিশেষ এক ধরনের ধর্মীয় চেতনার দ্বারা চালিত হলেও চর্যাকারগণ বাস্তব জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন ফলে তাঁদের কাব্যে সমকালীন যুগেব সমাজচিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

চর্যাপদের রূপকর্মেও কবিকৃতির সাক্ষর বিদ্যমান। ছন্দ-অলঙ্কার-এর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। চর্যাপ ছন্দে অপভ্রংশ অবহট্টের কিছু প্রাধান্য আছে। আবার এই ছন্দে পাদাকুলকের সুরও অনুভব করা যায়। অনেকের মতে পাদাকুলকের সুর থেকে পরবর্তীকালে পয়ার ছন্দের জন্ম। চর্যার অধিকাংশ পদে দুটি পর্ব আছে এবং প্রতি পর্বে আট মাত্রা করে মোট ষোড়শমাত্রারূপে বিন্যস্ত হয়েছে। এই ষোড়শমাত্রা যে সবক্ষেত্রে

অনুসরণ করা হয়েছে তা নয়, তবে এটাও লক্ষণীয় চর্যার অধিকাংশ পদ ষোড়শমাত্রার পাদাকুলক ছন্দের থেকে যেন চতুর্দশমাত্রিক পয়ার ছন্দের দিকেই বেশি ঝুঁকে রয়েছে। পদকর্তাগণ তাঁদের পদে ছন্দের নিয়মরক্ষার দিকে বেশি জোর দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। তবুও চর্যাপদেই যে পয়ার ও ত্রিপদীর প্রথম বার্তাবহী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিপদীর লক্ষণ নিম্নোক্ত পদটির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি—

'বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাপ এঁ জাইব পুণু জিনউরা।'

অলঙ্কারপ্রয়োগেও চর্যাপদকারগণ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপপরিমার্জনের সাহায্যে তাঁরা ধর্মমহিমাকে ব্যক্ত করেছেন। নিগূঢ় তত্ত্বকথাকে অলংকার রূপকেব সাহায্যে সহজবোধ্য করে, সর্বজনবোধ্য করে তোলবাব চেষ্টা করেছেন বলেই ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে চর্যাপদ সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। চর্যার প্রতিটি পদেই প্রায় উপমা ও রূপক অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। একটি পদে কায়াকে তরুবরেব সঙ্গে, দ্বিতীয় পদে নৈরাত্মাকে সাধকের বধূ হিসাবে, চতুর্থ পদে মুখচুম্বনকে কমলরস পান করার সঙ্গে, পঞ্চম পদে ভবকে প্রবাহিত নদীর সঙ্গে (ভবনই গহন গম্ভীর বেঁগে বাহী), ষষ্ঠপদে চঞ্চল চিত্তকে দ্রুতগামী হরিণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

চর্যাকারগণ যেহেতু 'সন্ধ্যাভাষা' অর্থাৎ সংকেতময় হেঁয়ালীভাষায় তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন সেইজন্য তাঁদের পদে কয়েকটি বিরোধাভাষ অলঙ্কারের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। (যেমন 'বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে')—বলদ প্রসব করল এবং গাভী বন্ধ্যা হলো।

চর্যাপদের কয়েকটি পদ প্রবাদবাক্যের মর্যাদালাভ করেছে। এই চরণগুলি আজও আমাদেব মনকে নাড়া দেয়। ১. অপণা মাংসে হরিণা বৈরী ২. কামে জাম কি জামে কাম ৩. জইসো জাম মবণ বি তইসো ৪. দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ।

চর্যাপদের ভাষাকে বাঙলাভাষার আদিমতম নিদর্শনরূপে স্বীকার কবা হয়। অবশ্য প্রাচীন বাঙলায় চর্যাপদ রচিত হলেও এর মধ্যে কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ ও দু-চারটি ওড়িয়া মৈথেলী শব্দও দৃষ্ট হয। এজন্য এর ভাষাকে 'প্রত্ন বাংলা' বলা হয়।

চর্যাপদে ব্যবহৃত স্ববর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-এর ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাঙলার মতই। বাঙলা ভাষার গঠনপ্রণালী বাগ্‌ভঙ্গী ও ক্রিয়াপদের গঠনও বাঙলার মত। অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়াযোগে অথবা বিশেষ্য-বিশেষণ পদের ব্যবহার নিঃসন্দেহে বাঙলাভাষাকে নির্দেশ করে। চর্যাপদের প্রায় সাড়ে ছেচল্লিশটি গানে বিভক্তি প্রত্যয়াদিসহ শব্দসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তার মধ্যে তৎসম-অর্ধতৎসম শব্দ প্রায় সাড়ে তিন'শ ও দেশী শব্দ দেড়'শ-র কাছাকাছি। অপভ্রংশ শব্দ তিনশ'র ওপর, বাকী সবই তদ্ভব উপাদান। তদ্ভব উপাদানই খাঁটি বাঙলা। অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দগুলিও এদেশের নিজস্ব সম্পদ। এই উপাদানগুলির মধ্যে বাঙলার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, বিভক্তি-প্রত্যয় এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যে সেগুলি বাঙলা ভিন্ন অন্য ভাষা হওয়া অসম্ভব। মোটের ওপর চর্যাপদে ব্যবহৃত ভাষার বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি পরিস্ফুট হবে যে, যে উৎস থেকেই এর

উপকরণ গৃহীত হোক্ না কেন প্রয়োগ ও আকৃতিতে তা বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। চর্যাপদের ভাষায় সদ্য বিকাশোন্মুখ বাঙলাভাষার অবয়ব ফুটে উঠেছে।

'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'-এর যে খণ্ডিত পুঁথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন তাতে ৪৬টি গোটাগান ও একটি গানের ভগ্নাংশ আছে। অধিকাংশ গানেই কবির নামান্বিত ভণিতা আছে, কয়েকটিতে মাত্র নেই। মূলগানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত আছে তাতে মোট ২৩জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

লুইপাদ—চর্যাপদ সংগ্রহের প্রথম কবি লুই। শুধু পদসংখ্যায় নয় তিব্বতি ঐতিহ্যে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় লুই তাদের অন্যতম। লুইয়ের দুটি গানেই (১,২৯) কোথাও যৌনতান্ত্রিকতার আভাস নেই। দুটি গানেই যোগ সাধনার মাধ্যমে অনির্বচনীয় নির্বিকল্প মহাসুখ তন্ময়তার অন্বেষণকে সাধ্যাতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জপ-তপের-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্তে গুরুনির্দিষ্ট যোগমার্গের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে।

কাহ্নপাদ—চর্যাপদ সংগ্রহের দিক থেকে কাহ্নের রচনা সর্বাধিক। কাহ্নপাদের গীতে কবিত্ব আছে, নাটকীয়তাও বর্তমান। ছোটগল্পের দীপ্তি ও লোকচরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর পদে পাওয়া যায়। মোট তেরটি চর্যার মধ্যে ১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬ ও ৪২ সংখ্যক চর্যাকার কাহ্নের পরিচয় একরকম, আবার ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০ ও ৪৫ চর্যায় কাহ্নের পরিচয় অন্যরকম, শেষোক্ত ৭টিতে যৌনতান্ত্রিকতার ইঙ্গিত নেই। অবশ্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য আছে।

সরহপাদ ও ভুসুকু—সরহের পদে সহজসাধনার কথা আছে। ২২ সংখ্যক গানে অচিন্ত্যযোগীর জন্মমরণ—ছেদের কথা, ৩২ সংখ্যক গানে বাহ্য উপকরণ ও জপতপের পরিবর্তে সাধকের সহজপন্থী আত্মজ্ঞান লাভের কথা, ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক পদে সাধকের পক্ষে গুরুর ওপর নির্ভরশীলতা ও সহজপথ অবলম্বনের নির্দেশ আছে।

ভুসুকুর ৮টি গানের মধ্যে ২টি গানে (৪, ৪৩) কবি নিজেকে 'রাউত' বলেছেন। রাউথের মূল রাজপুত্র > রাঅউত্ত > রাউত অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশ। ৬ ও ২৩ সংখ্যক গানে হরিণ শিকার ও ৪৯ সংখ্যক পদে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনের যে রূপক গৃহীত হয়েছে তাতে তাঁর 'রাউত' বৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ভুসুকুর পদের বৈশিষ্ট্য সাঙ্কেতিক রূপকচিত্রের বাহুল্য। এই রূপক চিত্রগুলিতে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে চর্যাপদের ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসিক পাঠকের কাছে তার মূল্য কম নয়।

চর্যাপদগুলি যদিও বিশেষ সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মসঙ্গীত তথাপি এই গানগুলিতে ব্যক্তিগত অনুভবের রসচেতনায় নিবিড় শিল্পকৌশল পরিলক্ষিত হয়। তাই কাব্য হিসেবে এদের স্বীকৃতি আছে। শান্তরসই এই গানগুলির প্রধান রস। কিন্তু এই শান্তরসের সঙ্গে রয়েছে করুণ, হাস্য, শৃঙ্গার ও মধুর রসের উজ্জ্বলচিত্র। চর্যার কয়েকটি পদে করুণরসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ২০ সংখ্যক পদে এক প্রসূতি নারীর মর্মবেদনা হাহাকারে ও দীর্ঘশ্বাসে করুণ হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে ৩৩ সংখ্যক চর্যায় পাওয়া যায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট গৃহিণীর বিড়ম্বিত জীবনের পরিচয়।

চর্যাপদে অদ্ভুত ও হাস্যরসের পদও বর্তমান। 'জোজো' চোর সোই সাধু', 'নিতি নিতি

খিআলা সিহে সহ খুঝঅ'—প্রভৃতি বিপরীত ভাষণ বিস্ময়বোধের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যবসের অবতারণা করে। সুতরাং হাস্যের দীপ্তিতে, বিস্ময়ের চমক সৃষ্টিতে, করুণরসের উদ্বোধনে ও শৃঙ্গারের দ্যোতনায় চর্যাপদগুলি রসমধুর।

চর্যাপদের রূপ ও ছন্দবৈচিত্র্য অলঙ্করণের আর একদিক। রাগ ও ছন্দের যোজনায় সাধকদের প্রযুক্ত মন ও বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে কাব্যকবিতায় প্রধান বিচার্য বিষয় হলো মানবজীবন। জীবনরসে পূর্ণ রচনাই কাব্য। এদেশের ধর্ম সাহিত্যে জীবনকে অস্বীকাব করা হয়নি। তত্ত্বপ্রধান হলেও চর্যাব তত্ত্ব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনের প্রেম -আনন্দ-বেদনা-আশা নৈরাশ্যের সংবেদন চর্যাপদে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। চর্যাপদ সাধারণ জীবনের মর্মকেন্দ্রে কবির দৃষ্টি সংস্থাপিত। একদিকে শিকারীর জীবন, শুঁড়িনীব বৃত্তি, সাঁকো নির্মাণের পদ্ধতি সবই বর্তমান, অপরদিকে সাধক কবিদের সংবেদনশীল মনের সম্মুখে ব্যক্তিক আশা-নিরাশা, ক্ষোভ-দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

তাই স্বীকার করতেই হয় যে প্রাচীন বাঙলার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-মূলক সাধন পদ্ধতির রূপকর্মে রূপায়িত হয়েও চর্যাপদগুলি গ্রাম্যভাষার সংকলনে, কাব্যশোভাময় অলঙ্কার যোজনায়, ছন্দেব বৈচিত্র্যময়তায়, জীবনবস-বসায়নে—চর্যাপদের কাব্যমূল্য বর্তমান এবং একই সঙ্গে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের ঊষালগ্নের প্রথম পথ প্রদর্শক রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।।

এই বস্তুময় অথচ কাব্যমধুর চিত্রগুলি ধর্মের উপাদান, অথচ কাব্যের সামগ্রী। তাই বাংলা কাব্যে কাব্যের উপাদান হিসাবে বাস্তবতার প্রথম উদ্বোধন ঘটে চর্যাপদে। তাই চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। সিদ্ধাচার্যগণ শুধু অলঙ্কার প্রয়োগেই সফল হননি, রসসৃষ্টির দিকেও তাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন। কাহ্নপাদেব অনেক চর্যায় করুণরস বিরহ বা না পাওয়াব বেদনাকে অবলম্বন করে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে—দর্শন ও ধর্মের অনুভূতি পার হয়েও এই ক্রন্দনে আমাদেব মন গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে। এই ভাবসংবেদ্য রসমণ্ডিত কাব্যস্রোত না থাকলে চর্যাপদেব কোন মূল্যই থাকতো না।

আচার্যগণের সুনিপুণ শব্দপ্রয়োগ আমাদের বিস্ময়ীভূত করে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ। সাহিত্যমূল্য বিচারে সবচেয়ে বড় মাপকাঠি পাঠকের অনুভূতি। যদিও ভাষা, ছন্দ ত্রুটিমুক্ত নয়, তবু সুষ্ঠুসুন্দব কাব্য হিসেবে চর্যাপদ প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ, এতে আছে সুগভীর মানবতাবোধেব নির্মল অনুভূতিপ্রবণ নির্ঝর এবং প্রেমভক্তির সমন্বয়েই তার সাহিত্যমূল্য। বাংলা কাব্যেব আদিলগ্নে এই অপূর্ব সমন্বয়েব সূচনাই বাংলা গীতিকবিতার মুক্তির দূত। চর্যাপদ সেই দিক দিয়ে একটি অমূল্য সৃষ্টি। ধর্ম তথা সহজ-সাধন পদ্ধতিই ছিল চর্যার কবিদের উপপাদ্য বিষয়। রচনায় যেমন আছে ধাঁধা জাতীয় ছড়া এবং প্রবাদবাক্য, তেমনই আছে পরবর্তীকালেব বহুল প্রচলিত পদাবলী বা খণ্ড কবিতার পূর্বাভাস। ড. সুকুমাব সেন যথার্থই বলেছেন,

'চর্যাপদগুলি বাংলা পদাবলীর পূর্বরূপ। পদাবলীব মত এতেও রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে এবং কবির ভণিতা আছে। ভাবের দিক দিয়ে বিচাব করলে বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধকদেব রাগাত্মিক-পদের সঙ্গে চর্যাপদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলা সমাজ ও সাহিত্য

বাঙালির 'সাহিত্য-ইতিহাস' এক অর্থে তার সামগিক ইতিহাসেরই পরিচযকে খুঁজে পাবার বৃহত্তম উপকরণ। আমাদের ইতিহাসের উপকরণের স্বল্পতার কারণে বাঙলার ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করা খুবই দুরূহ। তাই সেই দায়িত্ব মূলতঃ এসে পড়ে আমাদের সাহিত্যের বিশাল সম্ভারের উপব। সমালোচক লর্ড চেস্টারফিল্ডের মতে 'History is a confused heap of fact' অর্থাৎ ইতিহাস হল 'নীরস তথ্যের সম্ভার'। আর সাহিত্য হল তথ্য ও তত্ত্বের নির্ভরতায় সৃষ্ট এক অভিনব রসের আধার। সমাজ গড়ে ওঠে ইতিহাসের কঠিন নির্দেশে, অমোঘ নিয়মে। আর এই সমাজের ও জীবনের কাহিনী ফুটে ওঠে সাহিত্যে। অর্থাৎ সাহিত্য হল সমাজ ও জীবনের দর্পণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইতিহাস যেখানে নীরব, সাহিত্য সেখানে স্পষ্ট-অস্পষ্ট দিকনির্দেশকে অবলম্বন করে আমাদের ইতিহাসকে বোঝাবাব চেষ্টা করে অর্থাৎ সাহিত্য সেখানে ইতিহাসের দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেরই এক অবধারিত বহিঃপ্রকাশ। তুর্কীজাতীয় খিলজিরা মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চলের মূল অধিবাসী তা জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনোমোহন ঘোষ মন্তব্য করেছেন—'দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে তাহারা যে মঙ্গোলিয়ার দিক হইতে রওনা হইয়া সুদীর্ঘ পথ অতিবাহনান্তে হঠাৎ এক দুর্গ্রহের মতো মুস্লিম-অধ্যুষিত খোরাসান, সিইস্তান ও আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়া সেই সেই অঞ্চলে বলপূর্বক বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।' তবে তুর্কী আক্রমণের পরিণতিতে বাংলার সামাজিক জীবনের ভারসাম্য পরিবর্তন হতে শুরু করে, তার প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও পড়েছিল অনিবার্যভাবেই। শুরু হয় বাংলাদেশের 'মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। যার ব্যাপ্তি ছিল পাঠান শাসনকাল থেকে শুরু করে মুঘল শাসনের অন্তিম মুহূর্তের (১৭৫৭) কিছুকাল পরে পর্যন্ত। সুতরাং বলা যায় মুসলমান আমলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল এবং ইংরেজ আমলের অব্যবহিত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—'পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় জীবন ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং আধুনিক যুগের আভাস দেখা দিল। বাংলাদেশের মধ্যযুগ এবং বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ প্রায় সমান্তরাল রেখায় বহিয়া গিয়াছে।'

লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর এবং প্রায় ২০ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শেষ বয়সে রাজ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লবের

সূচনা দেখা দেয়। ১১৯৬ সালের এক তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ডোম্মনপাল নামে এক ব্যক্তি সুন্দরবনের খাড়ী পবগণায় বিদ্রোহী হয়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় আর্যাবর্তের বিষম বিপদ উপস্থিত হয়েছিল, তুরস্কজাতীয় ঘোর অধিপতি মহম্মদ ঘোরী, চৌহান পৃথ্বীরাজ ও গাহড়বাল জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। আর্যাবর্তের প্রসিদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলোও একে একে বিজেতা তুর্কীদের পদানত হয়। ক্রমে তুর্কীরা যুক্তপ্রদেশ অধিকার করে মগধের সীমান্তে উপনীত হয়।

এই দুর্দিনে লক্ষ্মণসেন নিজের রাজ্য রক্ষা করার কি উদ্যোগ করেছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই কারণ এই যুগের কোন বিবরণই পাওয়া যায় নি। এর অর্ধশতাব্দী পরে তুর্কী বিজেতার এক সভাসদ ঐতিহাসিক 'মীনহাজুদ্দিন সিরাজ' লোকমুখে সেনরাজ্য জয়েব যে কাহিনী শুনেছিলেন তা অবলম্বন করে তাঁব 'তবকাৎ-ই-নাসিবী' গ্রন্থে এই যুদ্ধেব এক বর্ণনা কবেছেন তাতে জানা যায়, ১৭ জন তুরস্ক অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষ বলে হতশ্রদ্ধা করা হয়েছে। সংখ্যায় প্রচুর না হয়েও তুর্কীদের বিনাবাধায় বাংলা দখলের পিছনে অধ্যাপক সুকুমার সেন যে কারণগুলো দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে প্রত্যন্ত দেশ বলে বাঙ্গালা চিবকাল কেন্দ্রীয় ভারতবর্ষের রাজপথ থেকে দূরে ছিল। উত্তরাপথে তুর্কী অভিযান শুরু হলেও অনেকদিন পর্যন্ত তা পল্লীবাসী নিশ্চিন্ত বাঙ্গালীর শ্রুতিপথে আসে নি, অথবা কর্ণগোচর হলেও ভীতি উৎপাদন করে নি। কাবণ এর আগে বাঙ্গালা দেশে কোন বিদেশী শক্তিব ব্যাপক আক্রমণ হয় নি। উত্তরাপথে গ্রীক, শক, হুণ অভিযান হলেও তার ঢেউ বাংলায় পৌঁছায় নি। সেই জন্য এই আকস্মিক আঘাতে দেশের চিত্ত যেন এক মুহূর্তে বিমূঢ় হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণটি হল সেকশুভোদয়াব কাহিনী কিছুও যদি সত্য হয় তবে এক ইসলাম ধর্মপ্রচারক লক্ষ্মণসেনের সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে তুর্কী অভিযানকারীদের পথ পরিষ্কার করে রেখেছিল।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়াব খিলজির সময় থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর বঙ্গে আফগান প্রাধান্য ছিল। এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণদান করেছিলেন। তার মধ্যে কেউ সিংহাসনে আরোহণ করে আটদিনের মধ্যে কেউ বা তিনমাস, কেউ বা একবছর পরেই নিহত হয়েছিলেন। যদিও মহম্মদ ইবন বক্তিয়াবের আগমন থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 'পাঠানযুগ' নামে মূলতঃ পরিচিতি লাভ করে, তবে এই যুগের রাজারা সকলেই আফগান ছিলেন না। কেউ বা আরবদেশের, কেউ বা খোজা, কেউ হাবসী আবার কেউ হিন্দু। সুতরাং এই সময়টাকে 'পাঠান প্রাধান্যের যুগ' বলা যেতে পারে।

তুর্কী আক্রমণের সময়কার সামাজিক অবস্থা ছিল প্রথমে 'জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি', পরে 'বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি', আবও পরে বিশেষভাবে গুপ্ত আমলে 'পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি' বাংলাদেশে বিস্তাব লাভ করে। এই সকল বিভিন্ন রাজশক্তির বিপর্যয় এবং

পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে ধর্ম বিশেষের আনুষঙ্গিক বিপর্যয় ও অভ্যুদয় ঘটেছে সাধারণভাবে, কিন্তু প্রাথমিক আর্যীকরণ পদ্ধতির শেষে ঐ সকল ধর্মচেতনা কিংবা সামাজিক বিন্যাস পদ্ধতি বাঙালী সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল না। এদিক থেকে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক, ধর্মগত এবং সাংস্কৃতিক জীবন বিবর্তন সামগ্রিক আকারে দেখা দেয় নি কখনও। সেনরাজ বংশের শাসন-ছত্রতলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানে নব-কৌলীন্যবোধের যে কড়াকড়ি দেখা দিয়েছিল তাতে পাল যুগের সুসংস্থিত সমাজ ব্যবস্থা পীড়িত হলেও স্তব্ধ হতে পারে নি। অন্যদিকে ধর্ম-সংস্কৃতি রাজ-শক্তিব আশ্রয় গ্রহণ করায়, এই সব বিপর্যয়, পরিবর্তন অনেকটা পরিমাণে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনা উচ্চশ্রেণীর চিন্তা ভাবনা থেকে মূলতঃ পৃথক ছিল। গুপ্তশাসনের সময় থেকে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপনের শুরু থেকে এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুটি স্তর দেখা গিয়েছিল—নবীন (অর্থাৎ শিষ্ট) এবং প্রবীণ (অর্থাৎ দেশীয়)। উভয় স্তরের মধ্যে বৈবাহিক মিলন মিশ্রণ এবং আচার ব্যবহার চলতে থাকলেও, আভিজাত্যে, সমৃদ্ধিতে এবং শিক্ষাসংস্কৃতিতে এই দুই স্তরের পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। নবীন স্তরের ব্রাহ্মণরা ও তার শিষ্য-ভৃত্যরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী আর প্রবীণ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণরা ছিলেন প্রাকৃতাশ্রয়ী, ও কোন একটা নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকে জৈন, বৌদ্ধ অথবা যোগপন্থী ছিলেন। এই দুই স্তরের দেবতা যখন এক হয়ে আসছিল তখনও সেই দেবচরিত্রে নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট ভাবধারা দুটি পাশাপাশি ছিল। নবীন-প্রবীণের এই সংস্কৃতিগত, ধর্ম-বিশ্বাসগত, আচার ব্যবহাবগত ও ভাবধাবাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতিতে বিলুপ্ত হয়ে একটা অখণ্ড বাঙ্গালীজাতি গড়ে ওঠার অন্তরায় ছিল একটা প্রধান বস্তুর অভাব তা হল বাইরের আঘাত বা তৃতীয়পক্ষের সংঘাত। বাঙলাদেশের দুই স্তরের মিলনের জন্য তুর্কী অভিযানের মত এক আকস্মিক সংঘর্ষেব আবশ্যক ছিল। কাজেই এই আক্রমণ প্রত্যক্ষভাবে বাংলার যুগ-প্রাচীন জীবন ব্যবস্থায় ধ্বংসাত্মক আঘাতই করেছিল তা নয় এই আঘাত দীর্ঘদিনের নিশ্চিত সুখ-শয্যাশায়ী জাতির জড়তা বিদীর্ণ করে তাদের অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত এবং তীব্র করে তুলেছিল। আব এই আকাঙ্ক্ষা সম্ভূত সাধনাবই ফলে বাঙলাব জাতীয় জীবন নূতন যুগের আলোক প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল। এই অর্থেই তুর্কী আক্রমণ বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, তথা জাতীয় জীবনের মধ্যযুগ সূচনা এবং সম্ভাবনার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

মুসলমান শক্তির বিজযলাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশে সঙ্ঘশক্তির অভাব, পাল রাজত্বের শেষ দিক থেকে বাঙলাদেশের গণশক্তি ধীরে ধীবে সঙ্ঘবদ্ধতা হারাচ্ছিল। তাব উপর বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেনের সুশাসনে দণ্ডশক্তিও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। সাম্রাজ্যের বলাধিকৃতেরা অস্ত্রে-শস্ত্রে, যুদ্ধ বিদ্যায় ও রণনীতিতে গতানুগতিকতাই স্বীকার করে আসছিলেন, তাতে যে কালানুযায়ী পরিবর্তন আবশ্যক তা অনুধাবন করেন নি। সর্বোপবি আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা আধিদৈবিক মন্ত্রবলেব উপর ক্রমবর্ধমান আস্থা জনগণমানসে জড়তার মোহ বিস্তার করেছিল।

পূর্বভাবতে ইসলামধর্ম প্রচাবে শুধু শাসক সম্রাটরাই বলপ্রয়োগ করে তা কার্যকরী

করেন নি, পীরফকিররা, দরবেশ সম্প্রদায়ের সহায়তায় হিন্দু ভূস্বামীদের ধ্বংস বা ধর্মান্তরিত করে মুসলমান ধর্মপ্রচার করেন। যারা হিন্দু সমাজের কাছে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, হিন্দুসমাজে যারা 'অধম সঙ্কর' বলে নিন্দিত ছিলেন অর্থাৎ—চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো প্রভৃতি অন্ত্যজরা—বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শের সঙ্গে এদের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। এই শ্রেণীর পক্ষে ইসলামের নব-মানবতার বাণী উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। উপরন্তু হিন্দু সমাজে অশ্রদ্ধেয় 'পাষণ্ডী' বৌদ্ধরাও নানাদিক থেকে ততই নিপীড়িত ছিলেন যে, যে কোন হিন্দুবিরোধী রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হলেই এই নিম্নশ্রেণীর জনসমূহ তা বরণ করে নিতেন। কাজেই সব সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

যদিও অপাংক্তেয় হিন্দুদের একাংশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তবু এই ধর্ম প্রবল হয়ে হিন্দুধর্মকে গ্রাস করতে পারে নি। সমাজের উচ্চবর্ণেরা রাজকার্যাদির অনুরোধে কিছু কিছু দরবারী পোষাক পরিচ্ছদ আদব কায়দা গ্রহণ করলেও তাঁদেব চিত্তে গভীর স্তরে আগন্তুক ইসলাম বিশেষ কোন কৌতূহল জাগাতে পারে নি।

তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে সামাজিক অবস্থাও বাঙলাসাহিত্যে দেখা যায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ কেন ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলাব জীবন ও সংস্কৃতি তুর্কী আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল। কেউ সৃষ্টি করার মত প্রেরণাই পান নি। বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণমন্দিরগুলো প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল তুর্কী অভিযানকারীর দ্বাবা। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট, আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল জাতির মর্ম্মস্থান দেবপীঠগুলোর উপর আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে ত্রাস জাগিয়ে নিশ্চেষ্ট কবে দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যই অল্পবিস্তব সফল হয়েছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা পারলেন তাঁরা প্রান্তীয় হিন্দুরাজ্যে চলে গেলেন যেমন মিথিলায়, নেপালে, উড়িষ্যায়, কামরূপে, ঝাড়িখণ্ডে। যাঁরা পারলেন না তাঁরা নির্যাতিত হতে থাকেন। কতক বা এখানে সেখানে লুকিয়ে প্রাণ, জাতি ও ধর্ম রক্ষা করলেন। ধর্মঠাকুরের ঘবভরা গাজনের শেষ অনুষ্ঠান 'ঘরভাঁটা'র ছড়ায় এই ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। আমাদের দেশের চিন্তাধারায় এক সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মত দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া। দেশ যখন মার খেয়ে খেয়ে নির্বীয হয়ে পড়ল তখনই এই পরাজিত-মনোবৃত্তি প্রকট হল ব্যাপকভাবে। তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনার চেষ্টা করলেন।

কল্কি অবতারের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল অনেকদিন থেকে, তাই তাদেব অনায়াসে বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে--

ধর্ম্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকট কামাল,
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম, ...

হিন্দু ধর্মের উপর তুর্কীদের অবাধ অত্যাচার চলতেই লাগল।

উড়িষ্যার জাজপুরে দেউল—দেহাবা ভাঙ্গার কাহিনী সম্পর্কে জানা যায়—

'ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংসহেতু নিরঞ্জন,
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের খায়
হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পলায়।'

দিল্লীর সিংহাসনের অত্যাচারী এবং খামখেয়ালী শাসক হিসাবে যেমন আলাউদ্দীন, মহমদ বিন তুঘলক প্রভৃতি শাসকদের নাম পাওয়া যায় বাঙলায়ও তার রেশ পড়ে। বিশেষতঃ পাঠান জাতিরা স্বভাবতঃই নির্মম ছিলেন। প্রবল শাসনকর্তাদের অত্যাচারের কথা দেশের লোকেরা লিখতে স্বভাবতঃই ভয় পেতেন। এই ভয়ের কারণেই বোধ হয় বৈষ্ণবরা আইন করেন কোন নিতান্ত কষ্টকর কথা লিখতে নেই। বাঙলাদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোঘলদেব আবির্ভাব—এই সময়কার প্রজারা কাজীর হাতে কিভাবে বিড়ম্বিত হতেন কবি 'চন্দ্রাবতী' যথাযথ তার চিত্র দিয়েছেন—

'টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়া
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া।।
দোছক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে লোক চন্দ্রাবতী কয়।।'

পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্বের অবসানে ও গাজিদের প্রথম অভ্যুদয়ে দেশে অরাজকতার কথা বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুবাণে' আছে—'যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত, হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ, কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল.....'।

'হুসেন শাহ' নবদ্বীপ ধ্বংস করতে আদেশ দেন—'পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ....।' 'জয়ানন্দ' লিখেছেন মুসলমানেরা বাদশাহের আদেশে নবদ্বীপে অত্যাচার আরম্ভ করে— 'কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে, ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে।' অত্যাচারীরা অশ্বত্থ ও মনসা গাছের মূলচ্ছেদ করে তুলসীগাছ মূলশুদ্ধ উপড়িয়ে ফেলে। যে ঘরে শঙ্খের ঘণ্টা বাজে সে ঘরে গিয়ে উৎপাত শুরু কবত। ফলে গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হল, দেবালয়গুলো চূর্ণ হল, পণ্ডিতদের জোব কবে মুসলমান করা হল। দুই বা আড়াই শতক ধরে একত্রে বসবাস করলেও হিন্দুদের প্রতি তুর্কীরা কিভাবে অত্যাচার করত সেই সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। পথে যেতে যেতে হিন্দুকে তুর্কী বেগার ধবে, ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে গোমাংস বহন করায়, তার পৈতা ছিঁড়ে দেয়, তিলক মুছে ফেলে, রোয়া ধানে মদ চোলাই করে সে খায়, মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানায়, হাটে তোলা তুলে ফেবে, নীচ বর্গের তুর্কীও উচ্চবর্গের হিন্দুকে যথেচ্ছ অপমান করে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অবধি যাঁদের হাতে শিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করত তাঁরা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রশাসিত সংস্কৃতিসম্পন্ন। গ্রন্থকর্তা ছিলেন উচ্চস্তরের ব্যক্তি। রাজসভাসদ অথবা সমাজপতি। অনেকে ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসঙ্ঘের আচার্য বা

অধিনায়ক। এঁরা মুসলমান আক্রমণে অনেকটাই বিপন্ন হলেন। কাজেই তুর্কী অভিযানের পর বেশ কিছুকাল ধরে সাধুসাহিত্যচর্চার পবিবেশ প্রতিকূল ছিল। যার ফলে ১৩শ শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে বাংলাসংস্কৃতিব অন্ধকার যুগ (The Dark Age) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চল্লিশ বছর ধরে পুঁথি সংগ্রহ করে বেড়িয়েছেন এবং বহু পুঁথি সংগ্রহও করেছেন কিন্তু ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান পান নি, কেবল দুখানা নকল করা পুঁথি দেখেছিলেন। সেই কারণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ কবেছেন—'সেইজন্য চর্যাপদেব পব বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ।'

ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানেব বিজাতীয় সম্পর্ক হ্রাস পেল এবং হুসেন শাহেব সময় এই সম্বন্ধটা পুরোপুরি প্রীতিব সম্পর্কে পরিণত না হলেও প্রতিকূলতার তীব্রতা হ্রাস পায়। মুসলমান বাদশাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদেব প্রতি যেরকম অনুবাগ ও ভক্তি দেখাতেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান ঐতিহাসিকরা একদিকে যেমন তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন অন্যদিকে পূর্ববংগগীতিকায মুসলমান গায়কবাও তাদের গানে এই সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়েছেন। পীর বাতাসী মুসলমান গায়েন নিজ গুরু মিন্দাগাজীর কাছে বর প্রার্থনার সময় "মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াথান" ইত্যাদি বন্দনাগীতে হিন্দু তীর্থগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। চৌধুরী লড়াই গীতিকা'য মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখেছেন—'বন্দিঠাকুর জগন্নাথ, ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায, এমন সৃধন্য দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে ভাত, সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ।'

আফগান প্রাধান্যেব সময হিন্দু আর মুসলমান একত্র হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারত কাব্যের বাংলা অনুবাদ কবিয়েছিলেন। উক্ত বাদশার সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একটি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়েছিলেন। সঙ্কলযিতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বব। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ (চট্টগ্রামের শাসনকর্তা) শ্রীকরণ নন্দী নামে এক কবিকে দিয়ে মহাভাবতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ সঙ্কলন করিয়েছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসুফ গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী বসুবংশীয় মালাধর নামে কবির (কুলীন গ্রামবাসী) দ্বাবা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিযেছিলেন।

বাদশাহের পরিবারে হিন্দুরমণীর আগমন হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদশাহী দরবাবে বাংলা ভাষার আদর লাভ করেছিল। তাদের দলিলপত্রও অনেক সময় বাংলাভাযায় লেখা হত। অনেক সময় তাঁরা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপব শাস্ত্রের মর্ম জানবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাংলা তাঁদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এইজন্য তাঁরা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করতে উপযুক্ত পণ্ডিতদের নিযুক্ত করতেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদশাহেব দরবায়ে অবিরাম প্রচলিত ছিল।

অন্যদিকে রাজসিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ, রাজকীয় উত্থানপতন বাংলার পল্লীসমাজকে স্পর্শ করত না। ব্রাহ্মণ তালপাতার উপর, বেদবেদাঙ্কের ব্যাখ্যা লিখতেন। বিলাস তাদের সমাজে প্রবেশ করে নি। ধনশালী হিন্দুরাই তখন ছিলেন কৃষিপ্রধান বাংলার একরূপ মালিক। ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ আফগানই তাঁদের জায়গীবগুলো ধনবান হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিতেন, কারণ প্রায়ই তাঁদের নেতাদের আহ্বানে তাদেব গৃহ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হত, এমনকি বাণিজ্য কাজেও তাদের প্রবৃত্তি ছিল না। সেই কারণে এই জায়গীরগুলোর ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা নিতেন এবং এঁরাই ব্যবসাবাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করতেন।

এই যুগেব দুই একজন মুসলমান সম্রাট ছাড়া বেশিরভাগই দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ কোন উন্নতি করেন নি। গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার, অনতিদীর্ঘ অল্প প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, আক্রমণের সময় পালাবার জন্য জলনালী (Tunnel) প্রভৃতি রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। হিন্দুরাও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই প্রথা অবলম্বন করত। বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতি দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গলো ঘব যা 'বারদুয়ারী ঘর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল তা নবাবী আমলের স্থাপত্য কীর্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, গৌড়ের সোনা মসজিদ বারদুয়ারী মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া রাজশাহীব বাঘাব মসজিদ, গৌড়ের হুশেন শাহের মসজিদ এবং চাঁদদরওজা, জানজান মিঞার মসজিদ, সাসারামের ইসলাম সাহের সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলোতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ছাড়া বিদেশী স্থাপত্য প্রভাব খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। গৌড়ের কদমরসুল বা কদম শরীফ ঠিক হিন্দু মন্দিরের মত। উপবেব গম্বুজ রচনা করে শুধুমাত্র মুসলিম ছাপ দেওয়া হয়েছে। লোটন বা নোটন মসজিদ গৌড়ের বাঙ্গলো ঘরের অনকুরণে নির্মিত। মঙ্গলকোটের নূতন হাটের মসজিদে হিন্দুব প্রাচীন মন্দিরের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণীর জাদর খাঁর মসজিদ হিন্দুমন্দিব ভেঙে রচিত হয়েছে। হিন্দুমন্দির ভেঙে মসজিদগুলো নির্মাণ হয়েছিল বলে এই প্রভাবগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুযাব হিন্দুদের সূর্যমন্দির ও নারায়ণমন্দির যথাক্রমে মসজিদ মিনারে পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'হিন্দুর মন্দিব ও বৌদ্ধের সঙ্ঘরাম চূর্ণ করিযা, কখনও-বা বিধ্বস্ত মন্দিরের মালমসলা ও দেবদেবীর মূর্তি লইয়া মসজিদ নির্মিত হইত।' তুর্কী আক্রমণেব পরবর্তী সময রাজসভায় উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওমরাহ, জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা আরবী ও পারশী সম্ভূত নাম প্রচলিত হয়েছিল। এমারত, ঝাড়, ফানুস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সমাজের উচ্চস্তবের বিলাসীদের ভাষা হল। কিন্তু বাঙলার গ্রাম অঞ্চলে হিন্দুদের অবাধ রাজত্বই লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্তা ছিল ব্রাহ্মণ। তাঁদের ইঙ্গিতেই সমস্ত সমাজ চলত। ব্রাহ্মণদেব পর ঐ সময আর একদল প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা বৈষ্ণব। এঁবা নূতন আভিজাত্য সৃষ্টি করে দেশের একাংশ জয় করে নিয়েছিলেন। সমাজে কুলীনরা এক বিশেষ জায়গা করে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই কঠিন হিন্দুব্যূহের মধ্যে তুর্কীরা 'সিগ্ধকী' পাঠাতেন সুন্দরী হিন্দু রমণীর খোঁজে।

তবে অত্যাচারী তুর্কী শাসন ব্যবস্থা থেকে বাঙ্গলার জনগণ কিছুটা স্বস্তি পান চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে। এই সময় শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য সংস্থাপন করলে দেশ অনেকটা সুসংস্থিত হয়। নবদ্বীপ শান্তিপুরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নূতন আশ্রয় খুঁজে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার কারণ হল—যেসব পণ্ডিত রাজসভার সংস্পর্শে আসতেন তাঁদের ঐশ্বর্য্য সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত বটে কিন্তু সাধারণ লোক তাঁদের থেকে দূরে দূরেই থাকতেন। এইজন্য রাজসভার আওতা থেকে দূর বলে সারা বাংলার থেকে পণ্ডিতরা নবদ্বীপ অথবা শান্তিপুরে গঙ্গাবাস, তথা বিদ্যার আদান-প্রদান করতেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস প্রশংসা করে বলেছেন—

'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে,
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।....'

এই সময়ে বাঙালী শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে শ্রীচৈতন্যদেব সার্থক রূপদান করেছেন। একদিকে তিনি যেমন অভিজাতদের মধ্যে ম্লেচ্ছাচার রোধ করেন, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নামধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান করেন। এইভাবে হিন্দুসমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে তিনি এক আত্মীয়ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন, সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠান-বাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন।

বাঙলাদেশে রাষ্ট্রিক শান্তি ফিরে এলো ধীরে ধীরে, হিন্দুদের মানসিক শঙ্কা কিছুটা অপনীত হল। মুসলমান রাজসভায় হিন্দু অভিজাত শ্রেণী আবার সম্মানিত স্থান লাভ করে। সুলতান ফকিরুদ্দীন শ্রীহর্যসেন নামে এক বৈদ্যের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার জমিদারি দিয়ে রাজা উপাধি দান করেছিলেন। দিল্লীর সুলতানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইলিয়াস শাহ হিন্দুদের উপকার পেয়েছিলেন, ফলে বিপদ কেটে গেলে হিন্দুদের সম্মানিত করেন। চট্টবংশীয় দুর্যোধন 'বঙ্গভূষণ' পূতিতুণ্ডবংশীয় চক্রপাণি রাজজয়ী উপাধি লাভ করেন। জালালুদ্দীন প্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহস্পতিকে আচার্যকবি চক্রবর্তী, পণ্ডিত সার্বভৌম, কাব্যপণ্ডিত চূড়ামণি প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করেন। জালালউদ্দীনের প্রধান অমাত্য হিন্দু ছিলেন। রুকনুদ্দীন বরবক শাহ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেছিলেন। সুলতান কর্তৃক এই সব উপাধি দান নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সুলতানী আমলের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তবে তুলনামূলক বিচারে বলা যায় নবাগত মুসলমান শাসকদের মধ্যে ছিল জীবনযাপনের অত্যধিক শৈথিল্য, রক্তাক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও কলহ, উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্তরীকরণের নীতি। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার মন্তব্য করেছেন—'আগন্তুক উপদ্রবকারিগণ সংস্কৃতির এমন কোন উল্লেখযোগ্য বাণী বহন করিয়া আনে নাই, যাহা বাঙালীর মানসনয়নে নবজীবনের দিব্যছটা হানিবে', তবুও তুর্কী

আক্রমণের ফলে বাংলায় সামাজিক জীবনে কতগুলো আবর্তন বিবর্তন ঘটে যা বাংলা ইতিহাস তথা সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

তুর্কী আক্রমণের ফলে সামাজিক আবর্তন বিবর্তনে দেখা যায়, তুর্কী আক্রমণের পর বাঙলার সামাজিক দিক থেকে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল (১) গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হল। হিন্দুযুগে দেশের রাজধানীতে রাজা ও সামন্তবর্গ বসবাস করলেও গ্রামই ছিল দেশীয় প্রাণশক্তি। কিন্তু পাঠান শাসনকর্তারা কৃষিকাযে লিপ্ত ছিলেন না। অধিকাংশ আফগানরা জায়গীর ধনবান হিন্দুদের ইজারা দিতেন। কাজেই রাজকার্য, ব্যবসা ইত্যাদি নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক সুবিধা নগরগুলোতেই প্রসার লাভ করার ফলে নগরগুলো জনবহুল হয়ে ওঠে। (২) উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল। মুসলমান সমাজের প্রভাবে নিপীড়িত নির্যাতিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে, এই সত্য সমাজে পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণে উচ্চশ্রেণীর মানুষরা সংঘাত ও বিভেদ ভুলে সংযমের পথে অগ্রসর হল। (৩) প্রথমে হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ক্রমে হিন্দুমুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ মুসলমান বিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন আর বিদেশীয় রইলেন না। (৪) সমাজে বর্ণসংযোগ দেখা দিল। তুর্ক বিজয়ের কাল পর্যন্ত যারা শাসক ছিলেন তারা নেমে এলেন শাসিতের পর্যায়ে। শাসকরা ততদিন পর্যন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের তাঁরা অনেকেই লৌকিকভাবে হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে লখিন্দর, বেহুলা, কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি খুল্লনা, লাউসেন—রঞ্জাবতী উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ ও শিব নামে প্রচলিত বাঙলা দেশের নানাকাহিনীর মূলত প্রচলন ছিল লোক সমাজের ধর্ম ও কথায়। এতদিন এইসব দেবদেবী ও তাদের কাহিনী নিম্নবর্গের বিষয় বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ছিল। তাদের চক্ষে শ্রদ্ধেয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি। তুর্কী আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, উপর তলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নীচের তলার এই মনসা, চণ্ডী, চাষীদেবতা শিব ও প্রণয় বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হল। অন্যদিকে তখন নিচের তলার মানুষদের পক্ষেও সুযোগ হল ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবার—অবশ্য নিজেদের মতন করে, নিজেদের শক্তি অনুযায়ী। এই বর্ণসংযোগেরই একটা পরোক্ষফল হল এই যে পশ্চিম বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম লোপ পেল। তারা হিন্দুদের সমাজে মিশে গেল। ১৬শ শতকে নিত্যানন্দ অবশিষ্ট নেড়া-নেড়ীদেরও বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করে নিলেন। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধরা অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল তারা লোপ পায় নি। মুসলমান পীর ফকিরদের প্রচারে ও প্ররোচনায় এখানকার বৌদ্ধভাবাপন্ন সাধারণ লোক ইসলামকে গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করল। (৫) সাহিত্যের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ হয়। উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষের ফলে একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগান মঙ্গলকাব্য রূপে বিকাশ লাভ করল, অন্যদিকে

সর্বভারতীয় সংস্কৃতি যেমন ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাংলা-ভাষায় অনূদিত হল। (৬) হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রযাসে নিজধর্ম সংস্কৃতি আঁকড়ে ধবল। সমাজকে সংরক্ষণ করতে চাইল। এই ভাবধারা গ্রহণ করলেন হিন্দু উচ্চবর্ণ বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। হিন্দুজাতিভেদ ও আচারধর্মের গণ্ডিব মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরো সংকীর্ণ, রক্ষণশীল করে তোলে। বর্ণের ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। (৭) হিন্দু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতিচর্চা পুনরুজ্জীবিত করলেন—টোল, চতুষ্পাটি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। (৮) তুর্ক বিজেতারা এদেশে থেকে এদেশের বমণীকে বিবাহ কবতেন। ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে তাদের রক্তে ও জীবনযাত্রায় বাব আনা বাঙালী ও চার আনা তুর্ক হয়ে গেল। দরবারে ফারসী চর্চা করত, ধর্ম বিচারে আরবীর শবণ নিত। তবে আদান প্রদান চলতে থাকে। বাঙলা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, বাঙালী জীবনযাত্রার কাহিনী যেমন রামাযণ, মহাভারত অথবা মঙ্গলকাব্যেব গল্প। পরাগল খাঁব মত উচ্চবর্গের মুসলমানরাও রামায়ণ, মহাভারত পাঁচালী শুনেছিলেন। হিন্দুবাও ফারসী, আরবী পড়ে বাজদববাবে ম্লেচ্ছ আচার কিছু না কিছু গ্রহণ করেন। (৯) পাঠান সুলতানদের রাজসভায হিন্দু আমলেব ঠাট কিছু কিছু বজায় ছিল। বাজার খাস চিকিৎসক হতেন হিন্দু এবং পূর্বের মতই তাঁর উপাধি হত "অন্তরঙ্গ"। রাজ্যশাসনে, রাজস্ব ব্যবস্থায এমনকি সৈনাপত্যেও, হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সুলতান জালালুদ্দীনের সহকারী ছিলেন তাঁর এক হিন্দু মহামন্ত্রী সেনাপতি। সুলতান জলাল-উদ্-দীনের কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ''রই নাম করতে হয় সনাতন ও রূপের। এই দুই মহাপণ্ডিত ও মহাকবি ভাই সুলতান হোসেনসাহের প্রিয় পাত্র ছিলেন। সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস' অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারী। এছাড়াও ছিলেন কেশব-খান-ছত্রী, যশোরাজ খাঁন প্রভৃতি। হোসেন সাহের পুত্র নসরৎ সাহের অনুগত ছিলেন কবিশেখর উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ। (১০) তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশে সাহিত্যে অন্ধকার নেমে এলেও ধীবে ধীরে পাঠান মুসলমান, ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং হিন্দুদেব মধ্যে সহৃদয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে অন্ধকার কেটে, ফুটে ওঠে এক আলোকোজ্জ্বল প্রভাত। রাজসভার পোষকতায়ই বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পৌরাণিক পুবাণ এবং সাধাবণ সাহিত্যেব চর্চা চলতে থাকে। মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ 'রাজসভাশ্রিত' বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশে কৃষ্ণলীলা বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীর আকর ছিল দুটো, এক সংস্কৃত পুরাণ যেমন হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি আব দেশীয় লৌকিক কাহিনী যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যার প্রধান বক্তব্য ছিল। গৌড় দরবাবের কর্ম্মচাবীদের মধ্যেই প্রথম ভাগবতের কদর হয়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। নসরৎসাহের পুত্র ফীরোজ শাহ্ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিদ্যাসুন্দব কাব্য লিখিয়েছিলেন।

তুর্কী বিজয়ের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল দেশীয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যের জোয়ার সৃষ্টির প্রেরণা দেয় পরোক্ষে। তুর্কী বিজয়ের ও সাম্রাজ্য স্থাপনের স্থিতিকালেই বাঙালীজাতির প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় বীরভূমেব

বড়ুচণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, কুলীন গ্রামের মালাধর বসু ও ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের রচনায়। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের এক নবজন্ম এসময়ে। ডঃ সুকুমার সেন একেই বলেছেন 'বাঙালী জাতির সংস্কৃতি সমন্বয়ের ব্যাপার', ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—'এই সময় হইতে নবদ্বীপ-শান্তিপুরের বিদ্যাসমাজ সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থেব মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেও গ্রামীণ বাংলা নবসৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আপনাকে আবিষ্কাব করিল। সুতরাং মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। (১) অনুবাদ সাহিত্য—যেমন (ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (২) বৈষ্ণবপদ সাহিত্য যেমন—(ক) বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (খ) বিদ্যাপতিব পদাবলী (গ) পদকর্তা চণ্ডীদাস (৩) মঙ্গল সাহিত্য (ক) কানাহরিদত্তের পদ্মপুরাণ (খ) নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণ (গ) বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল (ঘ) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (ঙ) ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল (চ) মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল।

তুর্কী আক্রমণের অদূরস্থিত এবং সুদূবপ্রসারী পরিণতিগুলি এতই ব্যাপক হয়েছিল এদেশের ইতিহাসে যে সাহিত্যেব ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়েও তাকে অস্বীকার কবা যায় না। প্রথমতঃ আমরা দেখি অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কবি কৃত্তিবাস ওঝা যে গৌড়েশ্বরের আদেশে গ্রন্থ রচনা কবেছিলেন তা তাঁর কাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

> 'সন্তুষ্ট হইযা বাজা করিয়া সম্বোধ।
> রামাযণ রচিবাবে করিলা অনুরোধ।'

গৌড়েশ্বর বলতে কবি কাকে বলেছেন তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। পণ্ডিতরা কৃত্তিবাসেব গ্রন্থেব শুরুব সময ১৪১৮ নাগাদ মনে করেন। তবে সেই সময গৌড়েব সিংহাসনে রাজত্ব কবছিলেন রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮), অনেকে অবশ্য বাজশাহীব তাহিবপুরেব রাজা কংসনারায়ণকেই কৃত্তিবাসেব গৌড়েশ্বব মনে কবেন, তবে এই মতের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি নেই। কৃত্তিবাসেব গ্রন্থ এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব এবং বিষয বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কৃত্তিবাসেব গ্রন্থেব সর্বত্রই বাঙালিয়ানায় ভবপুর পারিবারিক মানসিকতাব অভিক্ষেপ ঘটেছে। কৃত্তিবাস বাল্মীকিব মূল গ্রন্থেব বেশ কিছু কাহিনী বর্জন করেছেন আবার তিনি সংযোজনও করেছেন অনেক কাহিনী। কৃত্তিবাসের বামাযণেব মধ্যে শাক্ত এবং বৈষ্ণব—দুই ধারাই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বাল্মীকির অঙ্কিত বাম "অবতাব" রূপী, কিন্তু কৃত্তিবাসেব রাম 'ঘবেব ছেলে' রূপী। যাব ফলে দেখা যায় তাঁর গ্রন্থ বাঙালীব মানসলোকে আদরণীয হয়ে আছে এবং গ্রন্থেব জনপ্রিযতা এখনও অপবিসীম।

মালাধব বসুব শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যকে প্রাচীন ভাগবতগ্রন্থেব ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। কবিব ভাষায়—

> 'ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে
> লৌকিক কবিযা কহি লৌকিকেব মতে'

এই গ্রন্থ লেখার জন্য তদানীন্তন গৌড়রাজ রুকন-উদ দীন বারবক শাহ তাঁর পারিষদ

মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' 'উপাধি দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে মালাধব সে কথার উল্লেখ করেছেন—

"গুন নাই অধম মুই নাই কোনো জ্ঞান
গৌড়েশ্বর নাম দিলা গুনরাজখান।"

মালাধর বসুর গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট সময়কাল জ্ঞাপক যে দুটো ছত্র আছে তা থেকে তাঁব গ্রন্থরচনা কাল ১৪৭৩-১৪৮০র মধ্যে হয়েছিল বলে ধরা হয়। মালাধরের গ্রন্থের মূল ভাগ তিনটি বৃন্দাবনলীলাপর্ব, মথুরা পর্ব, অন্ত্যপর্ব। লৌকিক ভঙ্গীতে অলৌকিক তত্ত্ব মহিমাব প্রতিষ্ঠাই হল মালাধব বসুর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিশেষ পবিচয়সূচক তথ্যাদি পাওয়া যায় না। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রচলিত 'কৃষ্ণধামালী' নামে এক ধরনের লৌকিক গীতিরীতির অনুসরণে রচিত। তিনি তাঁর সুবিশাল কাব্য তেরটি খণ্ডে চারশোরও বেশী পদে রচনা করেছেন।

মধ্যযুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব মহাজন হলেন মিথিলাব 'কবি সার্বভৌম' বিদ্যাপতি। মিথিলার রাজপরিবারেব বংশ পঞ্জিকা থেকে তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কয়েকটি তথ্য জানা যায়। এঁদেব পবিবার পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজবংশে অনুগৃহীত ছিলেন। রাজা শিবসিংহ তাঁকে বিস্ফী গ্রামের ভূমিস্বত্ব দান করেছিলেন। এই দানের পাটায তাঁকে রাজা অভিহিত করেছিলেন "অভিনব জযদেব" আখ্যায। তাঁব আর এক অভিধা ছিল 'মৈথিল কোকিল'। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদসাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির মেলবন্ধনের কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত। পদকবিতা ছাড়া কীর্তিলতা, ভূপরিক্রমা, পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতে হিন্দু-মুসলমানের পবস্পবের সম্পর্ক কেমন ছিল সেকথা তিনি তাঁর কীর্তিলতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস বাগচীব পুত্র চণ্ডীদাস, রজককন্যা রামীকে কাব্যসাধনার সঙ্গিনী হিসাবে শ্রদ্ধাব আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই অন্ধকার মধ্যযুগের গ্রামীণ বাঙালী সমাজেব পরিবেশেব মধ্যে বাস করেও। তিনি লিখেছেন—

'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায।'

সাদাসিধে সরলবাক্‌ভঙ্গি, নিবলঙ্কার প্রকাশবীতি এবং সর্বজনের হৃদযস্পর্শী একটা গভীব ভাবের অভিব্যক্তিই হল চণ্ডীদাসের কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। শুধু অনাড়ম্বর ভাব প্রকাশই নয় মানুষেব মহিমান্বিত সম্মান তাঁর কাব্যে স্থান লাভ করেছে। চণ্ডীদাস সেই অন্ধকার ও সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে বসে লিখেছেন—

'শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপবে নাই।'

মানুষের এত বড় মর্যাদাবিধান পুরানো বাংলা সাহিত্যে এভাবে আব কোনো কবিই করতে পারেন নি। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে এই হল তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুটো ধাবাব একটা বৈষ্ণব অন্যটা মঙ্গলসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলো এক অর্থে বাঙালীর প্রত্নইতিহাসের বস্তু উপাদানের আকরস্বরূপ। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিন শাখা হল—চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হয়ে আছে, মঙ্গলকাব্যগুলো তাদেবই পরিচয়। মঙ্গলকাব্যের এই প্রধান তিন শাখার আদি কবিদের নাম ঐতিহাসিকরা খুঁজে বার করেছেন বটে; কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবেব সময়কাল নিয়ে বিপুল বিতর্ক আছে। তুর্কীশাসন কায়েম করার সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী কালেব মঙ্গলসাহিত্যের যে সমস্ত কবিদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন— হরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয় গুপ্ত, ময়ূর ভট্ট, মানিক দত্ত প্রভৃতি।

সুতরাং পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে—বাংলায় তুর্কী আক্রমণের অদূরস্থিত এবং সুদূর প্রসারী পবিণতিগুলো এতই ব্যাপক হয়েছিল যে এদেশের ইতিহাসে বিশেষতঃ সামাজিক এবং সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়েও তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই একথা সত্যি যে 'তুর্কী আক্রমণ মধ্যযুগের বাঙলার পচনশীল জাতীয় দেহে কালের অস্ত্রোপচার'। বাঙলার জাতীয় জীবনে তুর্কী আক্রমণেব ঐতিহাসিক মূল্য এখানেই।

কৃত্তিবাস : শ্রীরাম পাঁচালী

'বর্ত্ম কর্ষতি পুরঃ পরমেকস্তদ্
গতানুগতিকো ন মহার্ঘঃ।

একজনই আগে পথ কেটে দেন, পরে সেই পথ দিয়ে গতায়াতের লোকের অভাব হয় না। কল্যাণকর্মের প্রথম কারয়িতাই দুষ্কর সাধনের গৌরবে কীর্তিমান। চন্দ্রচূড় জটাজাল থেকে ভাগীরথী উদ্ধারের মত ভাষাপথ খনন করে সংস্কৃত হ্রদ থেকে ভারতরসের সুধাস্রোত এই তৃষিত বিমল বঙ্গে প্রবাহিত করার আদি কর্ণিকদের কাছে উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ যুগ যুগ ধরে গ্রামে, লোকালয়ে, তীর্থে সাধারণ মানুষের কাছে গার্হস্থ্য আদর্শ ও ভক্তির প্রেরণা সঞ্চার করেছে। গত কয়েক'শ বছর ধরে সমগ্র বাংলাদেশে—রাজমহল হতে চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যার উপকূল ধরে কামরূপ পর্যন্ত ভূভাগে কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ পাঁচালী অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালীর রসাবেশমুগ্ধ মর্ত্যচেতনাকে ভাবস্বর্গের তুরীয় লোকে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলকাব্য তাহাকে কঠিন মৃত্তিকাতলে টানিয়া আনিয়াছে; আর রামায়ণ পাঁচালী তাহার গৃহজীবনের পরিচিত আদর্শকে মহত্তর মূল্য দিয়াছে।' আচার্য আশুতোষ একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন সংস্কৃত কাব্যাবলীর সঙ্গে ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সঙ্গে কৃত্তিবাসের সেই সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে কৃত্তিবাসের সাহিত্য বাংলার জাতীয় সাহিত্য। এ বিষয়ে মধুসূদনের প্রশস্তি—

'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার।'

কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে গঙ্গাতীরের ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রপৌত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। মাতা মালিনীর গর্ভে ছ'টি পুত্রের জন্ম হয়। কৃত্তিবাস লিখেছেন—

'মালিনী নামেতে মাতা বাবা বনমালী,
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী।'

নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উক্তি—

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।'

বার বৎসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হয়ে পড়াশুনা করতে যান এবং যথাকালে পদ্মানদী পার হয়ে গৌড়ে ফিরে এসে নিজের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করে আসন-পুষ্পমাল্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। '*এইভাবে রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়া কৃত্তিবাস শ্রীরাম পাঁচালীর রচনা শেষ করেন'।* কবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। কৃত্তিবাস প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি নানা জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে মনে করেন ১৩৮৬-৯৮ খ্রীঃ এর মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় এবং তিনি আনুমানিক ১৪১৮ খ্রী. গৌড়েশ্বরের সভায় যান। কুলজী গ্রন্থ অনুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। সমগ্র ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে রামায়ণ কথার এমন একটি অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক আছে যে বিশ্বের অন্য কোন মহাগ্রন্থের সম্বন্ধে সেকথা একবাক্যে বলা যায় না। অবশ্য প্রত্যেক দেশের মহাকাব্য সেই দেশের অন্তর্জীবন হতেই রস সংগ্রহ করে। জাতি ও জীবনের সঙ্গে মহাকাব্য মাত্রেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে জড়িয়ে গিয়েছে। গত তিন হাজার বছর ধরে ভারতের মনঃপ্রকৃতির চতুঃসীমায় রামায়ণ কাহিনীর বিচিত্র দেবদেউল গড়ে উঠেছে। জনপদ, জনজীবন, ভূগোল ও ইতিহাসের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও রামায়ণকথা দেশে দেশে ও কালে কালে নব নব রূপলাভ করেছে, কখনও একের সঙ্গে অপরের কথা, চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে আদৌ সাদৃশ্য নেই, কখনও বা এক অঞ্চলের কাহিনী অপর অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীব সাক্ষাৎ বিরোধী; তথাপি সামগ্রিক বিচারে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে যদি কোন একখানি গ্রন্থ সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তবে তা রামায়ণ। এখানেই এর সাহিত্যমূল্যের অনন্যতা। বেদ-উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, নানা পুরাণ-উপপুরাণ—এই সমস্ত গ্রন্থও ভারতজীবনকে গঠন করেছে, পরিবর্তিত করেছে, প্রভাবিত কবেছে, কিন্তু রামায়ণের প্রভাব সুদূবপ্রসারী, ভাবগভীর ও চিরায়ু। রামায়ণের যদি কোন আকর্ষণ থাকে—যা বহু শতাব্দী পরেও ভারতচিত্তে অদ্যাপি অম্লান হয়ে রয়েছে—তা হল এর গার্হস্থ্য জীবনচিত্র। আমাদেব পুণ্য-পারিবারিক সম্পর্ক, জীবনের একটা স্বাদু সীমাবদ্ধ পবিত্রতা,—এককথায় যাকে ভারসাম্য বা balance বলে রামায়ণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ইহাতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ আছে; নরবানব, ঋক্ষ-যক্ষ-রক্ষ ও দেবদানবের রণকোলাহল মাঝে মাঝে বামায়ণেব শান্ত জীবনচ্ছবিকে কিছুটা খর্ব করিলেও আসলে ইহাতে পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু সেবক, বন্ধু-বান্ধব এই সম্পর্কগুলি প্রাত্যহিক জীবনরসে আর্দ্র হইয়া দ্যুলোকাচরী মহাজীবনকে ঘবেব মধ্যে স্থাপন করিয়াছে' শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালীর হৃদয়কে চিরসবুজ, চিরসুন্দর, চিরমধুর করে রেখেছে এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বাঙালীব দিবস-রজনীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক কৃত্তিবাসের বামাযণ। বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনাদর্শ ও সত্যনিষ্ঠার সমন্বয়ে কৃত্তিবাসেব বামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য। বাঙালী জীবনেব মূলাদর্শের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে

বাংলাদেশে রামায়ণের আদর্শের প্রভাব কোনদিনই খর্ব হবে না—এদিক থেকে এর সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তরে যেরূপ সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে, তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ছেড়ে দিলে পূর্ব ভারতের আর কোন কাব্য একটা বৃহৎ নরগোষ্ঠীর চিত্তলোকে এমনভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাঙালী জীবনের ওপর দিয়ে নানা সঙ্কট ও ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে বটে, কিন্তু জীবনের মূল্য সম্বন্ধে এই জাতির যে আমূল মানসিক পরিবর্তন হয়নি, তার একটা বড় কারণ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ। আর্য রামায়ণ যেমন পুরানো ভারতবর্ষকে নিরাপদ আদর্শের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র পূর্ব ভারতকেও শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনাদর্শের মধ্যে নির্ভর আশ্রয় দিয়েছিল। বাংলাদেশে মধ্যযুগে নানা প্রকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে : ভাগবত, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর বিশেষ ধরনের মনোভাব ধরা পড়লেও রামায়ণকে বাদ দিলে এমন একখানি গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না যা কালের সীমা অতিক্রম করে বাঙালীর চিরন্তন মানসপ্রবণতাকে ধারণ করে রেখেছে।

বাঙালীর দৈনন্দিন জীবিকা এবং জীবিকা-বহির্ভূত মানসিক ঐতিহ্যের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে, সুখে দুঃখে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের আত্মার খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করে দিয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি প্রতিফলিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। তাই এই কাব্য আপামর বাঙালী হৃদয় হরণ করেছে এবং বাঙালীকে জীবনচর্চায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে আদর্শগত প্রেরণা দিয়ে আসছে। বাঙালী কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে পড়তে পথ চলার মানুষ খুঁজে পায় সত্য ও শিবের সন্ধান। কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন বাঙালী কবি, প্রাচীন ও নবীন—উভয় যুগের বাঙালীর মানসিক জীবন-প্রবাহকে এমনভাবে গৃহাদর্শের দিকে ফেরাতে পারেননি। বাঙালী যা চেয়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা সে পেয়েছে। বাঙালীর জীবনের কালনিরপেক্ষ এমন একটা সামগ্রিক রূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিকশিত হয়েছে যে, মনে হয় তিনি যেন 'পুরাণকথা' আধারে বাঙালীর জীবনরসকেই পরিবেশন করেছেন। সর্বশেষে বলা যায় উত্তর ভারতীয় মানবিক আদর্শ ও পূর্ব ভারতীয় প্রেম ভক্তির লীলাবাদ—উভয়ের সার্থক সংমিশ্রণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর সর্বযুগের আত্মোপলব্ধির বীজমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালীসমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।'

এ পর্যন্ত বাঙলায় কৃত্তিবাস সংক্রান্ত আলোচনায় বেশির ভাগ সময় তাঁর আত্মপরিচয় বা আবির্ভাব তথ্যাদি নিয়ে বিব্রত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সর্বপ্রথম জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের আগে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দীনেশচন্দ্র সেন কৃত্তিবাসের জন্মসন নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে ১২৫৭ শকাব্দ (১৩৩৫ খ্রীঃ), নগেন্দ্রনাথের মতে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ ও দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্মসন বলে গৃহীত হতে পারে। ১৩১০ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র 'খনা' নামক একটি প্রবন্ধে অনুমান করেছেন ১৩৭৮ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। পরে তিনি দেখলেন এই সনগুলি ভুল। ১৩২০ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় আবার গণনা করে দেখলেন ১২৫০ থেকে ১৪৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে (১৩৩৭ খ্রীঃ) ৩০-এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ১৪৩২ শকের মধ্যে ২৯-এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ২৮ দণ্ড। 'এই পূর্ণ মাঘ মাস' বলতে মাঘ মাসের সমাপ্তি নির্ণয় করলে এই দুই সনের কোনো একটিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়ে থাকবে। ১২৫৯ শকের (১৩৩৭ খ্রীঃ) ভোরে বা ১৩৫৪ শকের (১৪৩২ খ্রীঃ) রাত্রিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় বলে মনে করা হয়। ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে মাঘ মাসের শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাসের শেষ। যোগেশচন্দ্রের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খ্রীঃ) ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রিতে।

যোগেশচন্দ্রের এই জ্যোতির্গণনা আর একদিক থেকে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে মনে করা হয় তিনি কোনো হিন্দু রাজসভায় গিয়েছিলেন, মুসলমান সুলতানের রাজসভায় নয়। ১৪৩২ খ্রীঃ কৃত্তিবাসের জন্ম হলে তিনি অন্তত *বিশ-বাইশ* বছর বয়সে (আনুমানিক ১৪৫২ খ্রীঃ) *গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়েছিলেন।* তখন শেষ পর্যায়ের ইলিয়াসশাহী বংশধর নাসিরুদ্দিন মাহমদ (১৪৪২-৫৯ খ্রীঃ) গৌড়ের সুলতান। সুতরাং পূর্ণ মাঘ মাস অর্থে জ্যোতিষ গণনা করলে গৌড়ের সিংহাসনে কোন হিন্দু রাজাকে পাওয়া যায় না। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র 'পূর্ণ শব্দকে 'পুণ্য' অর্থে বিচার করবার জন্য চেষ্টা করলেন। কারণ পুরানো বাংলা লিপিতে 'পূর্ণ' ও 'পুণ্য' শব্দের মধ্যে কোন লিপিগত পার্থক্য থাকত না। তাই পুণ্য মাঘ মাস গণনা করলে নিম্নলিখিত তারিখ পাওয়া গেল। ১৯০৮-২০ শকের (১৩৮৬-৯৬) মধ্যে ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবার ৫ দণ্ড পর্যন্ত শুক্লা চতুর্থী। ঐ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হলে তিনি তখন বিশ বছরের যুবক। তখন রাজা গণেশ স্বল্পকালের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাস সম্ভবত গণেশের রাজসভায় গিয়েছিলেন। অতঃপর ১৩২০ শক অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম এই মতামত গ্রাহ্য হয়েছে। এই তারিখ সত্য হলে কৃত্তিবাস ১৪০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে ফুলিয়া ত্যাগ করে উত্তরবঙ্গে অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন এবং ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজা গণেশের সভায় উপনীত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে গণেশই দনুজমর্দনদেব ধারণ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে তিনি পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য গৌড়েশ্বরের কাছে সম্মান লাভ করেছেন। এই গৌড়েশ্বরের সভা ও সভাসদ্‌দের বর্ণনা কাব্যের মর্যাদা ও মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সভা ও

সভাসদ্‌দের বিবরণী উল্লেখ করলেও কোথাও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি। কবি কেন নিজ জন্মশক গোপন করেছেন কেনই বা গৌড়েশ্বরের নাম গোপন করেছেন তা এক সমস্যার বিষয়ও বটে।

রাজা গণেশ স্বল্পকালের জন্য গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেও অতিশয় বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। সুতরাং চারপাশে আমীর ওমরাহ পরিবেষ্টিত হলেও সভাস্থলে তিনি হিন্দুদের ভাবধারা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। পাত্রমিত্রগণ সকলেই উচ্চবংশোদ্ভুত। কৃত্তিবাসকে সম্মান প্রদর্শনের রীতিনীতিও হিন্দু আচার অনুষ্ঠানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে পারিষদ 'কেদার-খাঁ' এর খাঁ উপাধি দেখে মনে হয় সভাতে মুসলমানী ভাবধারাও বহাল ছিল। আমাদের অনুমান, কবি হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই মুসলমান শাসকের নাম গোপন করেছেন।

গণেশের পুত্র যদু যিনি জালালউদ্দিন নাম ধারণ করে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের প্রতি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে জোর করে মুসলমান ধর্মে সামিল করেছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস এই বিধর্মী অত্যাচারী সুলতানের সভায় যাননি। তাহলে কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের রাজসভা যদি গণেশেরই রাজসভা হয় তবে তার অলঙ্কৃত বর্ণনা এমন কিছু অস্বাভাবিক হয়নি। যোগেশচন্দ্রের 'পুণ্য মাঘ মাস' গণনা যথার্থ হলে কৃত্তিবাস গণেশের সভায় গিয়েছিলেন এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এখনও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন এই গৌড়েশ্বর গণেশ নন—তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ১৩৪০ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন রায়, এই মত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৩৪৮ সনের আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী ও কালনির্ণয়' নামক প্রবন্ধে এই মত স্বীকার করেছেন। কৃত্তিবাস গণেশের সমসাময়িক তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ-এর সভাতেই গিয়েছিলেন। বিবরণী অংশে উল্লিখিত সভাসদ্‌দের অনেকেই কংসনারায়ণের আত্মীয়।

কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই মত গ্রহণ করেননি। 'রাজসাহী গেজেটিয়ার' অনুসারে কংসনারায়ণ তাহিরপুরের রাজবংশের ৪র্থ বা ৫ম পুরুষ। কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় তাহিরপুরের ৫২ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্যনারায়ণ শাহ সুজার বিষনজরে পড়ে জমিদারী থেকে বঞ্চিত হন এবং দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় নীত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান। ১৬৫০ খ্রীঃ শাহ সুজা রাজস্ব বন্দোবস্ত করবার সময় জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহিরপুরের সূর্যনারায়ণের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যনারায়ণের পতন ঘটলে তাঁর পিতা ইন্দ্রজিৎ জমিদারী লাভ করতে পারেন। তা হলে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কংসনারায়ণের কাল পিছিয়ে

দেওয়া যায় না। সুতরাং ১৬শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আবির্ভূত কংসনাবায়ণকে কৃত্তিবাসের আত্মবিববণে উল্লিখিত গৌড়েশ্বররূপে কল্পনা করা যায়।

কৃত্তিবাসেব আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে কতকগুলি বিশেষ পূর্ব ধারণার জন্য গবেষকদের পরস্পর বিরোধী কাল পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনা প্রসূত সামঞ্জস্যবিধান প্রয়াসের সম্মুখীন হওয়ায় এ বিষয়ে কোন মীমাংসায় পৌঁছানো বেশ জটিল হয়েছে।

এই যুক্তিগুলি অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্মসময়কে মোটামুটি ১৪৬০ খ্রীঃ থেকে ১৪৯০ খ্রীঃ এই কাল পরিধির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এতে চৈতন্যপূর্বতা প্রতিষ্ঠিত হয় অথচ চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান কৃত্তিবাসের কালকে প্রাচীন পর্যায়ে নিয়ে গেছে তাও খণ্ডিত হয়। কৃত্তিবাসের রচনার যে ভাষারূপ ও কবির মানস-সংস্থিতি প্রতিফলিত তা অতি প্রাচীনত্বেব বিরোধী ও চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্ব যুগে অবস্থিতির অনুকূল।

আবির্ভাব কাল বিতর্কের পর তাঁর রচিত রামায়ণের সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এমন কোন আদি ও প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি যাতে কবিকর্মের কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা সম্ভব। নানা সূত্রে পাওয়া নানা সময়ের অনুলিখিত পুঁথির বিভিন্ন অংশ পছন্দমত উদ্ধার করে কৃত্তিবাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে আগ্রহী গবেষকরা সুকুমার সেনের কথায় 'অসম সাহসিকতারই নামান্তর'। তবু এ বিষয়ে সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণেব একটা সাধারণ কাঠামোর ইঙ্গিত অবলম্বনে 'শ্রীরাম পাঁচালী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় কৃত্তিবাস ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ। পরবর্তীকালে বাঙালা বামায়ণের অনুধাবন করলে দেখি কাহিনী বাহুল্য, ভাবাবেগ প্রধান গার্হস্থ্য জীবনসৌন্দর্যের কোমল অভিব্যক্তি, সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণে, কাহিনী পরিকল্পনায় ও উপস্থাপন পদ্ধতিতে একটি সাধারণ ভাব-তন্ময়তাই বাঙলা রামায়ণকে বাল্মীকির বচনার ঐতিহ্য থেকে পৃথক করেছে। বলা বাহুল্য বসপরিণামের এই পার্থক্য গ্রন্থাদর্শ পার্থক্যের জন্য সর্বাংশে সূচিত হয়নি, বাঙলার চৈতন্য সংস্কৃতি প্রভাবিত মধ্যযুগীয় চেতনা ও জীবনবোধের দ্বাবাও বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। এই নিষ্ঠাব সঙ্গে কবির জীবনবোধ ও লোকহিতকারী মনোভাব রক্ষার চেষ্টাও ছিল। ঐতিহাসিক বিচারের ভিত্তিভূমি থেকে বলা চলে কৃত্তিবাস মধ্যযুগের বাঙলা অনুবাদ সাধনার প্রেরণারূপ অবিনশ্বব ঐতিহ্য। এখানেই অজ্ঞাতবলে পরিচয় রচনা প্রামাণিকতাহীন। নামমাত্রসর্বস্ব কৃত্তিবাসেব ঐতিহাসিক মূল্য কালেব চক্রতলে কবির সৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব এবং যুগপবিচয় সমস্ত লুপ্ত হয়েছে সত্য। কিন্তু জাতীয় বসচেতনার উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন রূপহীন হয়েও তা অপরূপ বসে গন্ধে ভবপুর হয়ে আছে। এই অপরূপ ঐতিহ্যকেই স্মরণ করে তার চাবপাশে কালক্রমে গড়ে উঠেছে বাংলার কাব্যগুচ্ছ। এই দিক থেকে কবি কৃত্তিবাস সত্যই কীর্তিবাস।

কৃত্তিবাস পেয়েছিলেন আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। তার অন্যতম কারণ রামায়ণের গল্প বলতে গিয়ে তিনি অনেক জায়গায় স্বাধীনতা নিয়েছেন।

'নাহিক এসবকথা বাল্মীকি রচনে
বিস্তরিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।'

কিংবা—

'এসব গাহিল গীতি জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি-যা গাই তাহা বাল্মীকির মতে।'

বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন, মহীরাবণ-অহিরাবণের কাহিনী, দেবী চণ্ডিকার অকালবোধন, হনুমানকে দিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষু বাবণের কাছে রামের বাজনীতি শিক্ষা, সীতা নির্বাসনের ভিন্ন কারণ দর্শানো—এসবই তাঁর নিজস্ব।

কৃত্তিবাসী রামাযণকে বলা হয় 'সাত নকলে—আসল খাস্তা' তবু তিনি 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি।' রামলক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতাব লাঞ্ছনা আজও বাঙালির মনকে নাড়া দেয়। বীরবসের বদলে রামের চরিত্রে ফুটেছে দূর্বাদল-শ্যামল কমনীয়তা। এখানে রামচন্দ্র ভক্তের ভগবান, সীতা যেন—'কোনো এক গাঁযের বধূ', হনুমান যেন অতি বিশ্বস্ত আজ্ঞাদাস। তাঁর ভাণ্ডারে বাঙালির ঠাট্টা তামাসা, ঝগড়া- কোঁদল গ্রাম্য গালাগালি কিছুরই বাদ নেই। তিনি ছিলেন 'ডিটেলম্' লেখায় সিদ্ধহস্ত। গাছপালা, পশুপাখি, খাবার দাবার সবকিছুই এখানে বাংলাদেশকে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর পাঁচালিতে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে সেকালের বাঙালির জীবন।

কৃত্তিবাসের সময়ে সম্ভবত রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে ভক্তসমাজের ভক্তি-আরাধনার বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন. রামায়ণও ভক্তিকাব্য হতে আরম্ভ করেছে। তাই এখনকাব কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আবার এই ভক্তিরসের সুরটিকেই প্রধান সুবরূপে দেখতে পাই অবশ্য রামায়ণের এই কাহিনীতে তেমন ব্যাকুল উচ্ছ্বাসবহুল হয়ে উঠতে পারেনি সেই ভক্তিরস। ফলে বাল্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে বাঙালী জীবনের কমনীয়তা মিশে কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত ভক্তি উপাখ্যানে পবিণত হয়েছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীব জাতীয় মহাকাব্যরূপে গণ্য হয়েছে।

মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক প্রতিভা

আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যে বৈশিষ্ট্যটির প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সব সমালোচকই একমত, তা হল, সে যুগেব পক্ষে অচিন্তনীয় তিন 'শ বছর ভবিষ্যতের সামগ্রী, মুকুন্দ কবিমানসের ঔপন্যাসিক চেতনা। কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস সম্পূর্ণ আধুনিককালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব ও চরম পরিণতি ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু 'উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগের আগে বাংলা ভাষায় যদি এমন কোন গ্রন্থের নাম করিতে হয় যাহাতে আধুনিককালের সাহিত্যবস্তুর—উপন্যাসের রস কিছু পরিমাণেও পাওয়া যাইতে পারে তবে সে বই কী তাহা সহৃদয় যিনি মানে বুঝিয়া মুকুন্দরামের কাব্য পড়িয়াছেন তিনিই বুঝিবেন।' বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরোদ্গমের আলোচনায় মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামকে স্মরণ না করে উপায় নেই। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ধারায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' একটি অভিনব মঙ্গলকাহিনী। কবি নিজে কি কারণে এই মনোভাব পোষণ করতেন, তার আলোচনায় প্রবেশ না করেও অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আধুনিক পাঠক যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যে মুকুন্দরামের কাব্যের প্রতি আজও আকর্ষণবোধ করে থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল কবির এই ঔপন্যাসিক চেতনা।

উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি। গদ্যসাহিত্যের উদ্ভবের পবে উপন্যাসের জন্ম হয়। উপন্যাস চলমান সমাজের বাস্তবতার কাহিনী, উপন্যাস বুদ্ধিজীবী মনের ব্যক্তিতান্ত্রিক সৃষ্টি। উপন্যাস স্থিব সেতুর উপর দাঁড়িয়ে বহমান নদীর স্রোতদর্শন। 'Product of The Individual'—এই হচ্ছে উপন্যাসেব লক্ষণ। সুতরাং মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক গদ্যহীন সাহিত্যে উপন্যাস জন্মাতে পারে না। তবুও মুকুন্দরামের প্রতিভার ঔপন্যাসিকসুলভ গুণ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ উপন্যাস যদি 'story of the people' হয় তবে 'চণ্ডীমঙ্গলে' তা আছে। বাস্তব চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রসমূহের কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণেব সার্থক সামঞ্জস্য স্থাপন করে আদি-মধ্য-অন্ত সংযুক্ত একটি কাহিনী সৃষ্টিই আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। ভারতচন্দ্রের কাহিনী সৃষ্টির ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকলেও মুকুন্দরামের স্বকীয় প্রেরণা গতানুগতিকতার মধ্যে বৈচিত্র সম্পাদন করে পুরাতনের আধারে নূতনের আস্বাদ দান

করেছিল। প্রচলিত কাহিনীর কাঠামোটির অনুসরণে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন শ্রোতৃসাধারণের কাব্যপ্রবৃত্তির যুগগত সীমাবদ্ধতার জন্যে। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে আপন মৌলিক প্রতিভার স্ফুরণের সুযোগ আবিষ্কার করেছিলেন। তাই কাহিনীর দিক থেকে বিচার করলেও মুকুন্দরামের কাব্য সত্যই ছিল 'নূতন মঙ্গল'। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> 'মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, ...সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে আমরা ভবিষ্যতকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি।'

অর্থাৎ 'অনিবার্যভাবে তাঁর বাস্তবতাবোধ, বিশদতাজ্ঞান (সেন্স অব্ ডিটেইলিং), চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যে, সংলাপ বয়ন এবং জীবনদৃষ্টি সমালোচককে এমনতরো বাক্য উচ্চারণে উৎসাহিত করেছে।' মুকুন্দরাম এ যুগে একজন ঔপন্যাসিক না হলেও সার্থক গদ্যকার যে হতেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুন্দরাম যুগের দাবি কবিভাষার প্রভাব অগ্রাহ্য করে গদ্যভাষায় লেখার চেষ্টা করেননি।

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কাহিনীরস নয়—Characterisation। মুকুন্দরাম চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্টই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক কালকেতু। নায়িকা ফুল্লরা। কিন্তু এরা গতানুগতিক নায়ক-নায়িকা নয়, কারণ মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজজীবনের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। নগব পত্তন ও প্রজাপত্তন উপলক্ষ্যে কালকেতুর আচরণ, তার প্রতি মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্তের ব্যবহার, প্রাণভয়ে ধান্যঘরে তার আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি তার মানবিক আচরণের পরিচায়ক। 'এই সকল কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমরা দেবী মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়া এক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের রস আস্বাদন করিতে থাকি। মুকুন্দরামের দৃষ্টি বৃহত্তর সমাজ পটভূমিকার উপর প্রসারিত ছিল বলিয়াই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।' 'সাধারণ নর-নারীর মনে সাংসারিক ঘটনা-দুর্ঘটনায় যে স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা তিনি সুনিপুণ অথচ অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন।' বমেশচন্দ্র দত্ত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যপাঠে সন্তোষ লাভ করে মন্তব্য করেছেন—

> 'The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature.'

উপন্যাস সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিকায় স্থাপিত। কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা এই সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসোচিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কালকেতুর কলিঙ্গদেশ জয় ও সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যের মধ্যে দিয়েই এই পরিচয় স্পষ্ট হয়। 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'র ভূমিকায় ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন।—

'কবিকঙ্কনের সাহিত্যখ্যাতির সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম সমাজবোধ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।'

সব মঙ্গলকাব্যেই মধ্যযুগের বাঙালীর জীবনের বাস্তব ছবিই প্রধান হয়েছে। বাঙালী

সমাজ এবং পরিবাব জীবন, জাত কর্ম থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবখণ্ডের কথা অবশ্যই থাকবে, অলৌকিক ঘটনার ভূমিকাও সুবিস্তৃত থাকে। মঙ্গলকাব্যের এই সব সাধাবণ বস্তুধর্মের মধ্যে মুকুন্দবাম বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী; তিনি অভিজ্ঞতাব কবি। মুঘল পাঠানের দ্বন্দ্বে দীর্ণ ও অস্থির সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর জীবনের এক বিস্তীর্ণ সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর এই ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অঙ্গীভূত করে একে এক অপূর্ব রসরূপ দিয়েছেন। অত্যাচারী ডিহিদার মাহ্‌মুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি নিজের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন; অতএব গৃহ থেকে নির্বাসনের যে কি দুঃখ, তা তিনি অনুভব করেছিলেন, সেই জন্যেই গুজবাট নগর-পত্তন উপলক্ষে তাঁর কালকেতু গৃহহীন বুলান মণ্ডলকে বলেছে—

'শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূব
কানে দিব কনক কুণ্ডল।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিও কর।।'

অর্থাৎ যে জীবন তাঁব নিজস্ব অভিজ্ঞতাব অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার সুখ-দুঃখ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে নিজে হেসেছেন, কেঁদেছেন, তাকেই তাঁর বচনায় জীবন্ত করে তুলেছেন। মুকুন্দরামের বাজার আচাব-আচরণে আরড়াব বঘুনাথ জমিদারের চেয়ে তারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি নন। কবি আপনার পবিচিত জমিদারী কর্মতৎপরতাব বাইরে পা বাড়াতে চান নি।

চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি অংশ—দেবখণ্ড, দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ। পার্বতী উমাব সঙ্গে শিবের বিবাহ প্রভৃতি পুবাণাশ্রিত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। উমা মহেশ্বরের বিবাহ কাহিনী কালিদাসের মত কবিও উপকরণ হিসাবে অবলম্বন কবেছেন। ঐ একই উপকরণ নিয়ে মুকুন্দরাম কিছু বাঙালি পবিবারেব একটা খণ্ডচিত্র নৈপুণ্যেব সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাম্পত্য জীবন, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত মেয়েব লাঞ্ছনা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি একটা রসোজ্জ্বল ছবি পৌরাণিক পটভূমিব মধ্যে কবির মৌলিক প্রবণতার পরিচয় বহন করে। দারিদ্র্যই এখানে প্রধান সমস্যা।

ধনপতির কাহিনীতে দুই সতীনেব দ্বন্দ্বেব কেন্দ্রে একটা গোটা পরিবারের দুই পুরুষেব ইতিহাস ধরা পড়েছে। ধনপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি, তার সমস্যা তাই স্বতন্ত্র। এই দুটি কাহিনী যুক্তভাবে ধবলে উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর পরিবার জীবনের পূর্ণ ছবিই শুধু প্রকাশ পাচ্ছে না, সমকালীন পরিবার সমস্যার কেন্দ্রটিও যেন স্পর্শ করা যাচ্ছে।

চণ্ডীমঙ্গলের অপর কাহিনীটি অন্ত্যজ ব্যাধসমাজের। অন্ত্যজ সমাজের কাহিনী বর্ণনা কবতে গিয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজেব সঙ্গে তার পার্থক্য কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ব্যাধদেব পবিবার জীবনের স্বাতন্ত্র্য কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো কবি অবশ্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ব্যাধ জীবনেব উপব আরোপ করেছেন, অথবা কখনো আবাব

আজগুবি কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে কবি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার যে বর্ণনা করেছেন তাতে উপন্যাসোচিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কালকেতুর কলিঙ্গদেশ জয় এবং সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যের মধ্যে দিয়েই ওই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কন চণ্ডীর ভূমিকায় ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন—'কবিকঙ্কনের সাহিত্যখ্যাতির সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম সমাজবোধ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।' কবি তাঁর কাব্যে দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন কারণ দারিদ্র্যের বাস্তবতাকে তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি বা একে মায়া বলে তাচ্ছিল্য করেননি। সুতরাং আমরা বলতে পারি ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষণ প্রখর বাস্তবতাবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি যা মুকুন্দরামের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের সৃষ্ট নরনারী চরিত্রগুলো কতটা বাস্তবধর্মী তা কয়েকটি চরিত্র পরিচয় থেকে বোঝা যায়। কালকেতু ফুল্লরার চরিত্র মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গেছে। কালকেতু বীর এবং শিক্ষা সংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। দারিদ্র্যের জন্য যে নিত্য হাহাকার করে না, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের স্বল্পতা তার দেহকে পীড়িত করে। অর্থ সম্পদের উপর তার লোলুপতা না থাকলেও লোভ আছে। কালকেতু তার ব্যাধ জীবনের পরিবেশে চতুর না হলেও একান্ত নির্বোধ নয়। প্রয়োজনবোধে মুরারি শীলের ধূর্ততাকেও সে প্রতিরোধ করতে জানে, কিন্তু বুদ্ধির প্রসার অধিক নয়। তাই অপরিণত বুদ্ধি ধার ও ভাবের পার্থক্য বোঝে না, সাত রাজার ধন এক মানিক খচিত অঙ্গুরির তুলনায় সাত ঘড়া ধনই তার কাছে অধিক কাম্য, আপন বুদ্ধি সামান্যতার জন্য আত্মবিশ্বাস নেই, তাই যুদ্ধজয়ের পরেই ধান্যশালায় পলায়ন তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। ব্যাধজীবনের আরণ্য পরিবেশে সে জীবন্ত; কিন্তু রাজ্য পরিচালনার বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মান। নগর পত্তন ও প্রজাপত্তন উপলক্ষে কালকেতুর আচরণ তার মানবিক আচরণের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন 'এই সকল কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমরা দেবী মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়া এক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের রস আস্বাদন করিতে থাকি। মুকুন্দরামের দৃষ্টি বৃহত্তর সমাজ পটভূমিকার উপর প্রসারিত ছিল বলিয়াই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।'

কালকেতুর চরিত্র-কল্পনার পেছনে যে ভাব-বৃত্ত ফুল্লরায়ও তারই প্রকাশ ঘটেছে। সে চিন্তাহীন জিজ্ঞাসাহীন জীবন বহন করে। দুঃখে ভেঙ্গে পড়ার মানসিকতা ফুল্লরার নেই। অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য প্রতিবেশির কাছ থেকে অম্লানবদনে চাল ধার চাইতে সে দ্বিধা করে নি। ফুল্লরার বারমাসী সুখ-দুঃখের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি। একে গতানুগতিক বারমাসীর সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এর মধ্যেও মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক চরিত্র সৃষ্টির কৌশলই প্রকাশ পেয়েছে।

মুরারি শীল চরিত্রটি আনুপূর্বিক মুকুন্দরামের নিজস্ব সৃষ্টি। মুরারি শীল জাতিতে বেনে

সে 'লেখা জোখা করে টাকা কড়ি'। মুরারির খলতা চিত্রটি বেশ নিখুঁত। দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি কালকেতু যখন 'বেনে'র কাছে বিকোতে গেল, সম্ভবতঃ সে মাংসের দামের দরুণ বাকী পয়সা চাইতে এসেছে ভেবে মুরারি প্রথমে গা-ঢাকা দিল, তারপর লাভের গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে এসে হিসেব নিকেশ করে বিশুদ্ধ বণিকবুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে প্রতারণা করার জন্য বলে—

'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা কর‍্যাছ উজ্জ্বল।।'

নির্বোধ কালকেতু পর্যন্ত এই ধূর্তামি বুঝতে পারে। সে তখন চলে যেতে উদ্যত হলে মুরারি বলে 'এতক্ষণ পরিহাস কৈলু ভাইপোরে'।

মানব চরিত্র সম্বন্ধে কত গভীর উপলব্ধি থাকলে তবে যে এভাবে সামান্য দুই চার কথায় পুরো মানুষটির পরিচয় ফুটিয়ে তোলা যায় সে কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া সমাজে টাকা কড়ির স্থান ও মহিমা যে কেমন দৈব মাহাত্ম্য রচনাকালেও কবি তা ভুলতে পারেন নি।

ভাঁড়ু দত্ত নিঃস্ব ও নীচাত্মা, শঠ ও ধূর্ত—থাকবার মধ্যে একমাত্র আছে তার আত্মাভিমান, ও জাত্যাভিমান। কুলে শীলে সে কত মহৎ এই কথাই বার বার কালকেতুর কানে তুলে তার কাছে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কালকেতু নীচ জাতি এবং নিতান্ত দীন অবস্থা থেকে সে রাজ্য লাভ কবেছে এটা সে মানতে পারে না। এই জন্য বাইরে কালকেতুর সঙ্গে সে যে আচরণই করুক, ভিতরে তারই প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব কিছুতেই গোপন করতে পারে না। এই চরিত্রের মানুষ আজও সমাজে বিরল নয়। উচ্চ রাজপদাধিকারীর ভাণ করে ভাঁড়ু গুজরাট নগরীর হাটে গিয়ে ব্যবসায়ীদের উপর যে অত্যাচার শুরু করে তার পূর্বসূত্র মুকুন্দরামের নিজের স্মৃতিকথাতেই আছে।

মুরারী শীলের পত্নী বণ্যানীর চরিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণ্যানী যে একজন ধূর্ত মহাজনের উপযুক্ত পত্নী এই বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। যে মিথ্যা বলতে পটু, ধার শোধ না দেবার জন্য কি ধরনের কথা বলতে হয়, তা সে তার মহাজন স্বামীব কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। কারণ এটাই যে এই জাতিরই বৈশিষ্ট্য।

তাঁর ধনপতি আখ্যানের 'ধনপতি'র চরিত্রগত শৈথিল্য ও লঘু ইন্দ্রিয়পরতা নানা ঘটনার অন্তবালে লুকিয়ে আছে। গৃহে স্ত্রী লহনা বন্ধ্যা তাই প্রথম দর্শনমাত্র খুল্লনার প্রতি প্রণয় নিবেদনে সে দ্বিধান্বিত হয় নি এবং নানাভাবে লহনার সম্মতি আদায়ও করে নিয়েছে। নববিবাহের পব কতর্ব্য কর্মে অবহেলা প্রদর্শন, গৌড় রাজকার্যে যেতে আপত্তি, লহনার গুরুতর অপরাধ সত্বেও তাকে কোন রকম শাস্তি দিতে অসামর্থ্য, সবকিছুই ধনপতির চিত্ত-তারল্যের পরিচয় বহন করে।

কাব্যের বিস্তৃততম অংশ জুড়ে খুল্লনাব অবস্থান। খুল্লনার রোমান্টিক প্রেমের বিকশিত চিত্র নেই। পারিবারিক নিত্যতায় তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিকের মধ্যে স্বাভাবিক সংস্থিতি দিয়েছে। শ্রীমন্তের প্রতি বাৎসল্যে সে বাঙালী নাবীর পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়েই আত্মস্থ। খুল্লনার চরিত্রে বিশিষ্টতা না থাকলেও প্রাণরসেবও হানি কখনও ঘটেনি।

ধনপতি আখ্যানের দুর্বলা চরিত্রটি দ্বিমুখী। স্বার্থপর হীনমনা দাসীশ্রেণীর নারীও যখন শিশু-শ্রীমন্তকে ঘিরে একটি বাৎসল্য সিঞ্চিত আনন্দরসোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে—

'দুর্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত।
আনন্দে পুলকে শিশু নাচে গায় গীত।।'

তখন এক নব আলোকপাতে দুর্বলার সমস্ত হীন স্বার্থবুদ্ধিব অন্তরালে গভীর চীৎলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চরিত্র পরিকল্পনায় এই সব সার্থকতার জন্যই বলা হয়েছে যে, 'মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পেয়ে থাকি।'

শুধু বিষয়বস্তু নয় বা তার অন্তর্গূঢ়মানস-প্রকরণই নয়, বস্তুবিষয়ের প্রকাশগত দিকেও মুকুন্দরামের প্রতিভা বিস্ময়জনক। ধ্রুপদী পাণ্ডিত্য এবং লোকজীবন জ্ঞান, এ দু'য়ের সুসামঞ্জস্য প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনাশৈলীর মধ্যে। যেখানে যে অলঙ্কারটি মানায়,তাকে যথাযথভাবে বসিয়ে তিনি কাব্যশৈলীর মাধুর্য ঘটিয়েছেন। যেমন কালকেতু ও ফুল্লরার সঙ্গে মানানসই কেমন সে প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন ''হাঁড়ির মত সরা'' আর রূপবতী সতীনের প্রতি ঈর্যায়, লহনা নারীর দেহে যৌবনাগমের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উপমা করেছেন—

'নাজানি দৈবের মাইয়া আসি কোন্ পথ দিয়া
নারিকেলে সান্ধাইল পানী।।'

লোক-জীবনের প্রাত্যহিক উপমান-উপমেয়-কেন্দ্রিক এই ধরনের অলঙ্কারের বিন্যাস করতে পারার কারণেই তিনি যথার্থ রিয়ালিস্ট, প্রকৃত ঔপন্যাসিকের গুণসম্পন্ন।

ভাঁড়ু দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ। 'মুকুন্দবামের কাব্যেই ভাঁড়ুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, পুরানো বাংলা সাহিত্যে এমন উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড চরিত্র আর নাই।' সর্বৈব ব্যর্থতার পাষাণপ্রাকারে মাথা ঠুকে ঠুকে জীবন উপভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভাঁড়ুর সমগ্র জীবনবোধকেই তিক্ততার চন্দন পঙ্কে অভিষিক্ত করেছে। অন্যান্য কবিদের রচনায় ভাঁড়ুর বহিরঙ্গীয় পাষণ্ড রূপটিই প্রকাশিত, কিন্তু মুকুন্দরাম তার পিছনের ব্যর্থতা ও হাহাকারকে আবিষ্কার করেছেন এবং শত লাঞ্ছনার শেষে মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতু তাকে ক্ষমা করে গুজরাটে ভদ্র জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'র ভূমিকায় অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন—

'কবিকঙ্কনের বর্ণনা প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিকতা অতিক্রম করিয়া জীবন-রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।'

Sense of Humour ঔপন্যাসিকের অন্যতম গুণ। মুকুন্দরামে এই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিমকটাক্ষ,

অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের নানামুখী বিস্তার হইতে ইহা তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।'

ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষণ প্রখর বাস্তবতাবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি—মুকুন্দরামে তা যথেষ্ট, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> 'তিনি মর্ত্যের মানবচরিত্র অঙ্কনে যে সহানুভূতি, বাস্তবজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দর্শনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাহা মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ।'

আধুনিক উপন্যাসের স্বভাব যুক্তিবাদ ও কার্যকারণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা। মুকুন্দরামের কাব্যে কোথাও অহেতুক অলৌকিকত্বের বা কার্যকারণ শৃঙ্খলাহীনতার পরিচয় নেই। চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় মনসার অহেতুক দাবী। কিন্তু কালকেতুকে উক্ত নির্বাচনের পিছনে রয়েছে পশুদের দুঃখের প্রতিকারের দাবী। তাছাড়া কলিঙ্গদেশে প্লাবন এর দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন মহাকাব্যে কাব্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অলৌকিক ক্ষমতা গুণের আরোপ করা হয়। আধুনিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা দোষেগুণে মিশ্রিত মানুষ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মুকুন্দরামের নায়ক-নায়িকারা সর্বাধিক দোষে-গুণে মেশানো। 'কাব্যের প্রথমাংশে দেবখণ্ডে অন্যান্য কবিরা যেখানে দেবীর রণোন্মত্তা দৈত্যদলনী ভয়ঙ্করী মূর্তি এঁকেছেন, মুকুন্দরাম সেখানে দেবীকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহিণীব প্রতিমূর্তি হিসাবে নবরূপে কল্পনা করেছেন।' মাতৃকেন্দ্রিক বাঙালীজীবনের আধারে দেবীর নবরূপায়ণ তাঁকে মানুষেব কাছে আরও আপনার করে তুলেছে। অসাধারণ সামাজিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কবি বাঙালী হিন্দুর বর্ণবিন্যাসের দূরতম সীমান্তেও উচ্চবর্ণের জীবনানুসরণের যে প্রবণতা উপলব্ধি কবেছিলেন কাব্যের মধ্যে তাকে প্রকাশ করে আপাত অবিশ্বাস্যতাব মধ্যেও গভীর বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের গভীরে এই গূঢ়গোপন সত্য আবিষ্কার করেছেন বলেই মুকুন্দরাম জীবনরসিক আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা অন্যান্য কবিরা সেখানে দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনীর রচয়িতামাত্র। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।'

ভারতচন্দ্র

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি প্রতিভার নিন্দা প্রশংসার যত আলোচনাই হোক না কেন সময়ের দর্পণে রবীন্দ্রনাথই আজও দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো। প্রাক-আধুনিক মধ্যযুগে পাঁচালী সাহিত্যের অঙ্গনে একইভাবে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র নিজের রচনাগুণেই পেয়েছেন কালজয়ী মহিমা। পৃষ্ঠপোষক রাজবংশের নুন খেলেও গুণ গেয়েছেন আশ্চর্য কবিভাষায়। বংশ প্রশস্তির বাইরে এসে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে'। তাঁর লিপি কুশলতা প্রায় দেড়শো বছর ধরে রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শব্দের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় তিনি পাঁচালী সাহিত্যের মরা ডালে ফুল ফুটিয়েছেন। তাঁর কাছে কবিতার কলাকুশলতা ছিল ইষ্ট সিদ্ধিব বীজমন্ত্র। সেই মন্ত্রশক্তির হীবকদণ্ড হাতে নিয়ে একটি রাজবংশের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে দৈবী মহিমায় কাহিনী মিশিয়ে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' নামক একটি 'Over the hills far away' এই বহু প্রচলিত ইংরাজী আপ্তবাক্যটিকে সার্থক করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলকাব্য রচয়িতা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলগো আকুল কবিল মোর' প্রাণের মূল সুরটি ধরতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রে এখানেই অনন্যতা।

ডঃ আশুতোয ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—

'খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ কবিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল, বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে তাহাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।'

আমরা বুঝতে পারি ডঃ ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রকে মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি বলে মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দের অন্যতম প্রধান কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর অন্নদামঙ্গল গান প্রাচীন আর নবীনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগ পরিবর্তনের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। মধ্যযুগের হয়েও ভারতচন্দ্র তাঁর আধুনিকতার হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলেন একালের বাংলা সাহিত্যকে।

সমাজে তখন আসছে দিন বদলের পালা। পুরনো বিশ্বাস যাচ্ছিল ভেঙে। দেবদেবীদের পিছনে ফেলে সাহিত্যের সামনের আসন জুড়ে বসছিল মানুষ।

'মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার পরে
করে দেব মহিমা নির্ভর।'

এই কবিবাক্য চূড়ান্ত করে দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। নিছক দৈব কৃপা প্রেরণার উৎস না হয়ে জায়গা করে নিচ্ছিল সচেতন নির্মাণ। সেই নির্মিতির প্রথম কারিগর ভারতচন্দ্র শ্রোতাকে পাঠকের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। এইজন্য সাহস করে তিনি ছন্দ প্রয়োগ অলংকার-প্রয়োগ এবং লিপি কুশলতার প্রতি বাড়তি মনোনিবেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। বাংলা সাহিত্যের গায়ে পশ্চিমীসাহিত্যের হাওয়া না লাগা সময়ে নাগরিক জনমণ্ডলীর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন ভারতচন্দ্র।

বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীকে নবাবী আমলের যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে মুঘল শাসন শিথিল হয়ে পড়লে স্থানীয় নবাবদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছিল। এই সময় বাংলাদেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলার নৈতিক সঙ্কটের কাল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক অবক্ষয় বাঙালীর সমকালীন সমাজ জীবনকে আলোড়িত করেছিল। রাজদরবার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই নিয়ে অবিরত শঠতা ও ষড়যন্ত্র চলেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক শোষণ মানুষের মন থেকে আত্মবিশ্বাসকে হরণ করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রজীবনে পালাবদলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর পরবর্তী বাংলা নবাবেরা ছিলেন বিলাস-ব্যাসন ও উচ্ছৃঙ্খলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নবাব আলিবর্দীর সময়ে (১৭৪০) ক্রমাগত বর্গী আক্রমণ বাংলার কৃষিজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব যা বাণিজ্যব্যবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছিল। একদিকে যখন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য অতলস্পর্শী, অন্যদিকে তখন নবাবের প্রমোদবাসনা কিংবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিত্তবৈভব আকাশচুম্বী। রুচি-বিকৃতি, ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধহীনতা একালের সাধারণ লক্ষণ। পরস্পর আবিল কৌতুক প্রকাশক স্থুল হাসি-ঠাট্টা তামাসাকে লোকেরা অভিজাত আচরণ বলে ভাবতে শুরু করেছে। দেশব্যাপী অনুরূপ ভণ্ডামি, ব্যাভিচার, কলুষিত অবক্ষয়ী সমাজের মধ্যে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব।

ভারতচন্দ্রের কবি জীবনের মৌলিক সূত্র দুটি। কিছুটা তাঁর আত্মপরিচয় আর কিছুটা কবি ঈশ্বর গুপ্তের একান্ত চেষ্টায় (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনা। এসব সূত্র থেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে যা জানা গেছে তা হলো এখনকার হাওড়া জেলার ভুর্সুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে ১৭১২ সালের (মতান্তরে ১৭০৫) কাছাকাছি কোনও সময়ে এক ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে (ভরদ্বাজ গোত্রের মুখোপাধ্যায় বংশে) ভারতচন্দ্রের জন্ম। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ এবং মাতা ভবানীদেবীর তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁদের পূর্বপুরুষ জমিদারী সূত্রে রায় উপাধি পেয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ জোর করে জমিজায়গা দখল করে নিলে নরেন্দ্রনারায়ণের অবস্থা পড়ে যায়। ভারতচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় মামার বাড়ীতে (আমতার নিকটস্থ নওয়াপাড়া)। সেখানে তিনি তাজপুর টোলে সংস্কৃত,

ব্যাকরণ ও অভিধান শেষ করেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্বমতে এক ব্রাহ্মণ বালিকাকে বিয়ে করার জন্যে তিরস্কৃত হয়ে নববধূকে বাড়ীতে রেখেই গৃহত্যাগ করে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে ফার্সী শিক্ষা করেন। এখানেই ছোট দুখানি সত্য নারায়ণের পাঁচালী রচনার মধ্যে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত। পরে বাড়ীতে আবার ফিরে এলে বাবা তাঁকে তাঁর ইজারা নেওয়া জমিদারীর দেখাশোনার ভার দেন। সেই সুবাদে খাজনা মেটাতে গিয়ে বর্ধমানে এলে এক আমলা রাজবল্লভের চক্রান্তে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। পরে কৌশল করে সেখান থেকে পালিয়ে পুরী চলে গিয়ে কিছুদিন বৈষ্ণবদের আখড়ায় থাকেন। টিপ্পনী কেটে বলেছেন ঃ

'চলো যাই নীলাচলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত,
মাথায় মুছিব হাত,
নাচিব গাইব কুতুহলে।'

এরপরে বৃন্দাবনে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন, তখন পথে হুগলী জেলার খানাকূল কৃষ্ণনগর গ্রামে হঠাৎই রাস্তায় তাঁর ভায়রাভাই এর সঙ্গে (শ্যালিকা পতি) দেখা হলে বৃন্দাবন যাত্রায় ছেদ পড়ে। পবে ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি ফরাস ডাঙায় গিয়ে ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীব সংস্পর্শে এলে তাঁকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন ব্যবস্থা করে দেন। 'গুণাকর' উপাধি দেন তাঁকে। মূলাজোড়ে তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থাও করে দেন কৃষ্ণচন্দ্র। ভারতচন্দ্র সেখানে নিয়ে যান তাঁর বৃদ্ধ পিতা এবং গৃহদেবতাকে। এরপর পৈতৃক ভিটার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়। ১৭৬০ সালে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ডায়াবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের একমাত্র কীর্তি অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণা মঙ্গল কাব্যরচনা। রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ)।

'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।'

কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড অন্নদামাহাত্ম্য—এখানে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, জগৎ সৃষ্টি কথা, শিবায়ন, ব্যাসকাহিনী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল-- এখানে কালিকাদেবীর পূজা প্রচারের জন্য দুই দেবযোনীর (যোগানন্দ-যোগবতী) মর্ত্যে আগমন এবং তাদের স্বর্গে প্রস্থান নিয়েই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। কবি উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কাশ্মীরি কবি বিহ্লনের লেখা চৌবপঞ্চাশিকা এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ। এটি একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী।

তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ—সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি মানসিংহের বিবাদ এই অংশের মুখ্য বিষয়। রাজা মানসিংহ

বাংলায় এলে ভবানন্দ তাঁকে সাহায্য করেন এবং তিনি মানসিংহের কাছে জমিদাবী প্রার্থনা করেন। মানসিংহ অংশের ঘটনাবলী অনৈতিহাসিক। কারণ, ঐতিহাসিক কোনও সূত্রে এই ঘটনার প্রমাণ নেই।

অন্নদামঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যেব অঙ্গনে সমষ্টি নয় ব্যাষ্টি প্রধান নাগরিকতার কাব্য। নাগরিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গান তীক্ষ্ণ রসবোধে পূর্ণ এক সম্পন্ন সাহিত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন–– '.......যে ভক্তিমূলক মনোভাব হইতে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সেই ভক্তির স্রোত বহুকাল পূর্বেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই অন্নদামঙ্গলে শিল্পসুষমার চমৎকৃতির দ্বাবা তিনি বিষযবস্তুর একঘেঁয়েমির ক্ষতিপূবণ করিতে চাহিয়াছিলেন।'

যদিও অন্নদামঙ্গল বাইবের দৃষ্টিতে একটিমাত্র কাব্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তিনটি খণ্ডের সমষ্টি।

প্রথম খণ্ডে আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আলীবর্দী খাঁ কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁকে উদ্ধার করলেন দেবী অন্নপূর্ণা। সভাকবি ভাবতচন্দ্রকে দিয়ে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। এরপর আছে শিব পার্বতীর উপাখ্যান। অন্নপূর্ণা হয়ে পার্বতীর বুভুক্ষু শিবকে অন্নদানের কাহিনী। অন্নপূর্ণার কাশীতে অধিষ্ঠান। তাঁকে অসম্মানিত করতে নতুন কাশী গড়তে গিয়ে ব্যাসের দুর্গতি। এরপর হরিহোড় নাম দিয়ে কুবেরের এক অনুচরকে পাঠিয়ে মর্ত্যে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচলিত হল। বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করায় ক্রুদ্ধ অন্নপূর্ণা শেষে ভবানন্দের বাড়ীতে এসে স্থায়ীভাবে স্থিতু হলেন। ভবানন্দ হলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

মানসিংহ গল্পে ভবানন্দের সম্মান বৃদ্ধি পাযনি। তিনি দেশপ্রেমিক প্রতাপাদিত্যকে হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন এবং মৃত অবস্থায় দিল্লীব বাদশার হাতে তাকে তুলে দেয়। ভারতচন্দ্র কেন ভবানন্দের এই দেশপ্রেমহীনতাকে মেনে নিলেন আমরা তা বুঝতে পারি না। যদিও এখানে অন্নপূর্ণার কৃপায় ভবানন্দ দৈববলে বলীযান হয়েছিলেন এমন একটি দৈব মাহাত্ম্য প্রচারিত হযেছে। শেষে অন্নপূর্ণাব আশীর্বাদ লাভের জন্য ভবানন্দকে কারারুদ্ধ করেছিলেন মানসিংহ। দেবীব অনুচব বর্গ ক্ষেপে গিয়ে দিল্লীর বাজধানীর বুকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটায। প্রায় বাধ্য হয়ে অন্নপূর্ণার পূজা দিয়ে আর ভবানন্দকে রাজদত্ত সম্মানসূচক পোশাক খেলাপ দিয়ে সেই সঙ্কট থেকে তিনি উদ্ধার হন।

শেষ খণ্ড প্রণয়মূলক আদি-রসাত্মক গল্প। নরনাবীব স্বাধীন প্রেমের রোমান্টিক লোক কাহিনী নির্ভর এই কাহিনী ভারতচন্দ্রের হাতে ভাষাব বাক্‌বৈদগ্ধে অত্যন্ত আধুনিক হয়ে উঠেছে। প্রেমের সাধনায শাবীরিক মিলন বিবহেব চিবন্তন দাবীকে ভারতচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন সহজে। শ্লীল-অশ্লীলেব মধ্যে কোন সীমারেখা না টেনেই তিনি লয়লা-মজনু বা মাধবী মালঞ্চী কইন্যার মতো দুবন্ত প্রেমের ফুল ফুটিযেছিলেন আদি রসের খাসমহলে।

বিদ্যাসুন্দর গল্পটি এইবকম, 'রাজকুমাব সুন্দর রূপে গুণে ছিলেন অসামান্য। গভীর

রাতে সে কালিকা দেবীর পুজো করে বর অর্জন করল যে বিদূষী রাজকন্যা পরমাসুন্দরী বিদ্যাকে সে তার স্ত্রী হিসাবে পাবে। দেবী তাকে দিলেন একটি শুকপাখী। সুন্দর গৃহ পরিত্যাগ কবে গোপনে তাকে নিয়ে বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হল। রাজবাড়িব অন্দরমহলে হীরা নামেব এক বৃদ্ধ মালিনী ফুলের জোগান দেয়। সেই বৃদ্ধার সুন্দরকে দেখেশুনে পছন্দ হওয়ায নিজের ঘরে তাকে আশ্রয় দেয়। এরকম একটা সচিত্র প্রেমপত্র মালার মধ্যে গুঁজে বৃদ্ধার মাধ্যমে রাজকুমারী বিদ্যাব হাতে পাঠিয়ে দিল। কালিকাদেবীর কৃপায় সুন্দর মালিনীর ঘব থেকে রাজবাড়ীর অন্তঃপুর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলল। এইভাবে তারা রোজ রাতে মিলিত হত। এরপর বিদ্যার অন্তঃসত্তা হওয়ার কথা তার বাবা মা জানতে পাবে। তাঁরা অপবাধী যুবককে খুঁজে বের করার জন্য হুকুম দেন। সুন্দর ধবা পড়ে এবং শাস্তিতে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হল। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আগে সে কালিকাদেবীকে স্মরণ কবল। সুন্দবকে রাজপুত্র হিসাবে চিনত, এমন একজন লোক সেখানে এসে যাওযায সুন্দর বেঁচে গেল। অতঃপর সুন্দরকে মুক্তি দেওয়া হল এবং রাজকুমারী বিদ্যার সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে দেওয়া হল। তাদের একটি সুন্দর পুত্রসন্তান হল। এব কিছুদিন পর বাজকুমাব সুন্দর তার পুত্র পরিবার নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল'।

সহজ গল্প কিন্তু তাব বর্ণিত নকশায় আছে ভারতচন্দ্রেব মুন্সিয়ানা। তা সুন্দরের পুনরাগমনের বর্ণনায যা মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতে বা বিদ্যার রূপবর্ণনায় বা কোটালের উৎসব সমাগমে। কবিব দেখা আর দেখানোর চোখ ছিল শিল্পশোভিত। বিবরণে বিস্তাবে বসন্ত বিহারে ভাবতচন্দ্র প্রেমের স্থান নির্বাচনে দেখিয়েছিলেন অসাধারণ গৃহিণীপনা। নগরশোভা বর্ণনায় তিনি লিখেছেন,

> 'দেখিযা নগর-শোভা বাখানে সুন্দর।
> সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর।।
> স্নানে বান্ধ চারি ঘাট শিবালয় চারি।
> অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি।।'

মালিনীর পেশা, বয়স, মানসিকতা আর দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি ভারতচন্দ্রের নাগরিক বৈদগ্ধময শব্দের অঢেল ব্যবহার আজও সমানভাবেই আধুনিক—

> 'আছিল বিস্তর টাট প্রথম বয়েসে।
> এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।
> মন্দ মন্দ গতি ঘন-ঘন হাত নাড়া।
> তুলিতে বৈকালী ফুল আইল সেই পাড়া।।'

একজন মাঝবয়সী contact woman এর আনুপূর্বিক ছবি। শরীরে, চোখে, হাতনাড়ায় সর্ব অর্থে বিদ্যাসুন্দবেব মিলন বাসরেব যথার্থ সুচতুরা এই বমণী।

ভাবতচন্দ্র ছিলেন কথাব ভট্টাচার্যি। যেখানে কোনও সুভাষিত বা প্রবাদ ব্যবহার করে শব্দরঙ্গের বাজিমাত সম্ভব সেখানে ভাবতচন্দ্রের শব্দের খই ফোটে অর্থ, বাস্তবতা আর নাগরিক বৈদগ্ধ্যের তীক্ষ্ণ মেধায। স্নিগ্ধ কৌতুকবোধে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিমজ্জিত

ভারতচন্দ্র জীবনবোধের বাস্তবতায় ডুবে গেলেও wit বা বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকের ভাঁড়ারটিকে উজাড় করে দিতেন সুযোগ পেলেই। অফুরান কৌতুকের সঙ্গে জীবন এই মিতায়তন শব্দটি যুক্ত হয়েছিল সাবলীলভাবে। সতর্ক পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্র সম্পর্কে জীবনবোধের ছাড়পত্রটি দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে ভারতচন্দ্র যথার্থই জীবনবোধের শংসাপত্র পাবার অধিকারী। সুন্দর তার হাট বাজার আর বিদ্যার সঙ্গে সংযোগের কাজে একজন লোক খুঁজছিল। মালিনী পেশাদারী পরিসেবিকার মতই স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, টাকা দিয়ে দুনিয়া জয়ের কথা।

বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবি সংস্কৃত রসশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন আধুনিক কবিদৃষ্টি। শ্লীল অশ্লীলে সীমারেখা না টেনে তিনি নারীদেহের মধ্যে কামের ভিয়ান সহজে খুঁজে পান—

'কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়।।'

মধ্যযুগে শিল্প সাহিত্যে এবং কবিতায় নিরাবৃত নারীদেহের বর্ণনা একটি অতি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। কামনাঘনইন্দ্রিয় বাসনার সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছিলেন সংস্কৃত রসশাস্ত্র পড়ার সুবাদে। অনঙ্গ অঙ্গের কথা নিরলঙ্কৃত ভাষায় খোলা মনে লেখা রাজসভায় দাবী ছিল। কামনার পর্দায় খোঁচা মেরে কৃষ্ণ নাগরীয় রাজসভায় ভারতচন্দ্র ভাষা নির্মাণের দায়গ্রহণ করেও শিল্পশোভনতায় আবার রাজসভার দাবীকেও অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

মধ্যযুগে নারীসমাজের প্রতিনিন্দা আর বারমাসের দুঃখের পাঁচালী অত্যন্ত চর্চিত বিষয়। মানুষের কাছে দুঃখের ফিরিস্তি দিয়ে নিজের ভাগ্যের কাছে নতজানু হয়ে নালিশ জানিয়ে মেয়েরা সামাজিক বঞ্চনা-শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার ভাষা হাতে পেয়েছিল। বারমাস্যায় গোষ্ঠীজীবনে ফুল্লরার যেখানে বৈঁচি ফল খেয়ে কাটে নিরন্ন দিন, শ্রাবণমাসে যার কুঁড়ে ঘরে বান ডাকে, অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রয়াসের ভাষা মেয়েরা খুঁজে পেয়েছিল বিদ্যাসুন্দরের দুরন্ত প্রেমের গল্পে রতিক্রীড়ার বর্ণচোরা আভাসে। ক্ষোভ আর বেদনার সঙ্গে অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ভাবে নারীপুরুষ সম্পর্কহীনতায়, মানসিক বিনিময়ের অভাবে, শরীরী কামনার যতিচিহ্নে। কয়েকটি উদাহরণ—

ক. সাধ করি শিখিলাম কাব্য-রস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হইল হত।।

খ. রাজসভাসদ্ পতি বৈদ্য-বৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে।।

গ আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।

প্রথাবদ্ধ বারমাস্যার প্রসঙ্গেও প্রবাদ সুভাষিতে ভারতচন্দ্র এনেছিলেন অভিনবত্বের

স্পর্শ। এখানেও জীবনের গভীরতার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে শিল্প শোভিত কবিভাষা। কয়েকটি উদাহরণ ঃ—

ক) আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গৰ্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন।।

খ) অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত রীত করিব বিহার।

গ) বাঘের বিক্রম-সম মাবে হিমানী।
ঘরের বাহির নহে সেই যুবজানি।।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ভারতচন্দ্রে এসে হয়ে উঠেছিলেন অভয়াদাত্রী, আশীর্বাদিকা। 'যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই' এই ব্যাকুলতার মধ্যেই মা ও সন্তানের সহৃদয় সম্পর্কটি অন্নদামূর্তিতে বিবর্তিত হয়েছিল। প্রসঙ্গটি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর এড়ায় নি। তিনি বলেছেন,

'যিনি এককালে অন্ত্যজ জীবনের সুড়ঙ্গপথে বা অন্তঃপুরিকাদের নিভৃত ব্রত-অর্চনার মাধ্যমে আমাদের ভক্তিরাজ্যসীমায় প্রবেশের কুণ্ঠিত আবেদন জানাইয়াছিলেন তিনিই প্রায় দুই শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সাড়ম্বর পূজারীতির প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া আমাদের ধর্মবোধের কেন্দ্রাধিষ্ঠিতা দেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন।'

সত্যই 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে' এই সরল ভাষণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল অন্নদামঙ্গলে। যে অভিনবত্বগুলি ভারতচন্দ্র মৌলিকতার দাবী রাখে সেগুলি হল ক) ভাবানুভূতির চেয়ে বুদ্ধি বৈদগ্ধের প্রখরতা, খ) অসম্ভব আঙ্গিক সচেতনতা, গ) অনাগত কালের মানুষের জন্য ঈশ্বরী পাটনীকে নির্মাণ। এছাড়া যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল—

(১) ঔদার্যের সঙ্গে আরবী, ফার্সি ও তুর্কীর ব্যাপক ব্যবহার (২) হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে মোহমুক্ত নবদৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত দুঃখে দীর্ঘশ্বাস বর্জন, অনাস্বাদিত পূর্ব বাস্তবতাবোধ (৩) বিশ শতকের কথাসাহিত্যের বীজবপন মালিনী চরিত্রে (৪) পৌরাণিক আর অপৌরাণিক উপাদানের মিশ্রণে প্রেমের অভিনব কথা বিস্তার (৫) সাহিত্যকে জীবনের দর্পণ হিসাবে গ্রহণ করায় যৌনানুভূতির প্রবলতাকে অক্লেশে গ্রহণ (৬) হর-পার্বতীর সংসার একান্তই বাংলাদেশের, কৈলাশের নয় (৭) ধর্ম বিষয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব (৮) দৈব নির্ভরতার অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের প্রত্যুষকে আবাহন (৯) প্রায় চারশরও বেশি সুভাষিত বচনের ব্যবহারে (১০) মধুসূদনেব অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইঙ্গিত ভারতচন্দ্রের পয়ার ছন্দের স্বাধীন যতিস্থাপনে খুঁজে পাওয়া (১১) কবিতার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অপিনিহিত পরবর্তী অভিশ্রুতি শব্দের প্রয়োগ (১২) পয়ার ছন্দ ছাড়া ধামালী, দিগক্ষরা, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী ছন্দের ব্যবহার। সমালোচক বলেছেন '.....ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার পণ্ডিত ভাষাবিদ্যাকে ছন্দের প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেননি'।

ভারতচন্দ্রের অক্ষরমাত্রিক রচনায় গাণিতিক ব্যতিক্রম নেই, কিন্তু তা সর্বত্র ত্রুটিহীন হতে পারেনি। অর্ধকলাবৃত্তের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ ভারতচন্দ্র একপদী, দ্বিপদী (পয়ার), ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধ রচনা করেন। মিলের কারিকুরি, মাত্রাহানি বা মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়ে তিনি পয়ারবন্ধে বৈচিত্র্য এনেছেন। পয়ারে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কবি কোন কোন ক্ষেত্রে রচনার কাব্যমূল্যের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছেন।

'অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অর্চনা
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভূজা।'

এখানে ছন্দ নিখুঁত, অলঙ্কারও সুপ্রকট, কিন্তু কাব্যরস নেই। অর্ধকলাবৃত্তরীতিতে চতুষ্কল পর্বের ব্যবহারই সাধারণ রীতি। মধ্যযুগে পঞ্চকল, ষট্‌কল এবং সপ্তকল পর্বের ব্যবহারও কেউ কেউ করতেন. ভারতচন্দ্রও করেছেন। তাছাড়া ভারতচন্দ্র দলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত বা লৌকিক) রীতির প্রয়োগও করেছেন। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী জানিয়েছেন কবি প্রায় ছাব্বিশ ধরনের স্বতন্ত্র অলংকার প্রয়োগ করেছিলেন। শ্লেষ ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণভাবে অভিনবত্ব দেখাতে পেরেছিলেন।

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে অন্যতর একটি অভিযোগ তিনি নাগরিক জীবনের কবি—সমাজ মনস্কতা তাঁর কাব্যে প্রায় নেই। অথচ শিব আর অন্নপূর্ণাকে কেন্দ্র করে তিনি সেকালের কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, কুলবধূর বিড়ম্বনা, কুলীন জাতির কোন্দল ইত্যাদি সামাজিক প্রসঙ্গগুলিকে স্বভাবসুলভ ভাষায় দেখিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর্গের সমালোচনা শিরোধার্য করেও সবিনয়ে আমরা বলতে পারি গুছিয়ে কাহিনী বলা কিংবা চরিত্রচিত্রণে গুণপনা দেখানোয় তিনি খুব নজর না দিলেও তিনি যেমন যুগসৃষ্ট ছিলেন তেমনই তিনি যুগস্রষ্টাও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মদনমোহন গোস্বামীর মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়।

'ভারতচন্দ্র মহাদেবকে বেদিয়া করেন নাই। তিনি গণদেবতা দরিদ্র-অজ্ঞ-মূর্খ-অকিঞ্চন সর্বসাধারণের আশ্রয়। বামপন্থী বামদেব। তিনি মানুষেরই দেবতা। বেদব্যাসেরও অপমান ভারতচন্দ্র করেন নাই। মানুষের বেদনার ইতিহাস বেদব্যাসের দৈবনির্দিষ্ট মতিভ্রমে সূচিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 'কথায় হীরার ধার' হীরা মালিনী পরিপূর্ণ মানব প্রাকৃতিক এবং সম্পূর্ণ জীবন্ত। হীরামালিনী 'টাইপ' বা মামুলি চরিত্র নহে, বঙ্গসাহিত্যে হীরামালিনী অনেক ফুল যোগাইয়াছে।'

আমরা বুঝতে পারি প্রচলিত বিশ্বাসের জগত থেকে সরে এসে কবিত্ব তার দৈবনির্ভরতার মাটিতে পা না দিয়ে স্বাধীনভাবে স্বভূমিতে পা রাখতেই চেয়েছিলেন ভারতচন্দ্র।

প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের হাস্যরসকে বলেছিলেন বীরের হাসি, যার সাহায্য নিয়ে দেবতাদের স্বেচ্ছাচারিতা আর মানবজীবনের অসঙ্গতির বাহুল্যকে আঘাত করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ সেই কৌতুকরসকে রাজকণ্ঠের মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল দ্যুতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

আসলে ভারতচন্দ্র তাঁব রঙ্গ ব্যঙ্গ ছটার মধ্য দিয়ে সমকাল থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন। কৃষ্টি আর প্রকাশ শক্তিকে 'হুতোম' পূর্ব যুগের একটি সময়ের সঞ্চালক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আমাদের বাক্য আর ব্যবহারের ব্যবধানকে ক্ষমাস্নিগ্ধ আক্রমণের মধ্যে দিয়ে শানিত করেছিলেন ভারতচন্দ্র। যুগের ক্ষয় আর আলোকহীনতা, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেও তিনি অভিজ্ঞতার বাইরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, কখনও জীবনকে আলগাভাবে দেখে কখনও ভাসমানতাব বদলে নিমগ্নতার মধ্যে। রচনাবলী অবশ্যই পৃথুল আকাবে ছিল না কিন্তু চিন্তাভাবনাব মধ্যে বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের ব্যাপ্তি আর বিশালতা ছিল।

একটা প্রচলিত কথা আছে যার humour এব বোধ আছে সে নাকি আত্মহত্যা করে না। তারা জীবনের জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতিকে বেশি গুরুত্ব দেয় না। ভারতচন্দ্রের রচনাতে তাই ব্যক্তিগত জীবন আর তার জয় পরাজয়ের কথা নেই। নিজেকে নিয়ে কোন কৃত্রিম সচেতনতা বা দম্ভ দেখাতে চাননি ভারতচন্দ্র। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের সময়টিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন অবক্ষয়ের চলমান সিঁড়ি হিসাবে— 'তখন যে অবক্ষয় সমকালীন সমাজকে প্রবলভাবে ঘিরে ধরেছিল, কবি সেই সমাজ-যুগেরই প্রতিনিধি, তাঁর গান 'অমাবস্যার গান।' সম্ভবত বসমঞ্জরী বা বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় মিলনে উল্লসিত বর্ণনার উদাহরণকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যে গান ছিল রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, অধ্যাপক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তা পূর্ণিমার গান মনে হয় নি। তবু একথা সত্য এই কৃষ্ণনাগরিক অন্ধকারে অমাবস্যায় কৃষ্ণকায় ছিলেন না। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর বিভা খুঁজে নিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের মধ্যেই যেন নিহিত ছিল পরবর্তী শতাব্দের সূচনালগ্ন। সত্যই আমাদের লগ্ন বয়ে যায় নি, বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী প্রজন্মে লগ্নভ্রষ্টাও হয়নি, তার প্রমাণ কবিগান ও ঈশ্বর গুপ্ত। বাগবৈদগ্ধ্যের সারস্বত মঙ্গলসূত্রটি এঁদের হাতেই ভারতচন্দ্র পরিয়ে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারের দাবীপত্র হাতে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী কোন অস্পষ্টতা না রেখেই জানিয়েছেন,

'Bharat Chandra as a supreme literary craftsman will ever remain a master to us, writers of the Bengali language.

কিন্তু শেষ বিচারে এই রাজসভার কবি রাজকীয় শব্দ সম্পদে বিত্তবান হয়েও আধুনিক সমালোচকের চোখে বড় অতৃপ্ত মনে হয়েছে — শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন— 'বুদ্ধিতে-বিদ্যায় বৈদগ্ধ্যে জয়ী বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাগরিক কবিকে পেলাম কিন্তু একটা অশান্ত অতৃপ্তির শ্বাস কবির বুক কাঁপিয়ে দিতে লাগল। কী হবে এই আয়োজনে এই আলোকোৎসবে, এই বাদ্যরবে—যদি এর অন্তরের গানকে বীণার তারে তুলে নিতে পারি'?

বাউল গান ও লালন ফকির

সাধক শিল্পী ও সুরস্রষ্টাগণ ভাবতীয় সঙ্গীতকে উদার ভাবধারায় মণ্ডিত করে গেছেন—তাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাই তাঁদের অবদান দেশ কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করে চিন্তাশীল শিল্পীদের অন্তরে প্রেরণা এনেছে। মনীষী রমা রল্যাঁ বলেছেন, 'Music and Poesy would go side by side, dreaming and their dreams mingling.' বাংলাদেশে সঙ্গীতের একটি মহান আদর্শ ছিল, সে আদর্শ হল কাব্যভাব ও সুরভাবের পূর্ব সমন্বয়। অনুশীলনেব ফলে এবং বাংলার গীতিকার ও সুরকারগণের নব নব অবদানে সঙ্গীতের মধ্যে অনেককিছু মৌলিকত্ব এসেছিল এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সেগুলি স্বীকৃতিও পেয়েছিল। বাউলসঙ্গীত এই অভিযান-পর্বেরই এক উর্বর ফসল।

চৈতন্য সমসাময়িককালে বাস্তবজীবনে উদাসীন, বাইরের দিক থেকে অসম্বদ্ধ—এমন এক ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় সমাজে বাউল নামে পরিচিত হয়েছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে ঈশ্বরভক্ত অর্থে বাউল শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বাইরের দিকে আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্মাদি অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্যময় হলেও অন্তরে অন্তরে যাঁরা যথার্থ ঈশ্বর-ভাবরসে মাতাল হয়ে থাকতেন, তাঁরাই বাইরের লোকের নিকট বাতুল অর্থাৎ বাউল বলে অভিহিত হতেন। পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ সহজিয়া পদেও এইরূপ বিশিষ্ট ধরনের সাধককে বোঝাতে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হত। লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার সহজিয়াদের চারটি থাক ঃ আউল, বাউল, দরবেশ এবং সাঁই। এই ধরনের বিভাজন পরস্পরাঙ্গী। প্রখ্যাত বাউল লালন শাহ্ তাঁর গানে 'সাঁই লালন', 'দরবেশ লালন', 'ফকিরলালন', 'অধীন লালন' বা শুধু 'লালন' ভণিতা দিয়েছেন। নিজের গুরুকে 'দরবেশ সিরাজ সাঁই' বলেছেন। কোথাও তিনি নিজেকে বাউল বলেননি। তাহলে কি বুঝতে হবে লালন ও তাঁর গুরু সিরাজ একই সঙ্গে 'দরবেশ' আর 'সাঁই'? বাউল নন? আউল, বাউল, দরবেশ ও সাঁই পৃথক পৃথক শ্রেণী নয়। এগুলি লৌকিক অভিধা মাত্র। সনাতন গোস্বামীকে 'দরবেশ', রূপ গোস্বামীকে 'বাউল', শ্রীচৈতন্যকে 'বাউল', 'মহা বাউল' বলা হয়েছে। লৌকিক বিভাজনের এই গোলমেলে পথ পরিহার করে এদের একটি সাধাবণ অভিধা দিতে পারা যায়—সেটি 'সহজিযা'। দার্শনিক বিচারে এরা মরমিযাও (mystics)। 'বাউল' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সন্ধানেও নানা বৈচিত্র্য এসেছে। বাউল শব্দটিব ব্যবহারের ক্ষেত্র, কাল, সীমাবদ্ধতা এবং বাউল-সাধনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'বাউল একটি বিশেষ সাধনমার্গ এবং অর্থযুক্ত শব্দ। 'বাজুল' বজ্রগুরু। সম্প্রদায়বাচক

নয়। সমরূপ শব্দ (homonym) 'বাউল'-এর দুটি পৃথক উৎস—আরবী 'বাউল' এবং সংস্কৃত 'বাতুল'। বাউলকে নিয়ে যিনি সাধেন তিনি 'বাউলিয়া'। মরমকে নিয়ে সাধলে 'মরমী', 'মরমিয়া'।

বাউল সম্প্রদায়ে জাতের ভেদ না থাকলেও সহজিয়া পন্থী হিন্দু বাউল এবং সূফী পন্থী মুসলমান ফকির বাউল (আউলিয়া)—এইরূপ দুটি সাধনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়। বাংলার বাউলদের যথার্থ আত্মীয়তার যোগ বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষতঃ কোন যোগ নেই।

সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের তত্ত্বকথা দাদু, কবীর, নানক, রুইদাস, রজ্জব ইত্যাদি উত্তরাপথের মধ্যযুগীয় সাধকদের দোঁহা ও গীতাবলীতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সন্ত সাধনা ও বাউল সাধনার মূল কথা—মানুষের দেহের মধ্যে যে পরম সত্য বা সত্তা রয়েছে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> 'মনের মানুষকে অন্তরের মণিকোঠায় খুঁজিয়া বাহির করা ও তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনরসে তন্ময় হইয়া যাওয়াই বাউল-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য।'

বাউলেরা শাস্ত্র-আচার-বিগ্রহ মানেন না; চেতনার গভীরতলশায়ী প্রাণশক্তিকেই তাঁরা মর্মে মর্মে সাধনা করেন। তাই তাঁদের একমাত্র সাধ্য 'মনের মানুষ'। ড.শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,

> 'In the conception of the 'Man of the heart' of the Bauls, we find a happy mixture of the conception of the Paramatman of the Upanisads, the Sahaja of the Sahajiyas, and suffistic conception of the Beloved.'

বাউলদের নৃত্যগীতেব সঙ্গে সূফীদের 'সমা' (দরবেশের নৃত্যগীত) তুলনীয় আবার বাউলের গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মত সূফীরাও মুর্শিদ-মুরিদের (গুরু-শিষ্য) সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাই সূফী বাউল গেয়েছেন,

> 'উনুর ঝুনুর বাজে নাও নিহাইল্যা বাতাসে রে
> আমি রইলাম তোর আশে।
> .....আমার ছিঁড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক
> মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে।'

আর এক হিন্দু বাউল গেয়েছেন:

> '.......গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
> ......গুরু যে তোর বরণডালা গুরু যে তোর মরণজ্বালা
> গুরু যে তোব মনের ব্যথা (যে) ঝরায় দু' নয়ন।'

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে বলেছেন—'কেহ কেহ মনে করেন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল ছিলেন গুরুবাদী, তাঁহারা 'পুথ্যা' (পুঁথিয়া'), অর্থাৎ যাঁহারা গুরু, গ্রন্থ ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী; আর একদল ছিলেন 'তথ্যা', অর্থাৎ প্রকৃত বাউল—যাহারা কোন নিয়ম নিগড় মানিতেন না, কোন মর্ত্যব্যক্তির শাসন স্বীকার করিতেন না।' সূফী মতাবলম্বী মুসলমান বাউলগণ হিন্দু বাউলদের মূল আদর্শ স্বীকার করেছেন। অনেকেই শ্রীচৈতন্যকে আদি বাউল বলে গ্রহণ করেছেন।

বাউল সাধনার তত্ত্ব, বাক্য ও সাধনক্রিয়া—তিনটি দিক আছে, তিনটিই পরস্পর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য বাউলতন্ত্রের যে জাগরণ হয় তার পুরোধা ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। তরুণ শিষ্যেরা পুরানো বাউল ঢঙে অনেক গান লিখেছিলেন। আধুনিক বাউলগানের আদিগুরু কাঙাল হরিনাথ ভণিতায় ফিকিরচাঁদ বাউলকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বাউলগান ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কাঙালের একটি সুপরিচিত বাউলগান হল—

'ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।'

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ১২৯৪ সালে 'কল্পনা' পত্রিকায় কয়েকটি বাউলগান প্রকাশ করেন। এগুলি (২০টি) ১৩০৭ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল গ্রন্থাবলীতে 'বাউল-বিংশতি' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর বাউলগানের একটা দৃষ্টান্ত :

'এ কেমন ভালবাসা।
বল কোন্ ভাবেতে মন ভুলাতে দেখা দিয়ে ছল্‌তে আসা।'

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলগানকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করেছেন। এই অশিক্ষিত সাধন সঙ্গীতের প্রতি বিশ্বের বিদ্বজ্জনের সপ্রশংস দৃষ্টি তিনিই যে প্রথম আকর্ষণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র বাইশ, সময়টি ১৮৮৩ সাল, তখনই তাঁর হাতে কিছু বাউল গান এসে পড়ে। বাউল দর্শন, বাউল গানের সুরবৈচিত্র্য, শব্দচয়নের বাহাদুরি, জীবনবোধ, মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয় ইত্যাদি তাঁর চিরন্তন বাউলমনে বাণীর আয়োজনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দেশের পলিমাটি-সিক্ত সংস্কৃতির, মানুষের ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ, নিজের গীতিহৃদয়ের এক লালনভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ঘটনাটি তাঁকে উপকৃত করেছে, বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছে, ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে বাংলা সাহিত্য এবং শেষ গণনায় বিশ্বসাহিত্য। বিপিনচন্দ্র পাল একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—

'Rabindranath is not only the poet of Modern Bengal, he is equally the poet in a special sense of ancient and medieval Bengal, a poet of Folk-Bengal..... Rabindranath is above all, a Bengali.'

বাউল সাধক শুধু গীতিকবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা শ্রেণীসম্প্রদায় নির্বিশেষে একপ্রকার প্রাকৃত দেহচর্চার কথা বলেছেন—যা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতম মোক্ষানন্দে পৌঁছিয়ে দেয়। নবনারীর বাস্তবদেহকে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহরূপে কল্পনা করে উভয়ের অপার্থিব মিলনের মধ্য দিয়ে জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করতে হবে। একদল বাউল হিন্দুর যোগতন্ত্র অনুসরণ করে নিজদেহেই রাধাকৃষ্ণ বা শিব-দুর্গার সাম্যরসসম্ভূত স্বর্গীয় মিলনানন্দ ভোগ করতে চায় —তা-ই মোক্ষের প্রধান সোপান। আর একদল বাউল স্ত্রী পুরুষে মিলে কামকে প্রেমে পরিণত করে। জড়দেহের মধ্যে কিভাবে চিদানন্দময় অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায় বাউলগণ তারই সন্ধান করেছেন। নারীদেহকেই বাউলগণ মুক্তির সোপান বলে মনে করেন। তাঁদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রীধর্মের তিনটি

দিনে নারীদেহে 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ' বা 'অধর চাঁদে'র আবির্ভাব ঘটে। এই স্ত্রীধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রীপুরুষে বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বাবা সঙ্গত হলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হবে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থালাভই বাউলের সাধনার চরম লক্ষ্য। তখন তাঁদের পার্থিব সত্তা (সূফী মতে 'ফানা') ধ্বংস হয়ে গিয়ে সাধক ঈশ্বর সাযুজ্য (সূফী মতে 'বাকা') লাভ করেন।

এই বাউলেরা নিগূঢ় তত্ত্বকথাকে সুন্দর সুন্দব উপমারূপে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের বাউলেরা আবার আধুনিক রূপক ব্যবহার করেছেন। যেমন—

'যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী
তোরা দেখসে আয় তাড়াতাড়ি।।
....
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর
মুখে হরি হরি গৌরহরি
করবেন টিকিট মাস্টারি।।'

শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতিকার লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভালবাসতেন। লালনের পদে কখনও ইসলামি সূফী পারিভাষিক শব্দের দ্বারা, কখনও বা হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি থেকে সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুসৃত হয়েছে, আবার কখনও কৃষ্ণলীলার কথা ব্যক্ত হয়েছে—

'কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই
একবার এসে দেখা দেরে প্রাণ জুড়াই।'

আবার কোথাও পুরোপুরি ইসলামি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—

'নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়
সেই যে আকার কি হ'ল তার কে করে নির্ণয়।'

লালনের মৃত্যুর পর পাঞ্জ শাহ্ বাউল অধ্যাত্ম মার্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর দ্বারা লালনের শূন্যস্থান অনেকটা পূরণ হয়েছিল। তাঁর কয়েকটি গান বাংলা বাউল সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। যেমন—

'আমারে দেও চরণতরী
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে অপারের কাণ্ডারী।'

বা

'ত্রিবেণীর তীরে ধীরে সুধারে জোয়ার আসে
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে।।'

এই সমস্ত পদে বাউল সাধনবিষয়ক গূঢ় সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু তার অতিরিক্ত একটা স্নিগ্ধ গীতিমাধুর্য এই তত্ত্বকথাকে শিল্পরূপ দান করেছে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে

ফকির পাঞ্জশাহ্‌কে লালন ফকিরের পার্শ্বেই স্থান দিতে হবে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা অনেক বাউলও উৎকৃষ্ট অনেক গান লিখেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক হিন্দু-মুসলমান বাউল গান রচনা করেছিলেন, অনেক বাউলের কণ্ঠে সে গান এখনও শোনা যায়। এমনকি বাউল গানের ধারা গ্রামাঞ্চলে বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়ায় ও ফকির-মুর্শিদের আস্তানায় এখনও বহমান। আধুনিক যুগে ইংরাজী-শিক্ষিত মহলেও যে বাউল গানের কদর হয়েছে তার কারণ এই সমস্ত গানে সাদা প্রাণের এবং অনাবৃত হৃদয়াবেগের ছবি ফুটে উঠেছে। কোন কোন পদে জীবনেশ্বরের সঙ্গে সাধকের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে, মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্বের দ্বারা অন্তর্গূঢ় মিষ্টিক রস উপচিত হয়েছে, এবং তার আবেদনে আধুনিক মনও সাড়া দিয়েছে। শাক্তপদের তান্ত্রিক তাৎপর্য ছেড়ে দিলেও এর মধ্যে থেকে যেমন বাৎসল্যরসের নিবিড় স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি বাউলপদেও আমরা বিশাল উপলব্ধির দ্বারে এসে দাঁড়াই, তুচ্ছের মধ্যেও চিরজ্যোতির্ময়কে দেখে বিস্মিত হই, আমাদের হারানো অর্ধখণ্ডকে এই সমস্ত পদের গভীর তাৎপর্যের মধ্যে সন্ধান করে অভিভূত হই। সুতরাং বাউল গান আধ্যাত্মিক গীতিগুচ্ছ হলেও এর সঙ্গে একটি নিবিড় মর্ত্য আবেগ ও সৌন্দর্যবোধ অনুসৃত হয়ে আছে বলে অশিক্ষিত বাউল গায়কদের কয়েকটি পদে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যার সুধারস পান করে আজও আমরা ধন্য।

কালানুক্রমের হিসেবে লালন ফকিরের জন্মসন ১৭৭৪ খ্রী. এবং তিনি জীবিত ছিলেন ১৮৯০ খ্রী. পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ১১৬ বছর। ১৮৯০ খ্রী. ১৭ই অক্টোবর লালন শাহ্‌ের মৃত্যু হয়, বিগত ১৯৯০ সালের অক্টোবরে লালনের মৃত্যু-শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। সময়ের বিচারে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের সমসাময়িক। ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফলের দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের এই শেষার্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লালনের মত একজন অসাধারণ সাধক ও বাউল গীতবচয়িতার খ্যাতি শতবর্ষ পেরিয়েও এই উপমহাদেশে অম্লান হয়ে আছে নানাবিধ কারণে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'লালন গীতির সূচীপত্র' নামক রচনায় জানিয়েছেন, 'লালন অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তা যে কত সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে কয়েক হাজার যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।' লালনের জীবন কাহিনীতে এমন কিছু আশ্চর্যজনক অভিনবত্ব আছে যা সাধারণ মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে জাতপাতের ভেদ সম্পর্কে তাঁর ধিক্কার বাণী এতই অভাবনীয় ও আধুনিক যে, কেবল ঐ ধরনের গানের বাণীর গৌরবেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালনগীতির উদ্ধার ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণও লালন সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সশ্রদ্ধ সচেতনতা জাগিয়ে দিয়েছে। ১৯৬০ সালের ১১ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি শিশির মঞ্চে লালন মৃত্যু-শতবর্ষ উদ্‌যাপন করলেন, সেখানে অন্যান্য বাউল কবিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ায় লালন-শিষ্য ভোলা শাহ্‌ের ৮৮ বছর বয়স্ক পৌত্র আজমত শাহ্‌ফকির। এছাড়া ১৯৬০ সালের ১৯ শে অক্টোবর ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ-এর সংবাদ ছিল নিম্নরূপ—

'...... বাংলার বাউল-শিরোমণি বাউলসম্রাট লালন ফকির ছিলেন এদেশে

> অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির রূপকার.........হাজার হাজার বাউল ও ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে পালিত হল লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী।'

এই আলোচনাসভা ও বাউলগান অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুষ্ঠিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার ছেউরিয়া গ্রামে লালন মাজারে।

প্রচলিত সাধন অর্থে লালন ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুতান্ত্রিকতা, সূফী ধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এক সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়েছে বাউলের মতবাদ ও তাঁদের জীবনসাধনায়। সমন্বয়ী প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই বাউল ধর্মমত তাব আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। বাংলা 'বাউল' শব্দ সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দজাত, হিন্দু সম্প্রদায়ের চোখে তাঁরা যেমন ছিলেন সমাজ-বহির্ভূত, অন্যদিকে মুসলমান সমাজের কাছেও তাঁরা ছিলেন 'বে-শরা ফকির'। বাউল গানের সময়সীমা সম্পর্কে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> 'সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহার সৃষ্টির ও ব্যাপ্তির কাল বলিযা আমরা ধরিতে পারি।'

মধ্যযুগের ভারতে গুরুনানক, গুরু রামানন্দ, রামানন্দ-শিষ্য কবীর, কবীর-শিষ্য দাউদ, দাউদ-শিষ্য রজ্জব, মীবাবাঈ, তুকারাম ইত্যাদি বেশ কয়েকজন মরমিয়া সাধক-সাধিকা আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মত ও পন্থা ভিন্ন মার্গের হলেও কয়েকটি ব্যাপারে একজাতীয় ঐক্য ছিল। প্রচলিত শাস্ত্রীয ধর্ম বিশ্বাস ও আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠানবাদের বিরোধিতা করেছেন। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা, পুরোহিত-মোল্লা-যাজকতন্ত্রের কঠোর বিধিনিষেধ অস্বীকার করে এঁরা সর্বশ্রেণীর, বিশেষতঃ অনুন্নত, অস্পৃশ্য, অবহেলিত মানুষের কাছে ঈশ্বরের উদার অসাম্প্রদায়িক প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচাব করেছেন। ধর্ম-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করে মৌলবাদীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন। এই সাধকেরা তাঁদের বাণীকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু তাঁদের সরল হৃদয়স্পর্শী বাণী লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃউৎসারিত সঙ্গীতরূপে। এঁদের বাণী ও আদর্শ প্রচলিত যে কোন ধর্মের সীমানাকে ক্রমশঃই ভেঙে ভেঙে প্রসারিত করে দিয়েছে। তাই ভিন্ন ধর্মের মানুষও এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এঁরা নিজেরা ধর্মগুরু হতে চাননি, কিন্তু কালক্রমে হয়ে গেছেন।

বাংলার লালন ফকির মধ্যযুগীয় সাধকদের সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত কিনা তা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিতগণের বিচারেব বিষয়। লালনের মহত্ত্ব এখানেই যে তিনি শরিয়তী ইসলাম ও পণ্ডিতী হিন্দু কোন ধর্মেরই অনুশাসনকে সর্বতোভাবে মান্য করেননি। ভেদবুদ্ধি জর্জরিত ধর্মের জাতপাতের অন্যায়কে ধিক্কার জানিয়েছেন। লালন সেই ধর্মেই বিশ্বাস করতেন যে ধর্মে ঈশ্বরের স্থান মানুষের হৃদয়ের মধ্যে, মন্দির-মসজিদের শিলাস্তূপে নয়। সমালোচক ঠিকই বলেছেন,

> 'এই জাতীয় সন্ত সাধনা ও বাউল সাধনার মূল কথা—মানুষের দেহের মধ্যে যে পরম সত্য বা সত্তা রহিয়াছে তাহাকে উপলব্ধি......।'

লালনের প্রাচীন জীবনীগ্রন্থে তাঁর দশ হাজার শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়

সংখ্যাটি অতিশয়োক্তি। সিরাজ সাঁই লালনের গুরু ছিলেন, লালন পদেও তার স্বীকৃতি আছে। গগন হরকরা লালনের ভাবশিষ্য ছিলেন। তাছাড়া পাঞ্জ শাহ্, দুদ্দু শাহ্, ভোলাই শাহ্, পাঁচু শাহ্, কুধু শাহ্, দয়াল শাহ, ভাঙ্গুবী ফকিরাণী নামে আরও অনেক শিষ্য-শিষ্যার নাম আছে। লালন কোন লালনীয় সম্প্রদায় গড়ে না তুললেও সব সম্প্রদায়েব সাধকরাই তাঁব রচিত বা নামাঙ্কিত গান নির্বিচারে গেয়েছেন, গেয়ে থাকেন।

লালন মধ্যযুগীয় সাধক ছিলেন না, তাঁর জন্ম-মৃত্যু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেই। ভারতের জাতীয় সংহতি যতবাব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে স্পষ্ট একটা রূপ নিতে চেয়েছে, ততবারই সুচতুর ব্রিটিশ শাসক তাকে ভাঙতে চেয়েছেন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে, সস্তা প্রতিশ্রুতির লোভ দেখিয়ে এবং জাতপাতেব অস্ত্র দিয়ে। উনিশ শতকেব প্রথম দু' দশকেব মধ্যেই লালনের সাধক-জীবনেব ইতিহাসের সূত্রপাত। তখন বাংলাদেশে নয়া জমিদারতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারেরা বুর্জোয়া ধনপতিতে পরিণত, ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসায় তাদের ঘরে জমছে টাকার পাহাড় আর মফঃস্বলে বাড়ছে জমিদারীর সীমানা। শাসক সম্প্রদায় নিজেদেব স্বার্থেই বর্ণভেদ, ধর্মান্ধতা ও মোল্লা-মৌলভী-পুরোহিততন্ত্রকে বাব বার ব্যবহাব করেছে। এই সামাজিক পটভূমিকায লালন গেযে উঠলেন---'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।' শোনা যায় লালন হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করে, পরে ঘটনাচক্রে তীর্থ ভ্রমণকালে ব্যাধিগ্রস্ত ও সঙ্গীপরিত্যক্ত হযে সহৃদয় মুসলমান কর্তৃক শুশ্রূষিত ও পালিত হন। কিন্তু সেই অপবাধে নিজের সমাজে তাঁর প্রবেশাধিকাব ঘটেনি। লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার পাল লালন-জীবনের এই চরম সংকটকালেব তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। লালন জীবন থেকেই ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করলেন, দু'বাহু প্রসারিত করে অস্তিত্বের, জীবনের ও মনুষ্যত্বের মূল্যবোধে মানুষকে উদ্দীপ্ত করলেন। তাতেই লালনপন্থী বাউল সম্প্রদাযেব ভিতব দিয়ে সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনেব একটা স্পষ্ট চেহারা তৈরী হযেছিল। মীব মশারফ্ হোসেন, হরিনাথ মজুমদার, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইত্যাদির মত সশ্রদ্ধ মানুষেরা বাউলের শ্রেণীভুক্ত না হয়েও লালনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলেন। লালনের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রতিনিধিমূলক পদ, সম্ভবতঃ বাংলার তথাকথিত বাউল সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ---

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।

... .

বামুন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে।।'

লালন হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি উত্থাপিত হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছ থেকেই। মনে হয় তাঁর অনেক গানই রচিত হয়েছিল ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য, সম্প্রদায় বিশেষে তত্ত্বপ্রচারের জন্য নয়। যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত গান শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে---

'জাত গেল জাত গেল বলে
এ কি আজব কারখানা ... ..

....

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মেথর মুচি
এক জলে সবাই তো শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাউকে ছাড়বে না।'

সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছিলেন লালন লোক-ধর্মের জমিতে দাঁড়িয়ে। পাঞ্জ শাহের ভণিতাযুক্ত একটি গানে আছে—

'মৃত্যু হলে যাবে চলে
জেতের উপায় হবে কি।।'

আসল বাঙালী সমাজের জাতিভেদ ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ধর্মীয় অনৈক্য ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সঙ্গে লালনের একটা আপসহীন সংগ্রাম ছিল। যে দেহকেই সর্বশাস্ত্র বলে বার বার দেহের মধ্যে ঈশ্বর অন্বেষণের কথা তিনি বলেছেন, শরিয়তী মতে তা বে-শরা বাউলদের কথা, ইসলামের বিচারে মক্কা-মদিনাই তীর্থশ্রেষ্ঠ। কিন্তু লালন বললেন— 'আছে আদিমক্কা এই মানবদেহে/ দেখ না রে মন চেয়ে।' মৌলবাদী মোল্লাতন্ত্র লালন প্রভাবিত বাউল সম্প্রদায়ের ওপর বার বার আঘাত হানার চেষ্টা করেছে রক্ষণশীল ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলনের নামে।

সমাজের অনুশাসন, অবিচার, পৌত্তলিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লালন রচিত কয়েকটি গানের কথা মনে আসে—

ক. 'কার বা আমি কে বা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাই তার।'

খ. 'এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।'

গ. 'ধর্মপ্রভু জগন্নাথ
চায় নারে সে জাত-অজাত।'

ঘ. চৈতন্যদেব সম্পর্কে লালনের শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি
'গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ায়
ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছুমাত্র নাই তাতে।'

আসলে লালন ও বাউলরা সারাজীবন তীব্র আকৃতি নিয়ে অন্বেষণ করেছেন তাঁদের 'মনের মানুষ'কে, চেষ্টা করেছেন আকস্মিতের সান্নিধ্যলাভের। কিন্তু অপ্রাপ্তির বেদনা এনেছে হতাশা—

'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

. ...

আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।'

লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের গানেও যৌবনজীবনের সৃজনশীল রূপ স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত—

'বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গ তাই।'

যে ক্রিয়াশীল মানুষের সকর্মক ছন্দে মানব-সভ্যতার জন্ম, দাস ও সামন্তযুগের দীর্ঘ সুষুপ্তির পর নবজাগরণের প্রভাতী রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সেই মানুষ, আত্মপ্রকাশের আর্তিতে নিজেকে চিহ্নিত করেছে নবতর অভিধায়, যার লোকায়ত রূপ মূর্ত হয়েছে লালন ফকিরের সঙ্গীত চেতনায়। শোষণমূলক সমাজে জনজীবনের অগণিত সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত এবং তা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টাই গড়ে তুলেছে লালনের শিল্পীসত্তাকে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সহজ সুর ও ছন্দের সঙ্গীতময়তায়, যা একান্তই জীবন-নির্ভর ও মানবমুখী। লালনের গানে ধর্ম বিষয়ে কোন সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, জটিলতা বা কৃত্রিমতাও ছিল না। বাউলের বৈরাগ্য, গৃহীর আসক্তি, প্রৌঢ়ের ধ্যানস্থ দৃষ্টি, বৈষ্ণবের বিনয়, শাক্তের মাতৃব্যাকুলতা, শিশুর মুগ্ধতা এবং কবির রসন্ময়তা—এইসব নিয়েই লালনের কবিধাতু গড়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. অরুণকুমার বসু যথার্থই বলেছেন—

'লালনের গান শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। গানের লালন শ্রেণীসংগ্রামের অন্যতম লোকনায়ক।'

'গোরা' উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যায় কর্মব্যস্ত কলকাতা শহরের রাজপথে বিনয়ভূষণের বাড়ির সামনে আলখাল্লা পরা একটি বাউল গান গাইছিল— 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' গোরার রচনাকাল ১৩১৬। তার দু'বছর পর 'জীবনস্মৃতি'তে গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ অধ্যায়ে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে,' কবির এই স্বরচিত গান প্রসঙ্গে লিখেছেন—'একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়......। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না।' ১৩৪২-এ 'শেষসপ্তক' কাব্যের একটি কবিতায় লিখেছেন

'রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'

এর থেকেই বোঝা যাবে সারা জীবনে রবীন্দ্রনাথ লালনের এই গানটিকে কতখানি মূল্য দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ লালনের খ্যাতির প্রচার ও পুনরুদ্ধারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতক অন্বীক্ষা

কাবগান ও কাবওয়ালা

অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলাদেশে নগব ও গ্রামবাঙলায় যে সমস্ত মনোরঞ্জনকারী গীতিসাহিত্যের প্রচলন হয় তা সাধারণভাবে কবিগান নামে পরিচিত। এর মধ্যে কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, নাট্যগীতি ও টপ্পা বিখ্যাত। ভারতচন্দ্র রায ও বামপ্রসাদের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। যুগসন্ধির সেই কাল-পর্বের পর নূতন যুগের সূচনা হয় কবি মধুসূদনের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর মধুসূদনের সাহিত্যিক জগতে আবির্ভাব ঘটে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এই শত বছরের ব্যবধানে বাঙলা কাব্যজগতে একমাত্র প্রতিভাবান কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়টি যুগসন্ধিকাল নামে খ্যাত। এই সময়টি প্রধানত কবিওয়ালা ও কবিগানের যুগ।

কবিগানেব উদ্ভব বা সূচনাকাল সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে একথা অনায়াসে বলা যায় যে কবিগানের গঠন ও বিকাশের কাল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ সালের সময়সীমার মধ্যে। কবিগানের প্রধান আসর ছিল কলকাতায়। গ্রামবাঙলাতেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও গ্রামবাঙলায় এর চর্চা হতে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথেব ভাষায়--

"ইংবেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে পুবাতন রাজসভা ছিল না পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলাযতন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ বাজাব সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন বাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিযা আমোদের উত্তেজনা চাহিত—তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।'

তখন সামাজিক জীবনও ছিল অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে পরিপূর্ণ। ধর্ম-বিশ্বাসের আতিশয্যে মধ্যযুগেব সাহিত্যে একটি গতানুগতিক ধারা গড়ে উঠেছিল। কাব্যরচনার আঙ্গিকও পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই যুগের কাব্য রচয়িতারা সেই প্রাচীন ধাবারই অনুবর্তন করেছিলেন। তাদের কাব্য রসোত্তীর্ণ নয়। সুতরাং তারা 'কবি' নন—'কবিওয়ালা'। তাদের রচনা কবিতা নয়—'কবিগান'। সহজভাবে বলা চলে আমোদের প্রয়োজনে গানের বেসাতি বা ফেরি, কবিগানের রচনাকালকে তাই বাঙলাকাব্যে "গানের যুগ' বলা হয়। এইসব গান বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। মৌখিকভাবে গীত হবার ফলে কোন ধারাবাহিক লিপিবদ্ধতাব সুযোগ ছিল না। 'সংবাদপ্রভাকরে'র স্রষ্টা ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এব কিয়দংশ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। এই গানগুলির প্রধান

বৈশিষ্ট্য হলো এর ওপর কোন প্রকার বিদেশী প্রভাব চোখে পড়ে না। বাঙালী জীবনের নিজস্ব বিষয় এব মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মীয় সঙ্গীত নয়, এব মধ্যে মানুষের কথাই প্রধান। শাক্ত পদাবলী এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাকে স্বীকার করেও নিজেদের মনের ভাব অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন, ষোড়শ শতকের পদাবলীর মতো রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের আবরণ ছেদন করে রক্তমাংসের সাধারণ নরনারীর প্রেমের মহিমাই প্রকাশিত হয়েছে। সেই অর্থে কবিগান আধুনিক কালের জাতীয় সাহিত্য।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কবিওয়ালারা এই গানকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তার জন্য তাদের কবি বলা যাবেনা—একথা ঠিক নয়। মধ্যযুগের কোনো কবিই সে অর্থে কবি নন। বিদ্যাপতি রাজাদেশে কাব্য লিখেছিলেন, ভারতচন্দ্রও তাই। প্রকৃতপক্ষে 'কবি' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কবিওয়ালাদের সঙ্গে তার একটি মানসিক ব্যবধান থাকবেই। তবে কবিওয়ালাদের মধ্যেও যথেষ্ট কবিত্বশক্তিও ছিল। তবে সকলেই যে নির্মল রুচির মানুষ ছিলেন তা নয়। হঠাৎ বড়লোকদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে তাঁরা স্থূল রসিকতা ও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিতেন সন্দেহ নেই। এই 'আনন্দের উত্তেজনা' যোগানোর ফলে কবিগানের ভেতরে নানারকম আবিলতা প্রবেশ করেছিল। উচ্চতর ভাব ও কল্পনার অনুশীলন করবার মতো মানসিক ঐশ্বর্য ও শিক্ষা তাদের মধ্যে ছিল না। এই কারণেই অধিকাংশ কবিগান অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিল। কবিগানের শ্রোতারাও উচ্চস্তরের বিষয়ের প্রত্যাশা করতেন না। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই কবিওয়ালারা গান রচনা করতেন। বর্তমান যুগে যা নিতান্ত অশ্লীল বলে মনে হয় সে যুগের শ্রোতারা তা মনে করতেন না। এই সমস্ত কারণে কবিওয়ালারা চটুল ছন্দে হালকা রস পরিবেশন করে জনসাধারণের করতালি পেতেন, সংবর্ধিত হতেন। সুতরাং কবিগানের মধ্যে অশ্লীলতার প্রাধান্যের অপরাধে শুধুমাত্র কবিওয়ালারাই দায়ী একথা মনে করা সঙ্গত নয়। অনেকেই জীবিকা অর্জনের জন্য কবিগান পরিবেশন করতেন। পৃষ্ঠপোষক বা নয়া বণিকশ্রেণীর মনোরঞ্জন করতে না পারলে অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় গানের তাৎকালিক মনোরঞ্জনের দিকে অধিক দৃষ্টিপাত করা হতো। শুধু বেঁচে থাকার সমস্যা যে কত মারাত্মক তা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পালা বচনা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে।

আনন্দ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে গীত হবার ফলে কবিগানের মূল রূপও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এটি ক্রমশ বিতর্কের আকারে দেখা দিল। কবিওয়ালারা আসরে দাঁড়িয়ে বিতর্ক বা 'ডিবেট'-এ প্রবৃত্ত হতেন। প্রথমে একজন 'চাপান' গাইতেন অর্থাৎ বিতর্কের বিষয়ে অবতারণা করতেন অপরপক্ষ তার 'উতোর' বা উত্তর দিতেন। চাপান ও উত্তোর-এর মধ্যে দিয়ে বিতর্ক জমে উঠলে শ্রোতারা উত্তেজনার খোরাক পেতেন। প্রথম যুগে পূর্ব প্রস্তুত গানই আসরে গাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞ ও শক্তিমান কবিযালরা গানগুলি রচনা করতেন ও সেগুলি আসরে গাওয়া হতো।

ভারতচন্দ্রেব মৃত্যুকাল থেকে গুপ্ত কবির মৃত্যু তথা মধুসূদনের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একশত বছরকে 'অন্ধকারময় যুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সমালোচকেরা এই শতবর্ষকে 'Period' of Decadance' নামে অভিহিত করেছেন। এই যুগের নতুন উদ্ভূত ধনীসম্প্রদায়ের যে কয়টি বিলাসব্যসনের, আমোদ-প্রমোদের মাধ্যম ছিল কবিগান তার অন্যতম। কবিসঙ্গীত বিদেশী প্রভাবমুক্ত, আধুনিক কালের প্রথম জাতীয় সাহিত্য। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ও ঐতিহাসিক ড. সুশীলকুমার দে'র ভাষায়—

'A body of indigenious literature national in sentiment and expression.'

কবিগান এক হিসেবে প্রাচীন বাংলা কাব্যের সর্বশেষধারা আবার অন্যদিক থেকে আধুনিক গানের পদক্ষেপের সূচনা। রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসবণ করে বলা যায় কবিগানই এ যুগেব প্রথম জনসভার সাহিত্য।

কবিসঙ্গীত শব্দটি একই সঙ্গে ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত। কবিগানের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। শ্রদ্ধেয় সমালোচক সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছিলেন—

> 'বাঙলা দেশেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ-কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্‌গীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে। কবি অর্থে এখানে অশিক্ষিত, পটু, স্বভাবকবি, তাঁদের রচনা ও সঙ্গীত বিভিন্ন নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা।'

হয়তো একালের অনেক সমালোচক শ্রদ্ধেয় দাসের এই মন্তব্য মনে প্রাণে গ্রহণ কবতে পারবেন না।

'কবিওয়ালা' শব্দটি একটি জোড়কলম শব্দ। প্রকৃতপক্ষে কবিপাল, কবিপালক শব্দ থেকে এসেছে। সুতরাং কবিপাল -কবিয়াল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কবিগান করা একটা বৃত্তিরূপে গৃহীত হয়েছে। সেদিক থেকে ওয়ালা প্রত্যয়টির প্রভাবে শব্দটি হয়েছে কবিওয়ালা।

একথা অস্বীকার কবাব উপায় নেই কবিওয়ালারা এই গানকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে তাদেব কবি বলা যায় না,—একথা স্বীকার্য নয়। প্রাক্-আধুনিক বাঙলা কাব্যেব কোন কবিই তাহলে কবি নন। বিদ্যাপতি রাজাদেশে কাব্য লিখেছিলেন, ভারতচন্দ্রও তা-ই। প্রকৃতপক্ষে কবি শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক কাব্যপ্রেবণাব দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই, কবিওয়ালাদেব সঙ্গে তাঁর একটি কাল্পনিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কবিওযালাবাও কবি। যদি স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশেব বাক্যময় চারুতা কবিতার সাধারণ সংজ্ঞা হয়, এবং সেই সংজ্ঞায় ঈশ্বব গুপ্ত কবি হতে পাবেন, তবে কবিওযালাদের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ছিল। কবিগানেব যুগকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায—

ক) ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেব পূর্ববর্তী কবিগান

খ) ১৭৬০-১৮৩০ সাল পর্যন্ত কবিগানের ঐশ্বর্য্যযুগ

গ) ১৮৩০-এর পরবর্তী কবিগান।

পূর্ণাঙ্গ কবিগানে সাধাবণতঃ চিতেন, পবিচিতেন, ফুকা, মেল্‌তা, মহড়া, শওযাবি, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মহডা, অন্তবা—এই ১০টি ভাগ দেখা যায়। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিকে

Conventional system বলা হয়। আসলে কবিগান সুরাশ্রিত গান রূপেই বিচার্য, পাঠ্য কবিতারূপে নয়। ড. সুশীল কুমার দে কবিগানকে কয়েকটি পদে ভাগ করেছিলেন। আমাদের মতে ঐ কাব্যধারাকে বিষয়ানুযায়ী এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক, যার মধ্যে ভবানী বিষয়ক ও সখীসংবাদ গান অন্তর্ভূক্ত।

(খ) সুর ও বৈচিত্র্যযুক্ত আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, টপ্পা জাতীয় গান।

(গ) ঢপ্ কীর্তন

(ঘ) কৃষ্ণযাত্রা ও পাঁচালী—প্রধানতঃ কবিগান, আখড়াই এবং ঢপ্ কীর্তনই আমাদেব আলোচ্য। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. সুকুমার সেন কবিগানের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতাটুকু নির্দেশ করেছেন এইভাবে—

> 'কবিগানের বিশেষত্ব হইতেছে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একদল যে বিষয়ের গান ('চাপান') গাহিবে সে গান হইলে অপর দল তাহার উত্তবগান ('উতোর') গাহিবে।'

ড. সেন এই প্রসঙ্গে প্রাচীনতম 'কবিগানের যে নমুনা'র উল্লেখ করেছেন, -- তাতে 'গুরুদেবের গীত (অর্থাৎ বন্দনা), সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড়—এই চারিটি বিভাগ আছে।' অন্যত্র দেখা যায়, 'কবির আসরে' বিষয়-বিচিত্রতা প্রথমতঃ ভবানী বিযয, পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ এবং সর্বশেযে লহর ও খেউড় গাইবার নিযম।'

ঊনবিংশ শতাব্দীব কবিগানের বৈশিষ্ট্য কেবল তার গীতরূপ পদ্ধতিতে নয, তাব কাব্যবস্তু বা গীতবিষয়ে। কবিসঙ্গীত আপনার সুরসর্বস্বতার আববণ থেকে বেরিযে এসে ব্যক্তিতন্ত্র সমৃদ্ধ জগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে। সেই উপকরণের মধ্যে প্রেম এক অনিবার্য প্রধান আকর্ষণ। আঠারো শতকেব কবিওয়ালাবা যখন নবনারীব পারস্পরিক হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্ক অবলম্বন করে গান বচনা করতে শুরু কবলেন, তাঁদেব প্রধান অনুসরণ ক্ষেত্র হযে উঠলো বৈষ্ণব কবিতা। বাধাকৃষ্ণেব প্রণযগীতিকে কবিওয়ালারা সংস্কার করে নতুন যুগপবিবেশে গান বাঁধতে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণেব নামেব পেছনে আঠারো-ঊনিশ শতকেব নাগবিক জীবনের প্রেমচেতনায কবিসঙ্গীতগুলিকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত কবলো। ময়রা-মুচি থেকে বসু-ঠাকুব, নিম্ন হিন্দু থেকে বর্ণ হিন্দু সকলেই এই অভিজ্ঞতার অংশীদার। এব সঙ্গে হতাশা, দুঃখেব বেদনা, বঞ্চনার হাহাকাব বা সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতীক একটি সকাতর বিদ্রূপ ভঙ্গীও জড়িত আছে। জেমস্ লঙ তাঁর ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগে সেকালের পপুলার সং সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—The Bengali songs .. .. are devoted to venus and the popular deities, they are filthy and polluting. '। কবিসংগীতে প্রণয় নামক মানববৃত্তিকে নতুন কবে আবিষ্কাব করা হয়েছে। এই সঙ্গীতগুলি বিরহের নিশ্চিত ক্রন্দনে বিলাপিত, মিলনেব অসম্ভব প্রত্যাশায় কম্পমান, অনুতাপেব ক্ষণভঙ্গুর আত্মপ্রলাপে স্পন্দিত। বাধাকৃষ্ণ প্রেমেব ছদ্মবেশে লৌকিক প্রেমচেতনাই যে কবিগানের সর্বাঙ্গে প্রবেশ করেছিলো, হরু ঠাকুর রচিত একটি গানে তাব উদাহরণ—

চিতেন। সই হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমতি তৃষিত চাতকজনা
আমি সেইমত হয়ে আছি পথ চেয়ে, মানসে করি সেরূপ ভাবনা।
অন্তরা। হায় কি হবে সজনী যায় যে রজনী কেন চক্রপানি এখনো
না এলো একুঞ্জে কোথা সুখ ভুঞ্জে রহিল না জানি কারণও।
পরচিতেন। বিগলিত পত্রে চমকিত চিত্তে হোতেছে স্থির মানে না।
যেন এল এল হরি হেন জ্ঞান করি না এল মুরারি পাই যাতনা।

প্রাচীনতম কবিওয়ালারূপে গোঁজলা গুঁই-এর নাম পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এঁব একটিমাত্র পদ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—

'এসো এসো চাঁদ বদনি
এ রসে নীরস কোর না ধ্বনি।'

কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার পরিচয় গুরু পরম্পরা অনুসারে এভাবে সজ্জিত করা যেতে পারে।

গোঁজলা গুঁই

লালু নন্দলাল রামজী দাস রঘুনাথ দাস কেষ্টা মুচি
নিতাই বৈরাগী ভবানী হরু ঠাকুর রাসু ও নৃসিংহ
রামানন্দ নন্দী বামবসু নীলু রাম প্রসাদ ভোলা ময়রা

কবিগানের যুগেব হঠাৎবাবু নাগরিক সমাজেব কাছে নাবী মনোরঞ্জনের পাত্রী, পণ্যদ্রব্য বিশেষ। নারী কখনো প্রশংসার স্বর্ণাঙ্গুবীয় পরেছে, কখনও বা ভর্ৎসনার কলঙ্ক তিলক এঁকেছে ললাটে। সমাজে নারীকে নিয়ে যে বণিক বৃত্তিব সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে কবিসঙ্গীতের বাধা সেই সমাজে নির্যাতিত নারীত্বে পাণ্ডুর নাযিকা। এই জাতীয যাবতীয় গানই Frailty, thy name is woman এই সুরে বাঁধা। নিধুবাবু তাঁর প্রেমাস্পদকে মৃগনয়নী বলে সম্বোধন করেছিলেন। যদুনাথ ঘোষ প্রেমকে উপমিত করেছেন এক অমূল্য নিধির সঙ্গে যা কলঙ্ককুপিত ফণীর শিরে স্থাপিত। সমকালীন কবিগানের আরেকটি বিশেষ প্রবণতা ছিল অনুপ্রাস বাহুল্য, অর্থজটিলতা, ভাবের কষ্ট কল্পনা, শব্দতত্ত্বের গুরু ভারতা। প্রত্যেক গানেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও প্রত্যেক গানেই এই ধরনেব ক্রটি প্রায় অনিবার্য। একথা ঠিক কবিসঙ্গীতেব মধ্য দিযেই প্রেমের প্রসঙ্গ বাংলা গানে প্রথম প্রবেশ কবেছিল এবং নিধুবাবু সর্বপ্রথম কবিসঙ্গীতের অনুষঙ্গ বর্জন করে কেবল বিশুদ্ধ ব্যক্তিপ্রণযের রীতিতে প্রেমগীত রচনা করেছিলেন। কবিসঙ্গীতেব 'বিবহ' পদাবলীব অপভ্রংশ মাত্র নয়, এই বিরহ আধুনিক নাগরিক মনের প্রণযব্যর্থতা এবং সামাজিক চিত্তবৃত্তি বিশেষ। সমালোচক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ঠিকই মন্তব্য করেছেন—'কবিসঙ্গীত লোকসাহিত্য নহে, ইহা নাগবিক সাহিত্য।' তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে বাংলা গীতিকবিতার সার্থক সূচনা এই সঙ্গীতগুলির মধ্যেই—নিধুবাবু-শ্রীধর-বামবসু-কালীমির্জাব গীতপ্রাণ রচনাগুলিতেই প্রাপ্তব্য। যদিও বর্তমানে কবিসঙ্গীতের সুব

হারিয়ে গেছে কণ্ঠহীন বিস্মৃতির মহাশূন্যে, সুরহারা কথা মুখ লুকিয়েছে সংকলনের ধূসর জীর্ণপৃষ্ঠ গহ্বরে। ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

'কবিগান বাংলা সাহিত্যের একাধারে লজ্জা ও গৌরব, বঙ্গ সংস্কৃতির ভালে একসঙ্গে কলঙ্কতিলক ও চন্দনতিলক।'

হরুঠাকুর একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা। হরুঠাকুরের রচিত পঁয়তাল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। সবগুলিই বিরহ বা সখীসংবাদ বিষয়ক। হরুঠাকুরের একটি বিখ্যাত পদ—

'পিবীতি নাহি গোপনে থাকে
শুনো লো সজনী বলি তোমাকে
শুনেছো কখনো জ্বলন্ত আগুনো
বসনো বন্ধনো করিয়ে রাখে।'

নিতাই বৈরাগীর সম্পূর্ণ নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। তিনি গায়ক হিসেবেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নিতাইয়ের খ্যাতিও সখীসংবাদ ও বিরহের গানে। সখীসংবাদের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল—

'বঁধুর বাঁশি বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশি বাজে বুঝি বিপিনে
নহে কেন অঙ্গ অবশো হইলো
সুধা বরষিলো শ্রবণে।'

কবিওয়ালাদের মধ্যে রামবসু ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁব সম্পূর্ণ নাম রামমোহন বসু (জন্মঃ— ১৭৮৬ খ্রী., হাওড়ার সালকিযা)। সাধাবণভাবে বলা হয রামবসুই হলেন শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা। শ্রদ্ধেয় সুশীল কুমার দে রামবসু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'Ram Basu was a poet in the true sense of the term.' বিবহের পদে রামবসু ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রামবসুর নিম্নোক্ত গানটি উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজনাবাযণ বসুর প্রশংসা ও রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি লাভ করে—

'মনে বৈলো সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি, বলি, বলা হলো না
শরমে মরমের কথা বলা গেলো না।'

কবিওয়ালা হিসাবে এন্টনি ফিরিঙ্গীর নামও উল্লেখযোগ্য। রামবসুব সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ তির্যক উক্তি-প্রত্যুক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে। যথা—

'সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মোড়ালি
ও তোব পাদ্রী সাহেব শুনতে পেলে
গাযে দেবে চুনকালি।' (রামবসু)
'খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইবে ভাই
শুধু নামেব ফেরে মানুষ ফেবে
একথাও শুনি নাই।' (এন্টনি কবিযাল)

সংযতভাবে যে কোন সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকে প্রতি স্তবে এমনভাবে কবি বিন্যাস করবেন যাতে পাঠকমনে স্বাভাবিক প্রগতিবোধ জেগে ওঠে। সৃষ্টিশীল এষণা হল কল্পনারই একটি রূপ। কবিগানে শৈলী এসেছে টেকনিক অব্ এক্সপ্রেশন বা প্রকাশ কৌশল রূপে। নতুন ভাবনা থাকলেও পক্ষ ও বিপক্ষের ভাবনা পরম্পরায় সহজ সম্পর্ক, প্রকাশভঙ্গীব স্বচ্ছতা এবং সংপ্রেষণের ক্ষমতা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিসঙ্গীতে শৈলীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কবিসঙ্গীতের ভাষা গঠনে স্বেচ্ছাচারিতা, উদাসীনতা এবং সংপ্রেষণাহীনতার জন্য তা শৈলীহীন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথেব কবিগানের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশ করে বলেছেন—

> 'ইহা এক নতুন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নতুন পদার্থেব ন্যায় পরমাণু অতিশয় অল্প।.......একসময়ে স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়েছিল, তৎপূর্বেও তাহাদেব কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায়না।'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগান নিষ্ফল জীবনসাধনাব ঐতিহ্যবহ—মনে হয় একথা সর্বাংশে সত্য নয়। অনাগত আলোকের অদৃশ্য রশ্মিসম্পাৎ তাঁদেব অন্ধকারাচ্ছন্ন চেতনাকে অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছিল—যে কোন কালেব সাহিত্য পাঠকের কাছে তা উপেক্ষণীয় হতে পারে না। হরুঠাকুব, রামবসু, নিতাই বৈরাগী, ভোলাময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গীর মত কবিওয়ালা সাধন ঐতিহ্যে সর্বকালিক স্বীকৃতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁবা পুবাতন ধারাব অনুবর্তন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাব স্বাভাবিক অনুসরণ কালেব প্রভাবে আর সম্ভব ছিল না। আবার নবীনকে বরণ করে নেবার শক্তিও তাঁরা অর্জন করতে পারেননি। পুবাতন প্রসঙ্গে এই নেতিবাচকতাই যুগসন্ধিলগ্নে তাঁদেব শক্তিপরীক্ষার বর্ণপরিচয় হলেও 'ক্ষণজীবি পতঙ্গ' হিসেবে স্থানলাভেব ছাড়পত্র।

সাময়িক পত্র

চতুর্দশ শতক থেকে ইংবাজী সাহিত্যে যে গদ্যের জন্ম হয়, তার উৎসমূল ছিল চার্চের সঙ্গে বিবোধ, চিন্তাব জগতে বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস ইত্যাদির মত ঘটনা। সাময়িক পত্র সেখানে কোন অংশগ্রহণ করেনি। তুলনায় অত্যন্ত অর্বাচীন কালে আবির্ভূত বাংলা গদ্য একেবারে আদি যুগ থেকেই প্রধানত সংহত ও সম্পূর্ণ রূপ পেতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাময়িক পত্রের আশ্রয়েই। এর কারণ সাময়িক পত্ররচনার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যেই নিহিত। বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা গদ্যের ধারায় অন্যতম একটি পদক্ষেপ। এই ঘটনার অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ ফল হল সাময়িক পত্রের আবির্ভাব।

কোন গ্রন্থবচনায় দীর্ঘকালের প্রস্তুতি, বিষয় নির্বাচনের ব্যস্ততা, উপকরণ সংগ্রহেব পবিশ্রম, লেখার সুযোগ ও সময় এবং মুদ্রণের জন্য প্রতীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রস্তুতিব কাল অতি সংক্ষিপ্ত ও এর প্রকাশ দ্রুত এবং নিয়মিত। এই কারণেই সাময়িক পত্রের আলোচ্য বস্তু মানুষের জীবন ও আকাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতির চতুর্দিকে অবলম্বন কবতে পাবে। ড. সুকুমাব সেন বলেছেন—

> 'সাধাবণ পাঠকের উপযোগী সংবাদও সরল কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা সেকালের সাময়িক পত্র সমসাময়িক বাংলা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইযা ইহাকেই প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণ উপভোগ্য রসসৃষ্টির বাহন করে তোলে।'

বাংলা সাময়িক পত্রের ধাবাকে উনিশ শতকেব প্রেক্ষিতে তিনটি স্তরে ভাগ কবা যায়। (১) 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮)-এর আবির্ভাবের কাল থেকে প্রাক্‌-'তত্ত্ববোধিনী'ব স্তর, (২) 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩)-ব প্রকাশকাল থেকে প্রাক্‌-'বঙ্গদর্শনে'ব স্তব (৩) বঙ্গদর্শনে'ব (১৮৭২) আবির্ভাবকাল থেকে উনিশ শতকের শেয দশক পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার স্তব।

প্রথম স্তরেব সাময়িক পত্রে লক্ষ্য ছিল প্রধানত বক্ষণ, দ্বিতীয় স্তরে বক্ষণ ও সৃজন, তৃতীয় স্তবে সৃজন ও তত্ত্বচিন্তার প্রকাশ। দ্বিতীয় স্তবে সাময়িক পত্র সাহিত্যপত্রে উন্নীত হয এবং তৃতীয় স্তরে তা সর্বাঙ্গীণভাবে বিচিত্র ধর্মকে গ্রহণ করে আধুনিকতা ও অভিনবত্ব পায়। বাংলা সাময়িক পত্রে প্রথম স্তরে তিনটি ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দল গড়ে ওঠে—(ক) বক্ষণশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বীব দল—ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায ও তাব সম্পাদিত 'সম্বাদ

কৌমুদী' (১৮২১) এর পুরোভাগে ছিল। (খ) সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী-রামমোহন এই দলের নেতা এবং 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) এর মুখপত্র। (গ) আধুনিক চিন্তাধারার অনুপন্থী মিশনারী দল—ডিরোজিও'র ব্যক্তিত্ব এবং 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) এর সঙ্গে জড়িত। ইংলণ্ডের 'এডিনবরা রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্ল্যাকউড্স্ ম্যাগাজিন', 'স্কটল্যাণ্ড রিভিউ' ইত্যাদি যেসব পত্রিকা বেরোয়, তাদের লক্ষ্য ছিল রোম্যান্টিক কবিদের তীব্র সমালোচনা করা। হ্যাজলিট, ডি-কোয়েন্সি, ল্যাম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব এর সঙ্গে জড়িত ছিল। আমাদের দেশে সাহিত্য ভাবনার বিরোধিতা নয়, ধর্ম ও নবাগত সংস্কৃতিভাবনার বিরোধিতা করার ফসল হয় সাময়িক পত্র। এই স্তরে যে সকল পত্রিকা বেরোয় সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

পত্রিকার নাম	প্রকাশ সময়	সম্পাদক
দিগদর্শন (মাসিক)	এপ্রিল ১৮১৮	সম্পাদক · শ্রীরামপুর মিশনের জন ক্লার্ক মার্শম্যান।
সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)	২৩শে মে ১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান কার্যত দেশীয় পণ্ডিতগণ।
বাঙ্গাল গেজেটি (সাপ্তাহিক)	জুন ১৮১৮ (?)	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়
গস্পেল ম্যাগাজীন (মাসিক)	ডিসেম্বর ১৮১৯	Baptist Auxiliary missionary society.
ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ (সাপ্তাহিক)	সেপ্টেম্বর ১৮২১	রামমোহন রায় ওরফে শিবপ্রসাদ শর্মা
সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক)	৪ ডিসেম্বর ১৮২১	প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় সম্পাদক . ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত
সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	২৮ জানুয়ারী ১৮৩১	—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (মাসিক)	১০ জুন ১৮৩৫	—হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় স্তরে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণ ও সৃজন। এই স্তরে আবির্ভূত প্রধান পত্রিকাগুলি এরকম—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মাসিক)	১৬ আগস্ট ১৮৪৩	সম্পাদক—অক্ষয়কুমার দত্ত পৃষ্ঠপোষক— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়
সংবাদ রসসাগর (সাপ্তাহিক)	মার্চ ১৮৪৯	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক)	অক্টোবর ১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মাসিক পত্রিকা (মাসিক)	আগস্ট ১৮৫৪	প্যারীচাঁদ মিত্র
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক)	২০ এপ্রিল ১৮৫৫	কালীপ্রসন্ন সিংহ
সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)	১৫ নভেম্বর ১৮৫৮	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
রহস্য সন্দর্ভ (মাসিক)	ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩	রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণনাথ দত্ত

এই স্তরের প্রধান ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই স্তরের নেতৃত্ব করে এবং এই পত্রিকার জন্মযন্ত্রণা নিহিত তিনটি সূত্রে—(ক) বিশুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশে, (খ) তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার ধারায়, (গ) বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার অধিকারে। বিদ্যাসাগরের জ্ঞানমার্গী সাধনাই তাঁর সাহিত্যিক সক্রিয়তা ও সামাজিক মূল্যমান নির্ণয়ের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিনিধিত্বে ধরা পড়ে। আদর্শ সাময়িক পত্রের যে গুণ factual truth-এর স্বীকৃতি—তা তত্ত্ববোধিনীর সুগভীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও তথ্যমূলক জ্ঞানপ্রচারে দেখা দেয়। আদর্শ সাময়িক পত্রের সূচনা ও বৃদ্ধি এই স্তরেই স্পষ্ট।

তত্ত্ববোধিনী যে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে সমাজ ও গদ্যভাষাকে, 'বঙ্গদর্শন' তা থেকে জারকরস আহরণ করে চিন্তার জগতের স্থিতধীতে আবির্ভূত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৭২ সালে। এই তৃতীয় স্তরে সাময়িক পত্র সার্থক গদ্যগ্রন্থের মর্যাদা পায়—এখানেই সাময়িক পত্রের পূর্ণতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকাগুলি ঠিক আধুনিক অর্থে 'Newspaper' ছিল না। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রাণচাঞ্চল্য, উদ্দীপনা ও আত্মসচেতনতা এবং ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশের মুখপত্র হিসাবে এই যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলি কালান্তরে সুচিহ্নিত। বিশ্বজিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসু জাতির কাছে সেদিন তার-বার্তার অভাবনীয় সংবাদ প্রত্যাশিত

ছিলনা। সেদিন জীবনের স্পন্দন ও সচলতার বার্তা নিকট বা দূর, স্বদেশ বা দূরদেশ যেখান থেকেই আসুক না কেন তাই ছিল তার কছে বড় সম্মান। তাই শিক্ষা, জ্ঞানপ্রচার, ধর্মকথা, সাহিত্য, কাব্য, বিতর্ক—এককথায় সজীব জীবনপ্রবাহই এই সকল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ রাখতো। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বিদ্যাদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী', 'এডুকেশন-গেজেট' পভৃতি নাম থেকেই সাময়িক পত্রিকার এই লোকহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইসব কারণে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সমকালীন সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 'বাংলা লিখ্য গদ্যরীতির সূতিকাগার ছিল বিবিধ শিক্ষায়তন, আর তার শৈশব-কৈশোরের মুখ্য বিচরণ-ক্ষেত্র হয়েছিল বিভিন্ন সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা!' বাংলা সাময়িক পত্র বাংলা গদ্যের উন্নতির মূলে অপরিমেয় প্রেরণার সঞ্চার করেছে। কারণ—(১) সাময়িক পত্রের মাধ্যমে চিন্তামূলক, যুক্তিপূর্ণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের উপযোগী গদ্য বাঙালীর মানসিক চিন্তাশক্তিকে গঠন করতে সাহায্য করেছে।

(২) তথ্যমূলক, যুক্তিনিষ্ঠ, অন্বয়পূর্ণ গদ্যরচনা—যাকে প্রবন্ধ বলে—এই সাময়িক পত্রিকাতেই তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। (৩) ইংরাজীতে প্রবন্ধের অনুবাদ প্রথমদিকে সাময়িক পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় এবং এই প্রচেষ্টা পরবর্তী কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(৪) জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বিভিন্ন শাখা—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বসায়ন, জোতিষ্ক প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অনূদিত হয়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এইভাবেই বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে বিষয়-ব্যাপ্তি লাভ কবেছে।

(৫) সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সাময়িক পত্রিকাব মাধ্যমেই জনসাধারণেব মন স্পর্শ করেছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ভূদেব. দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র---প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রিকাব মধ্যে দিয়ে পাঠকদের কাছে তাঁদের চিন্তা, মতামত ও দর্শন উপস্থাপিত করেছিলেন।

(৬) বাংলা গদ্য জ্ঞানের প্রচারে বা স্তূপীকৃত শিক্ষামূলক বক্তব্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি; বরং বিতর্ক-বিবাদের মাধ্যমে বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষ ঘটানোর চেষ্টা এবং যুক্তি পারম্পর্যের মধ্যে দিয়ে চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করে গদ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। সাময়িক পত্রিকাব মাধ্যমেই এই ধরনের বিবাদ-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্র-বিতর্ক, নানাবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রামমোহনের মুক্তি ও সংগ্রাম এই সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল।

(৭) বাংলা সাহিত্যের অনেক বিশিষ্ট লেখকই সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বব গুপ্তের জনপ্রিয়তা মুখ্যতঃ সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেই। এছাড়া 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ সম্পাদিত 'মাসিক পত্রে', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি 'বঙ্গদর্শনে', হেমচন্দ্রের বহু কবিতা 'এডুকেশন গেজেটে' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকেব কবিতা 'ভারতী', 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই সব কারণে দিন দিন বাংলা

সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িক পত্রিকার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এছাড়া সাময়িক পত্রিকাগুলি 'নানা চিত্তাকর্ষক সংবাদাদিতে পূর্ণ থাকিত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রচার ব্যাপকভাবেই হইয়াছিল।'

(৮) *সাময়িক পত্রিকা গদ্যভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সতর্ক ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাংলা গদ্যের বিবর্তন বিস্ময়কর।* 'সাময়িক পত্রিকার পাঠক স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী, সুতরাং তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য পত্রিকার ভাষাকেও সবল ও চিত্তাকর্ষী কবা হল'। লোকপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে সমাসবদ্ধ পদের প্রায় অভাববশতঃ বিবিধার্থেব রীতির চেয়ে তত্ত্ববোধিনীর রীতি অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। ১৮৫৪ খ্রী মাসিক পত্রিকা ঘোষণা করলো—

> 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'

মাসিক পত্রিকা বস্তুতঃ অন্তঃপুরচারিণীদের জন্য তথ্যগদ্যের এক নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। বিদ্যাসাগরীয় রীতি অনুসরণ কবে 'সোমপ্রকাশ' অগ্রসর হয়েছিল। বিদ্যাসাগরীয় ভাষার সঙ্গে আলালী ভাষার উপযুক্ত মিশ্রণ ঘটিযে বাংলা গদ্যের একটি সার্থক অথচ অভিনব স্টাইলের প্রবর্তন করলো ১৮৭২ সালের 'বঙ্গদর্শন'।

সুতরাং সাময়িক পত্রিকা সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বন্ধুর পথটিকে যে ধীরে ধীরে মসৃণ ও শোভাময় করে তুলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মেঘনাদবধ কাব্য—নায়ক বিচার

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নায়ক কে, এই বিষয়ে একটি অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা মধুসূদন চর্চায় কাব্যরচনায় শতোত্তর পঞ্চত্রিংশৎ বছর পরেও বারবার উচ্চারিত হয়। এর প্রথম কারণ, মধুসূদনেব ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদিতে, বাবণ ও ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে কবির প্রায সমভায আকর্ষক মন্তব্য, কিছুটা পরবর্তী সমালোচকদেব দ্বিধান্যস্ত কাব্যবিচার, একালে মোহিতলালের ব্যাখ্যায রাবণের উপর স্বয়ং মধুসূদনের কবিসত্তার বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে আবিষ্কার বিষযক তত্ত্ব এবং কিছুটা এপিক হিরো ও রোমান্টিক হিরো এই দুই স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ সম্পর্কে আমাদেব সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। এ পর্যন্ত এই বিষয়ে সম্পন্ন আলোচনার তিনটি দৃশ্যযান ধারা, (ক) মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদ, (খ) মেঘনাদকে নাযক করতে বসে মধুসূদন শেষ পর্যন্ত রাবণকেই নায়ক করে ফেলেছেন এবং (গ) মেঘনাদ ও রাবণ—নায়ক পদবীব ক্ষেত্রে মধুসূদনেব একটি দ্বিধাগ্রস্ততা ঘটে গেছে। পূর্বাপব এই আলোচনার প্রতি সূত্রেই যুক্তির ন্যূনতা ঘটেনি। স্বতন্ত্রভাবে তিনটি মতকেই বিশ্বাস্য করে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু আমাদের মতে, বিযয়টিকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে।

মধুসূদনের মহাকাব্য জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপ প্রতীচ্য কাব্যাদর্শের ফলশ্রুতি। প্রতীচ্য কাব্যসাহিত্য পাঠের বোমাঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের দুর্মর আকৃতি মধুসূদনেব মহাকাব্যরচনার ভিতর দিযে আত্মপ্রকাশিত হবার বাসনারূপে প্রকাশ পেয়েছিল। ব্যাস-বাল্মীকি থেকে হোমাব-ভাজিল-দান্তে-ট্যাসো-এরিয়েস্টো-মিল্টনের কাব্যাদর্শই আজীবন মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ধ্রুপদী সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে তিনি সমিধ্ সংগ্রহই করেছিলেন, মহাকাব্যেব উপযোগী ছন্দ ও ভাষা তাঁকে নির্মাণ করে নিতে হয়েছিল। 'বিদেশীয় সাহিত্য ও দেশী সংস্কৃতিব অপূর্ব সমন্বয়ের রহস্যসূত্রটি তাঁর হাতেই বিধৃত।' নূতন ও পুরাতনের এই অন্তরঙ্গ মিলন মধুসূদনের কবিপ্রতিভারই স্বীকরণশক্তির পরিচয ও তাঁর পরবর্তীদেব সাহিত্যকৃতির আদিম প্রেরণা। তাঁর মহাকাব্যের নায়ক প্রসঙ্গকে এই দিক থেকেই বিচার করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের এই নতুন আধুনিক মহাকাব্য ক্লাসিক কবি কল্পনার সৃষ্টি—সরল প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ঋজু ভঙ্গিতে তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে বসেছিলেন। যা কিছু ইন্দ্রিয়গম্য আমাদের দেহ-মনের পক্ষে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য তাকেই তিনি ক্লাসিক কবির উপযোগী ভাষায় বিবৃত করতে চেয়েছিলেন। তখন বাংলা বাক্যে রোমান্টিক যুগের উন্মাদনা জাগেনি। মধুসূদনের আত্মনিরপেক্ষ নিরাসক্ত হৃদয় ও মননের বাঙ্‌ময় প্রকাশই 'মেঘনাদবধ কাব্য'টিকে নিপুণ সূচীশিল্পের মতো ধীরে ধীরে নির্মাণ

করেছে। সুতরাং এই কাব্যের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কবি একটি আদর্শকেই অনুসরণ করে গেছেন—সে আদর্শ ক্লাসিক কবির, মহাকাব্যের কবির যুগায়ত আদর্শ। এই দিক থেকে মধুসূদন তাঁর নায়ক চরিত্র সৃষ্টিতে আদর্শভ্রষ্ট হননি এবং একটি নায়ককেই তাঁর কাব্যের অক্ষরেখায় স্থাপিত কবেছেন। অথচ রাবণ ও মেঘনাদ—এ কাব্যে দুজনেই দেশ-জাতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম—কিন্তু রাবণে যখন এরই সাথে ভিন্নতর একটি মাত্রাযুক্ত তখন ইন্দ্রজিতে এই একাত্মতা অনেক সরল ও ঋজু। সে সার্থক ক্লাসিকাল চরিত্র, যথার্থ এপিক নায়ক। তবে নিরঙ্কুশ ক্লাসিক কল্পনা এ যুগে কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষত প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণের যুগে সর্বাধিক ক্লাসিক কাব্যেও রোমান্টিক গীতিমূর্ছনা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, মিল্টনই তার দৃষ্টান্ত। সুতরাং, 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র একনায়কত্বে বিশ্বাস ভিত্তিহীন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মূল ঘটনা তার নায়ক চরিত্রকে অবলম্বন করেই সংঘটিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মূল ঘটনা তার নামকরণের মধ্যেই প্রকাশিত—মেঘনাদই এই কাব্যের নায়ক, মেঘনাদের মৃত্যুকে নিয়েই 'মেঘনাদবধ কাব্য'। টরকুইটো ট্যাসো মহাকাব্যের নায়ক সম্পর্কে বলেছেন—মহাকাব্যের নায়ককে সৎ ও নির্দোষ চরিত্র হতে হবে। রাবণ এরিস্টটলের শর্তানুযায়ী নায়কোচিত লক্ষণে ভূষিত, কিন্তু মেঘনাদ ট্যাসোর বিচারে কবিকল্পিত নায়ক। বীররসের কাব্যে বীর্যই আমাদের কাছে প্রত্যাশিত, *তাই তার নায়ককে বীর হতে হবে।* 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' রাবণের পরাক্রম ও বীর্য একটি *স্মৃতিমাত্র। অনুতাপ ও বিলাপই আগাগোড়া তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যে* যথার্থ বীর এই কাব্যে তা কৃত্রিম রসোদ্গাব মাত্র নয়, তা প্রমাণের সীমান্ত স্পর্শ করে *গেছে।*

মাতৃভূমি ও স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত মধু মেঘনাদকে আধুনিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। জন্মভূমি লঙ্কা তাঁর অহঙ্কার—

'তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী!............ .. . .
.... প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
এ অপমান আমি ....'

এপিক নায়কের মতই নীতিবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়, কৃতকর্মের জন্য কোনও অনুশোচনা তাঁর নেই। কবি-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—

'মধুসূদন ট্রয়-রাজকুমার হেক্টরকে মেঘনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্র এরূপ উন্নত হইয়াছে।'

মেঘনাদ বুঝতে পারে না তাঁর কোন্ ত্রুটি বা পাপের ফলে দৈব এমন বিরূপ?

'কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?'

মৃত্যুতেও তিনি নিষ্কলঙ্ক। মেঘনাদের এই অন্তিম প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা

করেননি মধুসূদন। এপিক নায়ক তার সহযোদ্ধবৃন্দ, স্বজাতি ও স্বদেশের সঙ্গে একাত্ম একথা মনে রেখে মৃত্যুগামী মেঘনাদকে দিনান্তের চিত্রকল্পের মধ্যে লঙ্কার সঙ্গে সমসত্তা করে দেখিয়েছেন কবি—

'লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।'

এপিক হিরোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই মেঘনাদ আত্মস্থ করেছেন—একথা সত্য, এ চরিত্র খুব সম্ভবত হোমার বা বাল্মীকির শূর চরিত্র। কিন্তু যে আত্মজিজ্ঞাসা ও বিষাদ ট্রাজিক অনুভূতির আত্মীয় তার সূত্রপাত ভার্জিলে আর মধুসূদন রাবণ চরিত্র রচনায় এই ভার্জিলীয় ট্রাজিক আদর্শকেই জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে গ্রহণ করেছেন। 'মেঘনাদবধে' করুণা ও বিষাদ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট কোনও শৌর্য যা হোমার ও বাল্মীকিতে সুলভ—রাবণের মধ্যে কখনই মূর্ত হয়ে ওঠেনি। আত্মজ বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের 'ক্লিষ্ট আমিত্ব' 'তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে'—ট্রাজিক একাকিত্বেরই স্বীকারোক্তি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

'বীরবাহুশোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র
এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ।'

শ্রদ্ধেয় সমালোচক প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন—

'মাইকেল রাবণের মহিমার সহিত অপর একটি উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেটি অপরিমেয় বেদনা। সেই বেদনার জ্বালাতেই রাবণ আজ আমাদের সমবেদনার পাত্র ..।'

এই অনুতাপ, হাহাকার, নিয়তিনির্যাতিত ভাগ্যবিপর্যস্ত মানবাত্মার রোরুদ্যমানতাই রাবণকে নায়কের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি—বৃদ্ধ প্রিয়ামকে যেমন ইলিয়াডের নায়করূপে কল্পনা করা যায় না। বোধন ও বিসর্জন যে প্রতিমার, পূজা তো তাঁরই—শূন্য দেবমণ্ডপে মূর্ছাতুর হাহাকার কি পূজারীকে দেবস্থানে বসাতে পারে? ট্রাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে বহু সাদৃশ্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডি মানবমনে ভয় ও অনুকম্পা জাগায় আর মহাকাব্য জাগায় বিশালতা আর বিস্ময়। তাই doing ও suffering ট্রাজেডির নায়কের ক্ষেত্রে, সত্য হলেও মহাকাব্যের নায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, অথচ সেই কায়কারণ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ পরিণামের সূত্র ধরে মেঘনাদ অপেক্ষা রাবণ চরিত্রকে নায়কোচিত প্রাধান্য দান করতে বসা ভ্রান্ততারই নামান্তর। তবে রাবণ চরিত্রে 'আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে, ফলে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর ভাবত-দর্শন অনেকখানি এগিয়েছে।' সমালোচক সঠিকই বলেছেন—

'মেঘনাদ বধের moral value বাল্মীকির নয়.. ..কৃত্তিবাসের নয়.. বিশেষ করে... মাইকেলের যুগের, যুগধর্মের প্রভাবে রামলক্ষ্মণ ছোট হয়ে গেল—রাবণ হয়ে উঠলো বড়, মেঘনাদ হোলো নায়ক।'

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্গনামগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে নায়কের গৌরব নিঃসপত্নভাবে ইন্দ্রজিতেরই-সর্গের নামকরণে তাঁরই মেঘরন্ধ্রচ্যুত জলদর্চিরেখা এসে

পড়েছে। প্রথম সর্গের 'অভিষেক' তাঁরই সৈনাপত্য গ্রহণের উৎসবায়োজন। দ্বিতীয় সর্গের নাম ও বিষয় 'অস্ত্রলাভ'—দেবলোকের তৎপরতায় লক্ষ্মণের দৈবাস্ত্রলাভ হলেও তা মেঘনাদকেই প্রভাতে যজ্ঞারম্ভের পূর্বে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই। তৃতীয় সর্গ 'সমাগম' প্রমীলার মেঘনাদের সঙ্গে মিলন। চতুর্থ সর্গ 'অশোকবন'—অশোকবনে বন্দিনী সীতার অশ্রুবাষ্পাতুর মূর্তি ও ইন্দ্রজিতের অভিষেকে আরব্ধ ইন্দ্রজিৎ বধের উদ্যোগ। 'উদ্যোগ' নামক পঞ্চম সর্গ ইন্দ্রজিৎ বধের উদ্যোগ। ষষ্ঠ সর্গ 'বধ'—কাব্যের কেন্দ্র ঘটনা, নায়কেব মৃত্যু ঘটনা। 'সপ্তম সর্গে অবশ্য রাবণের প্রতিষ্ঠা-তা ইন্দ্রজিতের জন্যই-এই মৃত্যুর মহান কারুণ্য প্রমাণের জন্য অনমনীয় প্রতিহিংসার এই তীব্রতা। অষ্টম সর্গ 'প্রেতপুরীকেই' কেবল ইন্দ্রজিৎপ্রধান কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় নতুবা নবম সর্গে ইন্দ্রজিতের 'সংস্ক্রিয়া' অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টির দ্বারা কাব্যসমাপ্তি করে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের জীবনবৃত্তকে সম্পূর্ণই করেছেন। এই সম্পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যে রাবণকে দেখা যায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

'ইন্দ্রজিৎ যেন পর্বতকে বেষ্টন কবিযা পর্বতশিখরে উঠিবার একখানি পথ, আর রাবণ সেই পর্বতের শীর্ষচূড়া। লতা গুল্মে জঙ্গলে মুক্ত আকাশের নীচ দিয়া সেই পথ চলিতে চলিতে পর্বতশিখব কখনও যাত্রীব পক্ষে দৃশ্যমান হইযাছে, কখনও পার্শ্ববর্তী বিরাট খাদ মুখব্যাদান করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পদতল হইতে পথটি কখনও সরিয়া যায় নাই বলিয়াই পর্বত পরিক্রমা সম্ভব হইয়াছে। এই পথটাই অভিযানের নাযক'।

'রেনেসঁস' গ্রন্থে উইল ডুরান্ট বলেন—''বুদ্ধিগত মুক্তি ও নীতিগত মুক্তিব সমন্বযে জন্ম হল 'রেনেসাঁস মানবেব।' সে এক বাধাহীন ব্যক্তিত্ব, অন্তঃশক্তির উন্মেষ ঘটাতে ব্যস্ত, গর্বিত চিত্ত; ধর্মীয দীনতাব প্রতি তাঁব ধিক্কাব, দুর্বলতা-ভীরুতাব প্রতি তার ঘৃণা, নীতি-সংস্কার-ঈশ্বব সমস্ত প্রাচীন নিয়ম লঙ্ঘনে সে অকুণ্ঠ। এমনই স্পর্ধিত আত্মপ্রত্যয়ে মধুসূদন তাঁর Literary Epic 'মেঘনাদবধ কাব্য'য় অর্জন করেন প্রাচীন মহাকাব্য (Epic of growth) পবিবেশিত সিদ্ধরসকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘনের প্রেবণা।

সম্পূর্ণ বিপরীত এক অবস্থান থেকে, দৃষ্টিকোণ থেকে 'রাম' যখন মধুসূদনের কাছে ঘৃণিত ('I despise Ram and his rabble') ঠিক সে মুহূর্তে রাবণ তাঁর মহাকাব্যিক কল্পনাব উত্তুঙ্গ আশ্রয়—

''the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.'

অন্যদিকে এ কাব্যের নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য'! মেঘনাদের হত্যা এ কাব্যেব প্রধান ঘটনা। এবং কবিব কাছেও যে তার প্রমাণ এ প্রসঙ্গে কবির দুটি বিখ্যাত স্বীকারোক্তি।

'I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit.

এবং

'it costs me many a tear to kill him'

সুতবাং মহাকাব্যের নাযকত্বে প্রতিস্পর্ধী হযে ওঠার সম্ভাবনা থাকে পিতা-পুত্রের, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের। ফলে নাযকবিচারের প্রথম পদক্ষেপেই আমবা জেনে নেব Epic hero সম্পর্কে যা বলা হয়েছে Cassell's encyclopaedia of literature এ—

'Epic heroes are to some extent representative of whole human races. Thus while epic raises its figures to astounding heroidc stature, it never makes them strange by eccentricity. They may be giants but they retain the form and blood of the family of man.'

অর্থাৎ মহাকাব্যের নায়ক মানবজাতির প্রতিভূস্বরূপ। রাবণ ও মেঘনাদ এ কাব্যে দুজনেই তো দেশ-জাতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম—কিন্তু রাবণে যখন এরই সাথে ভিন্নতর একটি মাত্রা যুক্ত তখন ইন্দ্রজিতে এই একাত্মতা অনেক সরল ও ঋজু। সে সার্থক ক্ল্যাসিকাল চরিত্র, যথার্থ এপিক নায়ক।

এপিক নায়কের যা কিছু ব্যক্তিত্ব ও গৌরব তা গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই, তিনি যে সংগ্রামে লিপ্ত তা ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, অনুবর্তী নরগোষ্ঠীর মিলিত সংগ্রাম। বাল্মীকির মতই মধুসূদনের মেঘনাদও তাই কুলগৌরব ও জাত্যাভিমানে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন জটিলতাহীন। পরিবার এবং নৃগোষ্ঠী বা ট্রাইবের প্রতি আনুগত্যই হোমার ও বাল্মীকিতে দেখা যায় কিন্তু জন্মভূমি বা পিতৃভূমির ধারণা সেখানে নেই। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা ও স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত মধু মেঘনাদকে এই আধুনিক জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। এরই অনুষঙ্গে আসে সংকটচেতনা, দ্বিধা বা dilema, হিংসা ও দ্বন্দ্ব অপরিহার্য জেনেও তা গ্রহণে এক ধরনের সার্বিক অনীহা। মেঘনাদ বধেও করুণা ও বিষাদ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট কোনও শৌর্য—যা হোমার ও বাল্মীকিতে সুলভ—রাবণের মধ্যে কখনই মূর্ত হয়ে ওঠেনি। মদুসূদন হোমারিয় অতিকায় শূরের মধ্যেও অনায়াসেই ভার্জিলীয় রীতিতে পরিচিত মানবিক ইচ্ছা স্থাপিত করে দিয়েছেন। ফলে কেবলমাত্র হোমারিয় বিচার প্রয়োগ করতে গেলে এ কাব্যের রসবোধ ব্যাহত হতে বাধ্য, নায়ক বিচারে ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

'মেঘনাদ বধ কাব্য' এর প্রথমেই মধুসূদন রাবণকে এপিক-নায়কের সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দেন—'হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গের যথা তেজপুঞ্জ।' শুধু এপিক নায়কেরই নয়, ট্র্যাজিক নায়কের প্রতিষ্ঠা ঘটে যায় এখানে। আত্মজ বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের ক্লিষ্ট আমিত্ব 'তব কেন আর আমি থাকি রে এখানে'—ট্র্যাজিক একাকিত্বেরই স্বীকারোক্তি। সমালোচক নগেন্দ্রনাথ সোম যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

'বীরবাহু শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ।'

কিন্তু এপিক নায়ক এই অন্ধকার আত্ম-একাকীত্বে নির্বাসিত থাকতে পারে না বলে কবি রাবণকে ফিরিয়ে নিয়ে যান উৎসাহ উদ্যম ও কর্তব্যবোধের মধ্যে—

'কোন বীর হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে সংগ্রামে?'

সপ্তমসর্গেও মেঘনাদের মৃত্যুর শোক ও তার প্রতিবিধানের জন্য শৌর্যের শীর্ষে উন্নীত রাবণের মধ্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক আদর্শের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে দেয়। এপিক নায়কের মতো তিনি জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীর গৌরব ও গ্লানির সঙ্গে একাত্ম সমষ্টির নেতা, অথচ তার চাইতেও বেশি, রোমান্টিক নায়কের মতো তিনিই আবার ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখে একাকী, অসামান্যতায় অনন্য ও অত্যুচ্চ—

'হায় ইচ্ছা করে

ছাড়িয়া কনকলঙ্কা নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!'

'এ কি কেবল রাবণের বিলাপ? এ যে হতাশ শোকাতুর মানুষের চিরকালীন খেদোক্তি। এ মাইকেল কোন বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের নন; চিরকালের সর্বদেশের।'

প্রথম ও সপ্তম উভয় সর্গেরই সমগ্র ভার ধারণ করে আছে রাবণ। এই ভার শোক ও শৌর্য উভয়েরই। বীরবাহু ও মেঘনাদ উভয়েই রাবণের আত্মজ, তাদের গরিমাও রাবণের গরিমা-সম্ভূত। প্রথম থেকে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত রাবণের এই ব্যক্তিত্বময় প্রতিষ্ঠা। মেঘনাদবধ কাব্যে দ্বিতীয় কোন নায়ক নেই যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন প্রবলভাবে অস্তিত্ববান, যিনি শোক ও শৌর্য—উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য, যিনি এ মহাকাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ় এবং অপরাজিত, বীরবাহুবধ ও মেঘনাদ বধ—এই দুই ঘটনার অন্তর্বর্তী ও অনুবর্তীভূমিতে যিনি একা সমানভাবে 'রাজরাজেন্দ্র'। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

'মধুর নায়ক সর্ববিধ সুস্থতার প্রতীক—সে দক্ষ সেনানী, প্রেমময় স্বামী, স্নেহকাতর পিতা, জনপ্রিয় শাসক এবং সুতনু নর। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীসমাজে যা কিছু অভিপ্রেত সে সকল সদ্‌গুণের সংস্থিতি ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে।'

যুদ্ধক্ষেত্রেও রাবণ সম্পূর্ণ অপ্রতিহত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অব্যর্থ। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণই এমন চূড়ান্ত বিজয়ের অধিকারী এ হিসেবেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। এখানে দেবশক্তির পরাভবও চূড়ান্ত। রাবণ এখানে প্রকৃত এপিক নায়ক; যিনি তাঁর দেশ জাতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে অভিন্ন। তাই রাবণ রথে আরোহণ করা মাত্র এ বিজয় সমগ্র রক্ষঃ অনীকিনীর বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ভার্জিলীয় নায়কের বীরত্ব যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, অন্তরের করুণ আর্তির মধ্যে, রাবণের বীরত্বও তেমনি তাঁর ধীরোদাত্ত বিলাপ, শোক ও সর্বাত্মক বিষাদের মধ্যেই। যখন তাঁর বিজয় চূড়ান্ত তখনই তিনি চূড়ান্ত বিষাদে আচ্ছন্ন। এ কাব্যের শুরুতে বিষাদ, সমাপ্তিতেও বিষাদ, 'সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'—এবং উভয়ক্ষেত্রেই এই বিষাদের মূল আশ্রয় রাবণ। রাবণের মতো বিরাট পুরুষের এই অন্তর্গত বিষাদ—যা এই মহাকাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিধৃত—এটিই এপিক ও ট্রাজিক রসানুভূতির মিলন ঘটিয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু একথা সত্য— কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের সর্বধ্বংসের চেতনা; মেঘনাদের মৃত্যু সেই চেতনাকেই সম্পূর্ণতা ও তীব্রতা দিয়েছে। ঘটনা ও ভাবের কেন্দ্রবিন্দু এভাবে সহজে সমন্বিত হওয়ায় কাব্যের নায়কত্বলাভে রাবণকে বিব্রত করে না মেঘনাদ চরিত্র। বরং কাপুরুষ হত্যার শিকার হয়ে মৃত্যুতে মেঘনাদের যে ট্রাজেডি তা ভিতরে অগাধ শূন্যতাবোধ নিয়ে জীবিত রাবণের ট্রাজেডিকেই আরো পুষ্ট করে। লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির সংবাদে কোনো রণহুংকার নয়, নৈরাশ্যের তিমিরে মগ্ন রাবণ বলেন—

'বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব রবি!'

বিশ শতক অন্বীক্ষা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলালের বত্রিশ বছরের (১৮৮২-১৯১৩) সাহিত্যসাধনায় বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখনীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি গীতিকবিতা ও গান রচনা করেছেন, হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, লঘুরসের প্রহসন লিখেছেন আবার গভীররসাত্মক নাটক লিখেছেন। কবিতার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (প্রথম ভাগ) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন '১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়সে রচিত আমার গীতিগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেওঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্যভারত' এ প্রকাশিত হয়'। 'আর্যগাথা' সঙ্গীত হলেও কবিতা হিসাবেও এর রসাস্বাদনে বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটে না। এই গ্রন্থের রচনাগুলিকে বিষয়ানুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায় (১) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা (প্রকৃতি পূজা) (২) ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতা (ঈশ্বর স্তুতি) (৩) বেদনানুভূতির কবিতা (বিষাদোচ্ছ্বাস) ও (৪) দেশপ্রেমমূলক কবিতা (আর্যবীণা)।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দশ বছরেরও বেশি ব্যবধান। এই দুটি কাব্য রচনার মাঝে কবি "The Lyrics of Ind" নামে একটি ইংরাজী কাব্য প্রকাশ করেন (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)। কাব্যটি তাঁর বিলাতের বসবাসকালে লন্ডন থেকে ছাপা হয়েছিল। আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যটি কবি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগের নাম দিয়েছেন 'কুহু'। এই অংশে তাঁর মৌলিক কবিতাগুলো সঙ্কলিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশের নাম 'পিউ'। এই অংশে কবি কয়েকটি অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্কচ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ করেছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগে সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রেমের মাধুর্য স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয়েছে।

'আষাঢ়ে' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থটিতে কয়েকটি হাসির গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। 'আষাঢ়ে'র গল্পগুলো একজাতীয় নয়—এদের বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন চাকুরীজীবনের বিড়ম্বনা ও রুক্ষ বাস্তব চিত্র দেখতে পাওয়া যায় 'কেরাণী' কবিতায়, আবার 'অদলবদল' কবিতাটি আগাগোড়া কৌতুকরসের। এই বিশুদ্ধ কৌতুকরস ছাড়াও, সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপও এই কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে একই সূত্রে সংযুক্ত করেছে 'হাসির গান'। হাসির গানের সঙ্কলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দে। এক হিসাবে 'হাসির গান' সমগ্র দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের কেন্দ্রীয় উপাদান। হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গান হিসাবে এই গ্রন্থের সর্বজনস্বীকৃত স্থান আছে—প্রহসন আর নাটকের দিক থেকেও এই অসাধারণ সৃষ্টির মূল্য কম নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলোর আসল প্রাণ ওই হাসিব গান। এই প্রসঙ্গে শ্রী সজনীকান্ত দাস বলেছেন—'এ গানগুলিকে আরও স্থায়িত্ব দেবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল এগুলিকে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতকার হইতে নাট্যকারের পদবীতে উত্তীর্ণ হন।' দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন—'আমার কাব্যশক্তি যাহা কিছু ছিল আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'

হাসির গান ছাড়া আবও কয়টি কাব্যগ্রন্থাদিতে তাঁর কবিতাসমূহ বিধৃত সেগুলো হল—মন্দ্র (১৯০২) আলেখ্য (১৯০৭) ত্রিবেণী (১৯১২)। ত্রিবেণী দ্বিজেন্দ্রলালেব শেষ কাব্যগ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সকল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি নাট্যবচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। সমকালীন প্রচলিত ধারা সমূহের অনুসরণেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যরচনায় প্রয়াসী হন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং প্রহসনমূলক নাট্যসমূহের তিনি রচয়িতা। পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪) পৌরাণিক নাটকের অন্তর্গত।

দ্বিজেন্দ্রলালের পুবাণাশ্রয়ী নাটকেব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যধরনেব। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সংশয়াতুর করে তুলেছিল। তিনি পুবাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে অলৌকিকতার আবরণ উন্মুক্ত করে এক-একটি লৌকিক জীবনের বাস্তব সমৃদ্ধ ইতিহাসই আবিষ্কার করেছেন, তাই তাঁর পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলোতে দেব-দেবীর অলৌকিক জীবনাচরণের কথা নেই, আছে নর-নারীর বাস্তব জীবনেব মানবীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের কাহিনী। সেই কারণে 'পাষাণী'তে তাঁর অহল্যা পরপুরুষ আসক্তা কামনাময়ী রমণী, ইন্দ্র পরস্ত্রীলোলুপ লম্পট পুরুষ। 'সীতা'য় রামচন্দ্র ব্যক্তিত্বহীন। এমন কি ভীষ্মে অম্বা কাহিনী যুক্ত করে ভীষ্ম চবিত্রেব মধ্যেও তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। পাষাণী এবং সীতা উভয়ক্ষেত্রে ইংরাজী অপেরাব শিল্পশৈলী নাট্যকারেব অজান্তেই মনে হয় নাটকে স্থান লাভ করেছে। শান্ত-সত্যবতীব দৃশ্যটি (ভীষ্ম ২/৩) শেক্সপীয়রেব 'রিচার্ড দি লর্ড' নাটকের (১/২) প্রভাবজাত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই তিনটি নাট্যকাব্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীব গদ্যকাহিনীর ও রোমহর্ষক অতিনাটকীযতার প্রভাব থেকে মুক্ত কবতে পাবেননি। তাই তাঁব এই তিনটি নাট্যকাব্যকে বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক না বলে পুরাণাশ্রয়ী রোমান্টিক নাট্যকাব্য বলে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল দু'খানি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন—(১) পরপারে (১৯১২) ও নাট্যকারের মৃত্যুর পবে প্রকাশিত বঙ্গনাবী (১৯১৬)। তিনি তাঁর এই দুটি সামাজিক নাটক রচনাব আগে বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসনের মধ্যে সমাজ-সমালোচনা

করেছিলেন, কিন্তু প্রহসন রচনার লঘুচপল মনোভঙ্গির মধ্যে সামাজিক নাট্যাদর্শের সম্ভাবনা পরীক্ষিত হয়নি। 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'র মধ্যে গভীররসাত্মক সামাজিক নাটক রচনার শক্তি পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁর সামাজিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, দু-একটি ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ও অমৃতলালের প্রভাবও আছে। পরপারের 'শান্তা' ও বঙ্গনারীর 'সুশীলা' চরিত্রের মধ্যে ইবসেনের নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে। তবে তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সামাজিক নাটক অপেক্ষা বাঙালী নাট্যকারদেরই পথ অনুসরণ করেছিলেন। জীবনের অপরাহ্নবেলায় তিনি সামাজিক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু কোন নূতন দিক নির্দেশ করতে পারেন নি। বঙ্গনারীর সদানন্দের মুখ দিয়ে নাট্যকার তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনের পরিবর্তনের কথা মর্মভেদী বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন—'প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সেদিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।'—এই উক্তিটির আলোকে শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের এক নিগূঢ় সঙ্কেত পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক নাটকই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বক্ষেত্র। তাঁর লেখনীতেই প্রথম শ্রেণীর বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম। জাগ্রত দেশপ্রেমের অভাবে মধুসূদনের ঐতিহাসিক নাটক যেখানে সীমিত প্রয়াসে আবদ্ধ, হিন্দুমেলার উত্তপ্ত উত্তেজনার সংস্পর্শে জ্যোতিরিন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকসমূহ যেখানে সার্থকতার পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে সর্বাঙ্গীন সার্থকতার অধিকারী। সমালোচক ড রথীন্দ্রনাথ রায়ের মতে—'ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতম রূপটি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল। তাঁর পরেও ঐতিহাসিক নাটক রচনা হইয়াছে, কিন্তু উহার মণিভাণ্ডারের শেষ চাবিটি শুধু ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেই।' ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সুষম সমন্বয় সাধন, বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত দেশ-প্রেমের সংযোজন, কবিত্বমণ্ডিত সংলাপ পরিবেশন প্রভৃতির দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম শ্রেণীর আদর্শ সৃষ্টি করলেন। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী তাই উল্লেখ করেছেন—'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব মাত্র সেখানে তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক তারাবাঈ (১৯০৩) গদ্য ও কবিতার মিশ্রণজাত সংলাপে রচিত হয়েছে। সর্বপ্রথম রচনার জন্য প্রাথমিক দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা তাই একটু বেশি পরিমাণেই তারাবাঈ-এ দেখা যায়। তারাবাঈ নাটকের কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত হলেও তিনি নাট্যকাব্য রচনার সহজাত প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এমনকি নাটকটির সংলাপ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা। তারাবাঈ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হলেও, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে এর কোন তুলনা হয় না। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে যে ভাবগম্ভীর, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মহিমার ছবি পাওয়া যায়, তারাবাঈ নাটকে তা নেই।

তারাবাঈ রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলাল সাতটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন : প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৫), নূরজাহান (১৯০৮) মেবার পতন (১৯০৮) সাজাহান (১৯০৯) চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) সিংহল বিজয় (১৯১৫)। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এই সাতটি ঐতিহাসিক নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়। প্রতাপসিংহ থেকে সাজাহান পর্যন্ত পাঁচখানি নাটকের উপাদান মুসলমান যুগের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, ও মেবারপতন এই তিনটি নাটকে রাজপুত ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়ে তাদের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেমিকতা, ও আদর্শবাদকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। নূরজাহান ও শাজাহান নাটকে তিনি প্রধানত জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের পারিবারিক জীবনের উপর লক্ষ্য রেখেছেন—রাজপুত ইতিহাস এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। চন্দ্রগুপ্ত ও সিংহল বিজয় নাটক দুটি প্রাচীন ভারতের হিন্দুযুগ নিয়ে লেখা নাটক। পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় 'সিংহল বিজয়' নাটকের ইতিহাস অংশ নিতান্তই গৌণ—যেটুকু ঐতিহাসিক অংশ আছে তা ইতিহাস নয় ইতিকথা বা পুবাবৃত্ত।

স্বদেশ ও স্বকাল নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে শিল্পচৈতন্যকে। একে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রও পারেন নি। সেই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের সংগ্রামী প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাসের জীবনায়নের তুলনায় সমকালীন বাঙালী চেতনার অগ্নিময় বাসনাই প্রায়শঃ মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই একে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন বাঙালী জীবননাট্যের এক কাব্যনির্যাস বললে অত্যুক্তি হয় না। মেবাব পতন নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারকে বলতে শোনা যায় 'এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি, যে নীতি বিশ্বপ্রেম।' সমস্ত কাহিনীতে তাই রাজপুত জীবনের ঐতিহাসিক পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে সমসাময়িক বাঙালীর জীবন সংগ্রাম। নাটকের শেষে মানসীর উক্তি ও চারণীদের গানের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনদর্শন পূর্ণরূপে ঘোষিত হয়েছে। চারণীদের কণ্ঠে উচ্চাবিত হয়েছে—

'কিসের শোক করিস ভাই আবাব তোরা মানুষ হ'
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।'

সুতরাং একথা বলা যায় যে নাটকের বস্তুধর্মিতা (objectivity) এখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং নাটকেব পাত্রপাত্রীরা কবির ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে রূপায়িত হয়েছে। তাই মেবার পতন দ্বিজেন্দ্র জীবন দর্শনেরই নাট্যরূপ।

'নূরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহান। এই চবিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মনস্তত্ত্বসম্মত জটিল চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নূরজাহান চরিত্রে একাধিক বিরুদ্ধ -বৃত্তিব সংঘাতলীলা পরিস্ফুট হয়েছে। নাট্যকার নূরজাহানের প্রাপ্তি প্রবঞ্চনা প্রতিহিংসা ইত্যাদির বর্ণনা যেমন ইতিহাসের সমর্থনে নাটকীয় ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন অন্যদিকে যোগ কবেছেন পরিচ্ছন্ন রুচি, শিহরণ সঞ্চারী উত্তেজনাময় সঙ্গীত, অসাধারণ কাব্যধর্মী সংলাপ ও রোমান্টিক আবহ পরিমণ্ডল। নূবজাহানের ট্রাজেডির আসল সত্য নিহিত আছে তাঁব অন্তর্জীবনের মর্মমূলে- -রূপান্তরিত ব্যক্তিসত্তার অশান্ত অস্থিরতার মধ্যে,

আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের রিক্ত নিঃস্ব পরিণতির মধ্যে। নাট্যকার অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাঁর এই আত্মিক অপচয়ের নাটকীয় চিত্র এঁকেছেন। গঠনরীতির দিক থেকে নাট্যকার এই নাটকে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ধরে সেক্সপীয়রের নাট্যশিল্পকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সর্বপ্রথম 'নূরজাহান' নাটকেই তিনি এই নাট্যরীতির স্বরূপধর্মকে অনেকখানি রূপায়িত করতে পেরেছেন। মনস্তত্ত্বসম্মত নাট্যরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সাজাহান নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্ববাদিসম্মত। সাজাহান নাটকের গঠনরীতির মধ্যে অকারণ জটিলতা নেই। নাটকে বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, হীনষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড আছে বটে কিন্তু বিশেষ কোন একটি ঘটনার প্রতি অতিনিবদ্ধতা নেই। উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব মহিমা প্রকাশ করে নি। ইতিহাসের দ্রুতগতি ঘটনাপ্রবাহ একদিকে, অন্যদিকে আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ সাজাহান। সাজাহান নাটকের ঘটনাকে ভারত ইতিহাসের বিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু কোথায়ও কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে নি। সাজাহান নাটকের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকের সুরই যেন বেজে উঠেছে। কিং লীয়র নাটকের সঙ্গে সাজাহান নাটকের অনেক পার্থক্য থাকলেও ট্রাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে শেক্সপীয়র প্রদর্শিত রাজা লীয়রের ট্রাজেডি-পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখানে সাজাহান পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার আপোষহীন দ্বন্দ্বে যেন কিং লীয়রের অনুরূপ। ঔরঙ্গজেব যেন উচ্চাশায় ম্যাকবেথ এবং ক্রূরতায় ও নির্মমতায় ইয়াগো। আর ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি নিয়ে জাহানারা যেন করডিলেযারই প্রতিরূপ। তীক্ষ্ণ ঔরঙ্গজেব-বিদ্বেষ তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে—'... ..... পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। বাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!' [পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য] দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাটকের তুলনায় 'সাজাহান' নাটকে অতিনাটকীয় উপাদান অনেক কম। 'সাজাহান' নাটক সঙ্গীত সমৃদ্ধ—কয়েকটি বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়ে নাটকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যের দিক দিয়ে 'সাজাহান' নাটকের পরেই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের স্থান। উপাদানের স্বল্পতা সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্ত নাটকে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের মূল গতিরেখা অনুসরণ করা হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রধান আকর্ষণ চাণক্য চরিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতায়, ব্যক্তিত্বে, এই কুশাগ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত ও নিপীড়িত। চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের প্রারম্ভলগ্নটি যথার্থই বীরোচিত। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও মাতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ বাসনা তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে তুলেছিল। তবে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের গঠনরীতির মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি আছে, একাধিক উপকাহিনীকে নাট্যকার মূলকাহিনীর সঙ্গে সুবিন্যস্ত করতে পারেন নি। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য মুরার কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক উপকাহিনী ও চন্দ্রকেতু-ছায়ার উপকাহিনী ঠিকমতো মিলিয়ে দিতে পারে নি। নাটকীয় ঐক্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে।

'সিংহল বিজয়' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দুবছর পর প্রকাশিত হয়। 'সিংহল বিজয়'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। এটি একটি পুরাবৃত্ত আশ্রয়ী নাট্য-রোমান্স। সিংহলের প্রাচীন আখ্যায়িকা কাব্য 'মহাবংশ' গ্রন্থে বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়েব কাহিনী আছে। নাট্যকার সেই কাহিনীর সূত্রাংশ মাত্র অবলম্বন কবে নাটকীয় কাহিনীর কোন কোন অংশ রূপ দিয়েছেন, কিন্তু নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই নাট্যকাবের স্বকপোলকল্পিত। সিংহল বিজয় নাটকে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও পারিবাবিক বিরোধের কাহিনীই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনেব মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'সিংহল বিজয় নাটকের প্লট ঐতিহাসিক নয়, পারিবারিক যড়যন্ত্রের কাহিনীমাত্র।'

'সোরাব-রুস্তম'কে দ্বিজেন্দ্রলাল 'নাট্যরঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার সমৃদ্ধির যুগে এই নাট্যরঙ্গ বা অপেবাটি রচিত হয়। 'সোরাম রুস্তম'কে সঙ্গীতবহুল অপেরাধর্মী নাটক বলা যায়। নাট্যকাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবেছেন—'ইহা অপেরায় আরম্ভ হইযা ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে'—সঙ্গীতবহুল হাস্যবসাত্মক গীতাভিনয়ের তরল পটভূমি থেকে নাট্যকাব ক্রমশঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রধান নাটকেব ভাব গভীরতাব দিকে সবে এসেছেন। এমন কি একই চবিত্রের আচার-আচরণেব মধ্যে নাটকের প্রথম ও শেষ দিকের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য দেখা যায়। সমালোচকরা এব প্রধান কাবণ হিসাবে এর রচনানীতির সঙ্গে বিষয়বস্তুব রসগত অসামঞ্জস্যের কথাই তুলে ধবেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যজীবন-সম্পর্কিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে প্রহসন রচনা বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করেছেন :

'বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সমযেই বঙ্গভাষায় লিখিত নাট্যসমূহেব সহিত আমার পরিচয় হয়।... প্রথমতঃ, প্রহসনগুলিব অভিনয দেখিযা সেগুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে কল্কি অবতার—একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই ....।'

দ্বিজেন্দ্রলাল ছয়টি বিদ্রূপাত্মক নাটিকা ও প্রহসন বচনা কবেছিলেন। সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবাব (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১২) ও আনন্দ বিদায় (১৯১২)। তবে রস ও রীতির বিচারে এই ছয়টি প্রহসনের মধ্যে নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'কল্কি অবতার' প্রহসনে সত্যিকারেব কোন অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। প্রহসনটিতে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত ও বিলাত ফেরত—এই পাঁচটি সম্প্রদাযের উপর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষিত হয়েছে। এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক চূড়ান্ত হয়ে উঠে, তখন ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হন এবং কল্কির মধ্যস্থতায় এই বিবদমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মিলন স্থাপিত হয। এই প্রহসনটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কৌতুক-চিত্রের সমষ্টি হিসাবে চিহ্নিত কবা যায, চিত্রগুলো ঘনবদ্ধ হয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন গতিবেগেব সৃষ্টি করেনি। ফলে প্রহসনটির গতিবেগ মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ'। একে বিশুদ্ধ প্রহসন বলা যায়। প্রহসনটিতে ঘটনার ঘোর প্যাঁচ ও উদ্ভটত্বই হাস্যরসের উদ্ভব করে। প্রহসনটির গানগুলিই কৌতুকরসকে জমিয়ে তুলেছে—হাসির গানের কয়েকটি বিখ্যাত গান এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার প্রহসনটি কোন দিক থেকেই সার্থক হতে পারে নি। এই প্রহসনটি হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতিকে ক্ষুণ্নই করেছে। হাস্যরসের মধ্যে কোনো শালীনতা বা সংযম নেই। স্থূল রসিকতা ও নিম্নস্তরের ভাঁড়ামি তাঁর প্রহসনটিকে একটি Low Comedy তে পরিণত করেছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' সমাজ বিদ্রূপমূলক প্রহসন। তাঁর অন্যান্য প্রহসনের মতো এখানেও কয়েকটি হাসির গান ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রহসনেই এই গানগুলো সবচেয়ে বেশি সুপ্রযুক্ত ও কার্যকরী হয়েছে।

'পুনর্জন্ম' প্রহসনটিতে লেখকের মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও অনাবিল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে প্রহসনটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা যায়। 'পুনর্জন্ম' নির্দোষ কৌতুকরস কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ প্রহসন 'আনন্দ বিদায়' অতুলকৃষ্ণ মিত্রের (১৮৫৭-১৯১২) নন্দবিদায় (১৮৮৮) নামে গীতিনাট্যের প্যারডি। প্যারডিখানিতে রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে ও অনুচিত ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণের উগ্রতা বাদ দিলেও শিল্প হিসাবেও 'আনন্দ বিদায়' অসার্থক। অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন নাটকীয় ঐক্য ও অনিবার্যতা নেই। এ যেন ব্যঙ্গের জন্যই ব্যঙ্গ করা। নব্য হিন্দুধর্মবাদী ও ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গও নাট্যকার উল্লেখ করেছেন।

কয়েকটি প্যারডি সঙ্গীত ও হাসির গান ছাড়া 'আনন্দ বিদায়'এ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। 'আনন্দ বিদায়' দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী জীবনের কোন নূতন প্রতিশ্রুতি বহন করে না। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী যতদূর সম্ভব তাঁর পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন, তিনি অবধি লিখেছেন—'তাঁহার আনন্দ বিদায়' নামক অনুকৃতি কৌতুকে (Parody) তিনি যেন কতকটা অশোভনরূপে ও অন্যায়ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।'

দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা অপরিহার্য। তার কারণ তাঁর কাব্য অথবা নাটক, যে দিকেই আলোচনা করা হোক, সঙ্গীত প্রসঙ্গ ছাড়া সে বিচার পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ তাঁর নাট্যসঙ্গীত। তবে এই নাট্যসঙ্গীতগুলো নাটকীয় প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেকালের সুবিখ্যাত গায়ক দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের পুত্র হিসাবে সঙ্গীতচর্চার শিক্ষালাভ পিতার কাছেই ঘটেছিল। সঙ্গীত রচনা ও সেই সঙ্গীতে সুর সংযোগ করেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। কারণ 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের গানগুলো লেখা হয়েছিল তাঁর বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে। বিলাতে প্রবাসকালে অর্থব্যয় করে তিনি বিলাতি সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীতের রীতির সঙ্গে মিলিয়ে

বাংলা গান শুরু করেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি অনেকগুলো স্কচ, আইরিশ ও ইংরাজী গানের অনুবাদ করেন। আর্যগাথা দ্বিতীয়ভাগের প্রেমসঙ্গীতগুলো এক সময়ে বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। বাংলাকাব্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এত সার্থকভাবে বিলাতি সুর প্রয়োগ করতে পারেন নি। 'আর্যগাথা'ব দ্বিতীয় খণ্ডের গানের চেয়ে, 'হাসির গান' অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক কোরাস—সঙ্গীতগুলো তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। এখানেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুরবৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এই জাতীয় সঙ্গীত রচনায় আজ পর্যন্তও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাব্য হিসাবেও তাঁর এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলোর একটি মূল্য আছে। বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে আত্মধিক্কাব, অতীত গৌববকাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ দ্বিজেন্দ্রলালেব স্বদেশী সঙ্গীতগুলোর কেন্দ্রীয়ভাববস্তু। তাঁব শেয জীবনের ভক্তিসঙ্গীতগুলোও যথেষ্ট মূল্যবান। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই ধরনের কবিতাই তিনি লিখেছিলেন। তাঁর অনেক অপ্রকাশিত গান ও 'নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলো' কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় 'গান' নাম দিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলি নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়ে অধিকাংশ স্থলে নাটকীয় চমৎকাবিত্ব বৃদ্ধিই করেছে। বিশেষ করে 'ভীষ্ম' নাটকেব 'আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু', 'দুর্গাদাস'-এব 'হৃদয় আমার গোপন কবে', 'মেবাব পতন'-এর 'আবার তোরা মানুয হ' ; 'সাজাহান' এর 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'চন্দ্রগুপ্ত'-এব 'যখন সঘন গগন গবজে' সংগীতগুলি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাটকীয় প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম কবে ইতর ভদ্র জনসাধারণের মধ্যে ছড়িযে পড়েছিল। তাই 'দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতকে বাদ দিলে বাংলা গানের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে।'

সুরকার, কবি, নাট্যকার হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তবে তাঁব পত্র সাহিত্য, লঘু-গুরু ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদিগুলোও বাংলাসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর কবিতা, গান ও নাটকেব তুলনায বিচিত্র শ্রেণীব গদ্যরচনা পবিধিতে ও সাহিত্যিক মূল্যবিচারে এই জাতীয় রচনাগুলোব মূল্য নিতান্ত কম নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিচ্ছিন্ন বচনাবলীকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) সামাজিক ও বাজনৈতিক প্রবন্ধ (খ) সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ (গ) বিবিধ হাস্যবসাত্মক গদ্যবচনা।

পবিশেষে একথা বলা যায-বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মাত্র পঞ্চাশ বছব আয়ুষ্কালের মধ্যে (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালেব প্রধান তিনটি দানকে অস্বীকাব করা যায না। প্রথমত, আপাত বিরোধী ভাবেব মিশ্রণজাত কাব্য ও অভিনব কাব্যরীতি, দ্বিতীয়ত, হাসিব গান, তৃতীয়ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সমন্বিত ঐতিহাসিক নাটক। সুতবাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল যে এক স্থায়ী আসনেব অধিকাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কবি যতীন্দ্রনাথ

নিদারুণ গ্রীষ্মতাপে মাটি রুক্ষ, শষ্য অনঙ্কুরিত, দীঘি শুষ্কতল, নদী শীর্ণ, আকাশ নির্মেঘ, বায়ু স্তব্ধ। এই দুঃসহ বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস বিলাপিত প্রকৃতি আবার পরিপূর্ণ শ্যামলতা লাভ করে ঘনায়মান আষাঢ়ে নব বারিপাতে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে দুঃখবাদ এই আতুর গ্রীষ্মের পীত পাণ্ডুরতা কিন্তু তা শুধু বিশ্বাসের বরযাকে আমন্ত্রণের ভূমিকামাত্র। একথা মনে রাখলে কবি হিসাবে যতীন্দ্রনাথেব মূল্য নির্ধাবণ অসম্ভব নয়।

বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সঙ্কটলগ্নে। স্বদেশ সমাজ ও সভ্যতার মন্দিবে শেষ প্রহরেব ঘণ্টা বাজছিল, রোমান্টিক কবিদের জীবন বিমুখতায় কবি ছিলেন ক্ষুব্ধ, মনুষ্যত্বের অপমানে পীড়িত, মানুষের ক্লান্ত জীবনযাত্রায় কবি ব্যথিত, পণ্ডিতেব মূঢতায ধনীর দৈন্যর অত্যাচাবে উদ্বিগ্ন। এই সর্বাত্মক দুঃখের দিনে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মধুর ও সুন্দরের উপাসক হতে পারেন নি। সুতরাং জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষত-বিক্ষত বস্তুরূপকে তিনি কবিতায ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুধু এটুকু করেই তিনি তাঁর সারস্বত দাযিত্ব সমাপ্ত করেননি, তাঁর মনে হয়েছে অন্যান্য কবিরা কবি হিসাবে মিথ্যাচবণ করছেন, কবিরূপে অনেকেই তাঁদের সামাজিক কর্তব্য পালন করছেন না—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রচারিত আনন্দবাদেব বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও অভিমান ছিল সর্বাধিক। যেন কিছুটা তার-ই প্রতিবাদে যতীন্দ্রনাথ এক দুঃখবাদের প্রচার করেছেন।

যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখবাদ বিদ্রূপ সর্বস্ব এক ধরনের নাস্তিবাদী দর্শন বলেই মনে হয়। কবি এক সংশয় ও অবিশ্বাস বশতঃ জগতের অভ্যন্তরে কোন মঙ্গলময় সত্তাব অস্তিত্ব স্পষ্টতই অস্বীকার করেছেন। এই অবিশ্বাস সংশয় নয়—আপসহীন অবিশ্বাস। তা যে কোন দৈব বিশ্বাস, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারেব বিরুদ্ধে। এজাতীয কবিতায় দেখা যায় যতীন্দ্রনাথ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তবালে কোন বিশ্বচৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কাবণ চৈতন্যে বিশ্বাসীর অর্থ বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে একটি অখণ্ড যৌক্তিকতায় এবং মঙ্গলের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন কবা। চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত যে জড় তা চৈতন্যেবই বিকাশমাত্র। কিন্তু চৈতন্য বিরোধী যে জড় তা যুক্তিহীন, সুতরাং তার স্বাভাবিক পরিণতি অমঙ্গলে ও অনির্বাণ দুঃখ জ্বালায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যতীন্দ্রনাথের সকল অবিশ্বাস ও দুঃখবাদের মূলে আছে জড়বাদ। জীবনেব মধ্যে কবি জড় ও চেতনের যত খেলা দেখেছেন সেখানে চেতন কোথাও সত্যরূপে প্রাধান্যলাভ করতে পারে নি। জড়ের মধ্যে সে ধীরে ধীরে আত্মবিলীন করেছে। তাই মহাজড় অন্ধ, বধির। তার অন্ধত্বেব অভিশাপে মানুষের দহন ও দুঃখ। চেতনাব অভাব বশতঃই সৃষ্টির সর্বত্র বিশৃঙ্খলা—

'জগতের শৃঙ্খলা
স্বপ্নের মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা'

ভাববাদী কবিরা মানুষ বা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেমের কথা বলেন তাকে যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছেন—

'বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'

এইভাবে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় দুঃখবাদের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জগৎ সৃষ্টিতে অসঙ্গতি, জড়বাদের অন্ধত্ব, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গোঁজামিল মানুষের জীবনে দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের দর্শন ধর্ম এই দুঃখকে গোপন করার জন্য তীক্ষ্ণ যুক্তিতে নিবৃত্ত করার জন্য ঈশ্বরের লীলাবাদ প্রচার করে অহেতুক আনন্দবাদের ভণিতা দিয়ে সত্যকে গোপন করে চলেছেন।

এই ছলনাকেই কবির বিদ্রূপ, যারা আমাদের বুঝিয়েছেন—

'দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাহর করিয়া দেখ-সুখ অভিজ্ঞতায় সূক্ষ্ম'

তাদের প্রতি কবির নিবেদন —

'চোখ বুঁজে যারে আনন্দ ব'লে আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা?'

এরকম দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন ধর্ম হল মানুষের দুর্বলতা কেননা জীবনের চরম পরাজয় বা প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা ন্যুব্জ দেহ মানুষ আত্মসমর্পণের ইচ্ছাতেই ধার্মিক হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পণের অর্থ দায়িত্ব অস্বীকার, আর এই দুর্বলতার হীনতাকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রেমের আবির্ভাব। মানুষের সত্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে তার ভগ্নকণ্ঠস্বরের দ্বারা যে ধর্মসঙ্গীতের সৃষ্টি সেই সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের শাণিত বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। 'মরুশিখা'র 'কাণ্ডারী' কবিতায় কবি ঈশ্বরকে শৌখিন জীবন তরীর চিরকাণ্ডারী বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং দুঃখবাদী আত্মজীবনকে গোশকটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম ভূমিতে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে ভগবৎ গীতা শুনিয়েছিলেন—কবি তাঁর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বদলে জীবনমরুক্ষেত্রকে উল্লেখ করেছেন। এই মরুক্ষেত্রে তিনিও দুর্ভাগবৎগীতা প্রচার করেছেন।

কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথ কি যথার্থই নাস্তিক? তাঁর দুঃখবাদ অবিশ্বাস না অভিমান? হয়ত যতীন্দ্রনাথ নিজেও সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু দুঃখের মূলে যে অন্ধজড়ের কথা বলেছেন তিনি, দুঃখের কেন্দ্রে আবার সেই কবি নীলকণ্ঠ শিবকে স্থাপন করেছেন। দুঃখবাদী নাস্তিকমাত্র হলে কবি 'বহ্নিস্তুতি' করতেন না। কবি বারবার তাঁর চির আরাধ্য দেবতা শ্মশানবাসী বিভূতিভূষণ শংকরের কথা বলেছেন। কবি একথাও মনে করেছেন দুঃখের বহ্নিজ্বালায় সফলতার আবির্ভাব ঘটে। সফলতার আলয়ে যেখান থেকেই বিশ্বজীবন ও জগতের যাবতীয় প্রাণীর আগম তা এই বাঁচার যেখানে শেষ সেখানে নিখিল

শূন্য জুড়ে থাকবে রুদ্রদেবতার অন্তহীন দুঃসহ বহ্নিজ্বালায়। এই কারণে 'মরুশিখা'কাব্য শুরু হয়েছে দুঃখের দেবতা শিবের স্তোত্র দিয়ে। শিবকে তিনি সুন্দর মঙ্গলময় দেখেননি—অবিমিশ্র দুঃখের দেবতা হিসেবেই দেখেছেন এবং নিষ্ফল পৃথিবীর দুঃখই তাঁকে নীলকণ্ঠ, চিতাবিভূতিপ্রলিপ্ত করেছে। শিবের কাছে অশ্রু ক্রন্দন গঙ্গাবাহী জটাজুটো, মরণের স্মৃতি তাঁর হাড়ের মালা। দুঃখের অসহনীয়তাতেই তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধ পণ্যবিক্রেতারূপে আবির্ভূত হন—

'কাঁদিয়া কহিল বুড়া— 'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা, মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও!

সুতরাং নঞর্থক ভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় যা দুঃখবাদ বা ধর্মবিরোধিতা বা অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদী, অস্ত্যর্থকভাবে তাই হল তাঁর বলিষ্ঠ মানবিকতা। মানুষের উপর যতীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সেই শ্রদ্ধার আনুষঙ্গিক ভাবে দেখা গিয়েছে মানুষের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। স্বর্গের দেবতাকে তিনি যদি তাঁর কাব্যে অস্বীকার করে থাকেন তবে তা মর্তের মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্যই। বিধাতা যদি কেউ থাকেন তাকে দুঃখের মধ্য দিয়ে বরণ করা যায়—কিন্তু দুঃখের তত্ত্বের দ্বারা মনুষ্যত্বের অসম্মান তার কাছে অসহ্য। যথার্থ অর্থে কবি নাস্তিবাদি ছিলেন না বলেই শেষপর্যন্ত তাঁর কাব্যে দুঃখবাদ ফিকে হয়ে গেছে। দেবতাকে তিনি মানুষের দুঃখের সংগ্রামের সঙ্গী করে তুলেছেন। শিবকে তিনি বলেছেন—

'সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।'

'ত্রিযামা'-র পঞ্চরতি কবিতায় শিবকে তিনি বিশ্বদেবতারূপে দেখেছেন। কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম পুরুষ নন—তিনি বিশ্বজীবনেরই পরিপূর্ণ মূর্তি। কন্যাকুমারী এই বিশ্বজীবনরূপধ্যানে নিরতা, সিংহলের টীকা কপালে পরে লবণ সমুদ্র এই মহারুদ্র দেবতার জপে মগ্ন। প্রবালের দ্বীপে ঝলমল করে এই বিশ্বদেবতারই হাড়ের মালা। সুতরাং যে মহাদেব ছিলেন দুঃখবাদের প্রতীক তিনি হয়েছেন জীবনমহাদেব। ঠিক এই কারণেই যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের কবি কিন্তু নাস্তিবাদী নন, তিনি দুঃখের অস্তিরূপকে স্বীকার করেছেন—কখনোই নাস্তিরূপকে নয়।

বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলা কাব্যের সৌরমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র গ্রহাধিপতি, অন্যান্য কবিরা তখন 'দিনের আলোর গভীরে'। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপের নৈরাশ্য, অবক্ষয়, সভ্যতার গ্লানি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাম্রাজ্য শক্তির হিংস্রতায় মানুষের মোহভঙ্গ, পুরাতন মূল্যবোধগুলির শিথিলতা, নৈতিক চরিত্রের প্রবল অবনতি, আস্তিক্যবোধের পরাজয়—এই ভাবচিন্তাগুলি বাংলাসাহিত্যে সংক্রামিত হয়। এই সময় থেকে রোমান্টিক কাব্যধর্ম, আস্তিক্যবাদ, প্রথাগত সাহিত্যসাধনা, পুরাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এইগুলি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ সংশয়বাদী বুদ্ধিজীবীর চিত্তবিক্ষোভ চলছিল। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনা, অতিন্দ্রীয় সৌন্দর্যপ্রীতি, বিশ্বজনীন মানবতা,

মহাপুণ্য মহাক্ষেমে'র আদর্শ, ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃতির মধ্যে আলোক সামান্য চেতনা ও সৌন্দর্য আবিষ্কার সব মিলিয়ে বাস্তব জীবন ও জগতের সঙ্গে যেন একটা প্রকাণ্ড বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছিল। এই অবিশ্বাস, সংশয়, দুঃখবেদনা, দুর্ভাগ্যপীড়িত হতাশা ও বর্তমানের অস্থির চাঞ্চল্য যাদের কণ্ঠে উচ্চবাক্ কাব্যরূপ লাভ করেছে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল তাঁদেরই পথিকৃৎ।

সুতরাং এক হিসাবে যতীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রবিরোধীযুগের সূচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মুগ্ধদৃষ্টি যতীন্দ্রনাথের ছিল না। কবিতার বিশুদ্ধ প্রেবণায় তিনি বীণাপাণির প্রসাদ উপেক্ষা করেননি। তাঁর সাহিত্যে আবির্ভাবকাল মহাযুদ্ধের হিংসাত্মকতায় চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ তখন সৌন্দর্যময় বিশ্বভুবনের মন্দিরে বিশ্বদেবতার চরণে কাব্যে 'নৈবেদ্য' 'গীতাঞ্জলি' নিবেদন করছেন। জগতের আনন্দ যজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণলিপি প্রশস্তি সংবাদ সঙ্গীতে কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ নানা কারণে বিক্ষুব্ধ, জনসাধারণের অসহায়তা চূড়ান্ত পর্যায়ে, সুখ-সুবিধা নেই বললেই হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি শাসক সম্প্রদায়ের পেষণযন্ত্র অবিশ্বাস্য রকমের সক্রিয়। এই নিদারুণ মারণযজ্ঞের মুখে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন সুন্দরের মঙ্গললাভে জীবনের পরমপূর্ণতাব সাধনা করছেন তখন অনুজ যতীন্দ্রনাথের চোখে পৃথিবীর রুক্ষতা দাউদাউ করে জ্বলছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিলাস ও বাষ্পকুল স্বপ্নময় জগতের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য যতীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। তাই কাব্যসূচনাতেই যতীন্দ্রনাথ কবিশ্রেষ্ঠের এই অসঙ্গতিব প্রতি আমাদের দৃষ্টির দাবী জানালেন। সমাজ ও সাহিত্যের অস্থিরতার এবং প্রচলিত আদর্শের প্রতি তিনি বিদ্রূপ করলেন—আচরণ ও বিশ্বাসে, কথা ও কর্তব্যে, প্রত্যক্ষ ও ধ্যানের অসঙ্গতির দিকে বারবার তিনি মনোযোগ দিতে চাইলেন। তাঁর মনে হল আমাদের শিল্পচেতনা সাহিত্যিক বুদ্ধি ধর্মবিশ্বাস আধ্যাত্মিক চৈতন্য সবই যেন প্রচণ্ড ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই বিদ্রূপের খোঁচায় বাঙালীর সনাতন বিশ্বস্ত মোহগ্রস্ত চেতনাকে তিনি ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইলেন। রবীন্দ্রকাব্যে ভিত্তিহীন আনন্দবাদের মধ্যে তিনি তাঁর কবিতায় দুঃখবাদকে প্রতিষ্ঠিত কবলেন, জীবনের সর্বাত্মক দুঃখবেদনার মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন বিষকণ্ঠ শিবকে তাঁর দেবতারূপে। বিশ্বের মলিনরূপকে ফুটিয়ে তুলে তিনি সকলের কাছে প্রশ্ন করেছেন সৃষ্টিকর্তার এই নির্মম পেষণের কারণ কি? এজন্যই যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ, অতৃপ্তি ও অন্তর্দাহ, অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের যুগ প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে এই ধাবাতেই তাঁর আগমন।

জীবন সম্পর্কে, প্রচলিত কাব্যধর্ম সম্পর্কে এবং প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর সম্পর্কে তিক্ততা, ক্রোধ, কটাক্ষ তাঁর কবিত্বেব মূল প্রেরণা। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় কাব্যিক সৌন্দর্যবোধ রসচেতনাকে অতিক্রম করে এ ধরনের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, গভীর আত্মিক প্রত্যয়, প্রগাঢ় আস্তিকাবুদ্ধি এবং সত্য-শিব এবং সুন্দর সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচিত্তের গভীরে নিহিত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব বিশ্বাসের জগতে অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু তরুণ কবিবা যুগযন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের কাছে বিশ্বাসের জগতে ভিত্তি স্খলিত, তাঁরা পুবাতন মূল্যবোধে মুদ্রাচিহ্ন ললাটে অঙ্কিত কবতে অস্বীকার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সমাজের অস্পৃশ্য-শূদ্র-মেথর নিয়ে কাব্যরচনা করলেন

এবং তাঁর কবিতায় ধর্মঘট শ্রমিক বিক্ষোভ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবেশ করল। প্রমথ চৌধুরী প্রকৃতি প্রেম সম্পর্কে ভাবাবেগ বর্জিত মননশীল সূক্ষ্ম antiromantic দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন। মোহিতলাল এক অরুক্ষ কাপালিক তথা সম্ভোগ সর্বস্ব জীবনের উল্লাস ঘোষণা করলেন। নজরুলের উত্তেজিত পদাঘাতে নিশ্চিন্ত বিলাসী কাব্যের প্রাচীর ভেঙে পড়ল। কিন্তু সবকিছুরই কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাময়িকতাই শুধু নয় শেষপর্যন্ত দুঃখবাদও নয়—মানবতার বন্দনাই তার কাছে বড়। পৃথিবীতে জড়ের মধ্যেও যে একটা ক্রন্দন ধ্বনি আছে তিনি তাকে উদ্ভাবন করলেন। জড় ও সমাজেব উৎপীড়িতদের হয়ে যতীন্দ্রনাথ ভগবানকে বিদ্রূপ করলেন। সেই সঙ্গে শোষণ ও শোষকেব বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গময় বাক্যবাণ বর্ষিত করেছেন। নজরুল এই অসন্তোষকে বহ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বলিত করলেন। ক্রমশ তাঁর কবিতায় সাম্যবাদের আদর্শ ঘোষণা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আস্তিক্যচেতনায় অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিতান্ত্রিকের অসহিষ্ণু বিদ্রোহ ভগবানেব বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেবার ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। মোহিতলাল বৈরাগ্যপরায়ণ। রবীন্দ্র কবিদৃষ্টির পাশে শাক্ত জীবনাদর্শের জয় ঘোষণা করলেন। এইভাবে রবীন্দ্রকাব্যগ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েও যতীন্দ্রনাথের আধুনিক বিদ্রোহী তথা বিপ্লবী কবিপ্রতিভার উপগ্রহগুলি নিরাপদ দূরত্বে রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করেছে।

বাঙলা কাব্যজগতে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক সন্ধিক্ষণে। শতাব্দীব তৃতীয় দশকে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণ প্রবাহের জোয়ার আসে। সেই ধারায় একক হিসেবে কেউ চিহ্নিত হতে পারেন না। গোষ্ঠী হিসেবেই এঁদের পরিচয়। কল্লোল, কালিকমল, সংহতি, গণবাণী, লাঙ্গল প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীর লেখকবা 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখক বলে চিহ্নিত হলেন। ধর্মনীতি ও প্রেম সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকলনের প্রভাব দেখা দিল। সাহিত্যের উপকরণে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় জনতাব প্রতি মনোনিবেশ, জীবন সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব, সংশয়, মানবিকতা ও আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা এই পর্বের লেখকদের যুগগত বৈশিষ্ট্য। তার পিছনে সময়ের প্রভাব এই রকম ঃ ১৯১৭ তে রুশবিপ্লব, মার্কসের সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকের নেতিচেতনার জন্ম দিল, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৯২১-এ কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা, ১৯১২ বঙ্গভঙ্গ রহিত, ১৯১৪-এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯২০ তে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গণমানসে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে আধুনিক দ্বন্দ্ববাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটল। সাহিত্যেও রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বদলে গেল। মনুষ্যত্বের নিপীড়নে ক্ষুব্ধ যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। জীবনের প্রাত্যহিক ক্ষতবিক্ষত রূপকে তিনি কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ ও কবিদৃষ্টি এতই নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে তাঁর অনুকরণকারীরূপেও পরবর্তীকালে কাউকে দেখা যায়নি। কাব্যের বহুপ্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও নিপুণ যুক্তিবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। ঈশ্বরের যে মঙ্গলময়তার ওপর কবির উপজীব্য বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠিত বলে স্বীকৃত, তাকে তিনি 'ছদ্ম-অন্তরঙ্গতা' বলে অভিহিত করেছেন। জীবনের আনন্দ-পরিহাস, প্রকৃতির সৌন্দর্য-বিলাস, হৃদয়ের কোমলবৃত্তি—এককথায়

মানবজীবনের কাম্য বিষয়সমূহে অনাস্থা যতীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যতম উপজীব্য। তাঁর প্রথম জীবনের তিনখানি কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), ও মরুমায়া'র (১৯৩০) মধ্য দিয়ে নাস্তিকতার ও দুঃখবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর মরীচিকা কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়—

'ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল?
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় নাকো, একথা পাগলে বলে'।

সংশয়, ব্যঙ্গ নেতিবাচক আধুনিক কাব্যের এ লক্ষণগুলি যতীন্দ্রনাথেই প্রথম দেখা যায়। বিধাতা থেকে শখের সাম্যবাদী পর্যন্ত কেউই এ ব্যঙ্গের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। কবির জীবিকা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জীবনদর্শনও বস্তুবাদী ছিল বলে তাঁর কবিতার মধ্যে যন্ত্রসভ্যতার লৌহকঠিন রূপটির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। যেমন 'লোহার ব্যথা', 'রেলঘুম' ইত্যাদি কবিতায় হাতুড়ি, ছেনি, হাপর সমন্বিত কামারশালার কর্মমুখর চিত্র তাঁর কাব্যে বারবার দেখা গেছে। শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর বার্তা পেলাম এভাবে ঃ

'দেখগো হেথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।'

অথবা

'দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?'

রোমান্টিক কবিদের প্রতি যতীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করেছেন। ভাববাদী কবিদের কল্পনালক্ষ্মীর বিরুদ্ধে কবির ব্যঙ্গ—

'কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস;
সেই উপবন, মলয়পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশী বিরহের ফাঁসি হাসা কাঁদা গলাগলি।'

যতীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই আমাদের আচরিত লৌকিক ধর্মকে মানুষের দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা নিজের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই মানসিক দুর্বলতার জন্ম। সেই মানসিক বৈকল্যের পথ ধরেই ধর্মের মহিমান্বিত উত্তরণ। মানুষের স্বাভাবিকতার কণ্ঠরোধ করেই ধর্মসঙ্গীতের উদ্ভব। সেই ধর্মসঙ্গীত সম্পর্কে শাণিত বিদ্রূপ যা অন্যপূর্বা কাব্যগ্রন্থের 'শিবের গাজন' কবিতায় ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করবার কৌশলটি এককথায় অতুলনীয়—

'জড়জীব তার চড়কে ঘুরিয়া
হ'ল 'বেভুল';
তথাপি পড়েনা পাগল শিবের
মাথার ফুল!
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে বল
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন

না পেয়ে কূল,
দিন যায়, কেন পড়ে না
শিবের মাথার ফুল।'

যতীন্দ্রনাথই প্রথম দেখালেন দৈনন্দিন জীবনের সাদামাটা গদ্যগন্ধী তুচ্ছতাও কাব্যের বিষয় হতে পারে। যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের অন্ধ এবং অক্ষম অনুকারীদের বিরুদ্ধে দেখা গেছে। সেই উদ্বাহু বামন কবিদের হাতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রসিদ্ধিগুলি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, বাক্যমধ্যে উদাহরণগুলি কোন নতুন প্রত্যয় নিয়ে দেখা দেয়নি। এই পর্বে যতীন্দ্রনাথের উদাহরণগুলি তুলনাহীন—

বিস্বাদ জীবন সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের উপমাটি স্মরণীয়—

'শ্লথ ছিপি বোতলের সোডা জল সম
বিস্বাদ জীবন মম ঢেলে ফেলে দাও।'

সন্ধ্যার আকাশের বর্ণনা করতে গিয়ে বারবিলাসিনীর তুলনা—

'বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা
রাঙা সন্ধ্যায় বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা'।

যতীন্দ্রনাথের আঙ্গিক ও চিত্রকল্প একেবারেই অভিনব। চিত্রকল্পগুলি এমনভাবে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে সেগুলি তাঁর রচনা না আধুনিক কবির রচনা বলা কঠিন। যেমন জীবনের রন্ধ্রহীন শূন্যতা প্রসঙ্গে প্রচলিত পংক্তিটি—

'চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?'

বস্তুতপক্ষে সমসাময়িক বাঙলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে রূপের দিক থেকে বেশি, ভাবের দিক থেকে কম। তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিল অনুপ্রেরণা বা অনুসরণ নয়, নিজস্বতা। তাই তাঁকে দ্বৈতমনোধর্মী কবি বললেও অত্যুক্তি হয়না। তাঁর প্রথম জীবনের তিনখানি কাব্যগ্রন্থ-এর মধ্যেই এই মনোধর্ম ও কবিধর্ম উভয় মনোভাবই স্পষ্ট।

সাধারণত যে সমস্ত কবি কাব্যমধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বা হাস্য-পরিহাসের পরীক্ষা করেন তাঁদের মধ্যে উচ্চতর কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যানুরাগের অপ্রতুলতা দেখা যায়। ইংরেজী সাহিত্যে ড্রাইডেন, পোপ ও বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অন্যতম কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যকলায় হাস্য-পরিহাস অনেক সময় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই সাধারণ কাব্যনিয়মের ব্যতিক্রম। শ্লেষাত্মক মন্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা সন্নিবেশেও তিনি এমন অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য পিপাসী মনের পরিচয় দেন যে তাঁব কাব্যকৃতি আধুনিক সাংকেতিকতাময় কাব্য বলে মনে হয়।

'আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু মদিরায়,
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়'-

ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে যেস্তরের কল্পনারাগ প্রকাশিত হয় তা অতি উচ্চাঙ্গের। এ সমস্তই প্রমাণ করে যে, যে কোন কারণেই হোক্, বিদ্রোহের উগ্র নেশায়, প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার উৎসাহে অথবা নিজ বিদ্রূপ দক্ষতা প্রকাশের তীব্র প্রেরণায় অথবা কোন

নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবে যতীন্দ্রনাথের সহজাত সৌন্দর্যানুরাগ ও আদর্শপ্রীতি দুঃখবাদের জ্বালাময় বিরাগে পরিণত হয়। কিন্তু এই মরুভূমির মধ্যেও তিনি অনেক সময় শ্যামলিমার স্বপ্ন দেখতেন তার ইঙ্গিত একেবারে অপ্রাপ্য নয়। জীবনে অনুভূতির ধর্মকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন সত্য কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে এমন একটা আবেগের আতিশয্য আছে যাতে কবির অন্তরের আভাস মেলে। অনুরাগ অভিমানের মধ্যস্থতায় বিরাগে রূপান্তরিত না হলে প্রতিবাদের ভাষা এত তীক্ষ্ণ ও তীব্র হতে পারে না।

প্রথম পর্বের রচনায় যা অস্ফুট ছিল দ্বিতীয় পর্বে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। সায়ম্ (১৯৪০) ত্রিযামা (১৯৪৮) ও নিশান্তিকা (১৯৫৭)-য় যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এমন বিপরীতমুখে রূপান্তরিত হয়েছে যা অন্তরঙ্গতা ও আগ্রহের চূড়ান্ত নিদর্শন।

'বকুলতলীর ঘাট', 'মনোরমা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শপথভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় কবির যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা একান্ত রোমান্টিকধর্মী ও রূপবিহ্বল। আবার 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন ফুটে উঠেছে এককথায় অনবদ্য—

> 'মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
> বুকের পাটায় ঘ'সে ঘ'সে
> উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন
> তাতেই হ'ল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
> তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে
> ফুটে উঠেছে যে ফুল,
> তাতেই রচিত হল তোমার মাল্য
> করজোড়ে নতশিরে প্রণাম ক'রে বললাম
> বিদায়; বন্ধু; বিদায়।'

জীবন সম্পর্কে, প্রচলিত কাব্যধর্ম সম্পর্কে এবং প্রেম প্রকৃতি ও ঈশ্বর সম্পর্কে তিক্ততা, ক্রোধ অথবা কটাক্ষ ব্যঙ্গ যতীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল প্রেরণা। তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় কাব্যের সৌন্দর্য্যবোধ ও রসচেতনাকে অতিক্রম করে এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক বোধ ও বিশ্বমানবতা সমসাময়িক কবিদের আকৃষ্ট করেছিল ঠিকই কিন্তু তরুন কবিরা যুগোচিত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন। তাদের কাছে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় নয়, তারা পুরনো মূল্যবোধে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের শূদ্র, মেথর নিয়ে কাব্য রচনা করলেও তিনি ব্যতিক্রমী কবি হিসেবে পরিচিত না হয়ে 'ছন্দের যাদুকর' নামেই পরিচিত হলেন। প্রমথ চৌধুরী প্রকৃতি ও প্রেম সম্পর্কে মননশীল সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন। মোহিতলাল মজুমদার দেহবাদ বা ভোগবাদের কথা ঘোষণা করলেন। নজরুলের উন্মত্ত আত্মহারা-প্রচণ্ড ভাবাবেগের কাব্যে তাৎক্ষণিক স্বদেশীয়ানার পরিচয় থাকলেও কাব্যপ্রতিভা সবক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ হয়নি। যতীন্দ্রনাথই সেই সময়কার কবি যিনি এক সঙ্গে শোষণ ও শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গময় বাক্যবাণ বর্ষণ করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ থেকে পৃথক হয়েও যতীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা কাব্যের জগতে বিদ্রোহী তথা বিপ্লবী কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্বীক্ষা

মালিনী : মানবিকতার ট্রাজেডি

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নয়। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রক্তাক্ত কঠিন রূপকে তিনি নাটকে ফোটাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। এবং কবিজীবনের বিশ্বাস ও বাণীকেই তিনি সাহিত্যের একাধিক শাখায় বা form-এ প্রকাশ করেছেন। সেজন্য কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প, কি নাটক সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তারই রূপান্তরিত আত্মপ্রকাশ। নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সাংকেতিকতা ও তত্ত্বগ্রাহিতাকে আশ্রয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকগুলিতে যথা—প্রকৃতির প্রতিশোধ, মালিনী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, রাজা ও রাণী প্রভৃতিতে সমকালীন জীবনাদর্শের একটি বিশেষ তত্ত্ব নাট্যরূপ ধারণ করেছে মাত্র। কবি আচরিত একটি বিশ্বাস বা idea কে ফোটাবার জন্য সেই কাহিনী গ্রহণ করেন এবং তাকে ইচ্ছামত পরিবর্জিত বা পরিবর্ধিত করেন। 'মালিনী' সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

'মালিনী' নাটকটি (১৩০৩) সোনার তরী, চৈতালি যুগের রচনা। রবীন্দ্রনাথ চারটি দৃশ্যে বিভক্ত ৯৫৯ ছত্রের সমিল প্রবহমান পয়ারে নাটকটি রচনা করেন। রচনাবলী সংস্করণে মালিনীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।....... তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়।' এই স্বপ্নবৃত্তান্ত মালিনী নাটকের পরিণাম দৃশ্যে ব্যবহৃত। মালিনী নাটকের কাহিনীর একাধিক উৎস আছে। 'কিন্তু মূল কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন বৌদ্ধ সাহিত্য মহাবস্তাবদানের অন্তর্গত 'মালিন্যবস্তু' থেকে। অবশ্য মূল মহাবস্তাবদান রবীন্দ্রনাথের পড়া ছিল না—.....তিনি কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থের অন্তর্গত Mahavastu-Avadana-এব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত সংক্ষিপ্তসার 'The Story of Malini' [P. 121] থেকে'।

মহাবস্তাবদানের মূল কাহিনীর সঙ্গে 'মালিনী' নাটিকার প্রথম ভাগের সামান্য ঘটনাগত সাদৃশ্য এবং কাশ্যপ, কাশীরাজ, মালিনী ইত্যাদি চরিত্রগত নামসাদৃশ্য আছে। স্বপ্নলব্ধ ঘটনাটিকে মালিনীর শেষ দৃশ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীকে প্রথম ভাগে রাখা হয়েছে। মধ্যবর্তী অংশ কবির স্বকপোলকল্পিত। এই সমগ্র অংশকে যোগ করেছে নাট্যকারের সমকালীন ধর্মচেতনা, যাকে idea বলা হয়েছে। 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনীকে মূল কাহিনীর সহিত মিশাইয়া তাঁহার বিভিন্ন ধর্মাদর্শের ছাঁচে ফেলিয়া কবি এই অনবদ্য নাটিকাটি নির্মাণ করিয়াছেন।'

নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্রাহ্মণগণ মূল কাহিনীর আভাস দেয়। চারুদত্ত সোমাচার্য

প্রভৃতি প্রতিপক্ষদের বশীভূত করার ঘটনা মূল কাহিনীর অংশ। দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশে ক্ষেমংকরের উক্তি পরবর্তী কবি সৃষ্ট কাহিনীর বীজ—

'আবার ফিরিয়া পাবে
বন্ধুরে তোমার। শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড়ো দুঃসময়—
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুব বন্ধচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী।'

সুতরাং এই উক্তির সাহায্যে সূক্ষ্ম ও চতুরভাবে মূল কাহিনী ও স্বপ্নলব্ধ কাহিনীকে যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যটি নাটকের দুটি কাহিনীর মধ্যে একটি জোড়াতালি। এই দৃশ্যে 'লোকলক্ষ্মীমাতা', 'পুণ্যবতী প্রাসাদ লক্ষ্মী' মালিনী মোটামুটি বৌদ্ধ কাহিনীরই চরিত্র। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে স্বপ্নের ঘটনাটিকে প্রাধান্য দানের জন্য এই দৃশ্যের শেষাংশে মালিনীর শ্রান্তি ক্লান্তি দেখিয়ে পরবর্তী মানবীরূপের জন্য প্রস্তুত করানো হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যের শেষাংশে মালিনীর জননীর উক্তি একটি dramatic irony। চতুর্থ দৃশ্যে সুপ্রিয় মালিনীর একান্ত সংলাপ, পারস্পরিক হৃদয়ঘনিষ্ঠতা, বন্দী ক্ষেমংকরকে নিয়ে রাজার প্রবেশ, ক্ষেমংকর কর্তৃক সুপ্রিয় হত্যা এবং মূর্ছার পূর্বে মালিনীর উক্তি—'ক্ষম ক্ষেমংকরে'। সমালোচক তাই বলেছেন—

'প্রকৃতির প্রতিশোধ ও মালিনী নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে মানব ধর্ম লৌকিক শাস্ত্রীয়ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'

এই নাট্যকাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাবপ্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে প্রথমত এই কাহিনী অতিক্রম কবে সমগ্র নাটকে একটি মানবমুখী সেবা, ক্ষমা, প্রেম, মৈত্রীর আদর্শ প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্র, আচার, যাগযজ্ঞ রক্ষণশীল প্রাচীন ধর্ম এবং মানববাদী জীবন্ত হৃদয়েব সত্যধর্ম এ নাটকে একটি বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। সেই দ্বন্দ্বে রক্ষণশীল ধর্মের প্রতি নাট্যকাবেব সচেতন অনীহা এবং প্রগতিশীল মানবধর্মের প্রতি তাব আকর্ষণ বা অনুবাগ অভিব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত. বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে খণ্ডধর্ম ও নিত্যধর্মের বিরোধ দেখান হযেছে। চতুর্থত, মালিনী ও কখনও কখনও সুপ্রিয়ের উক্তির মধ্যে দিয়ে ববীন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট মানবহৃদয়বাদী সত্যধর্মের প্রচার করেছেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিতা ও বচনার সঙ্গে ভাষাগত যোগ দেখা যায়। যেমন—

১ জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে
তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
২. আমারে ছাড়িয়া দে মা বিনা দুঃখশোকে
তু হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
৩ জন্ম লভিয়াছি বাজকুলে তোমাদের সাথে
তু. এবাব ফিরাও মোরে।

মালিনী রচনার পব ইংরাজীতে এব অনুবাদ পাঠ করে গ্রীক সাহিত্যের রসিক ইংরাজ সমালোচক ট্রেভেলিয়ন এই নাটকে গ্রীক নাট্যকলার আঙ্গিকগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। উত্তরকালে একথা স্মরণ করে মালিনীব ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে শেক্সপীরীয় নাট্যকলার সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকাব করেন। সেক্সপীরীয় নাট্যরীতি সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ

বলেছেন—'তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাত প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।' কিন্তু শেক্সপীরীয় রীতি মালিনীতে প্রত্যক্ষভাবে নেই। এখানে অঙ্ক দৃশ্যবিভাগ নেই, কাহিনীর উপধারা, চরিত্রবৈপরীত্য, বিভিন্ন রসের মিশ্রণ নেই।

রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীরীয় নাটকের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য ও ঘাত-প্রতিঘাতের তুলনায় বলেছেন যে 'মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' এই মন্তব্য গ্রীক নাটকের Unity of time, space and action এর অনুরূপ। গ্রীক নাট্যকলার আদর্শ হয়তো অজ্ঞাতসারে মালিনী নাটকের আঙ্গিক সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। গ্রীক ট্রাজেডি সম্পর্কে Aristotle 'one action, a complete whole' কথাটি ব্যবহার করেছেন। সময় ঐক্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'tragedy endeavours to keep as far as possible within a single circuit of the sun.' অর্থাৎ ট্রাজেডি একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে। মালিনী নাটকেও ঘটনাগুলির স্থান ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত নয়। সময়ের ঐক্যও যতদূর সম্ভব ব্যাহত হয়নি। ঘটনার দিক থেকে ঐক্য আরও ঘনীভূত। ঘটনাগত এই পরিমিতি ও সংহতির জন্য নাটকের মধ্যে একটি ঘনবন্ধন আছে।

পদ্যছন্দে আদ্যন্ত রচিত বলে এতে গ্রীক নাটকের অবিমিশ্র ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি এসে পড়েছে।

গ্রীক নাটকে অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তির ভাবটা বেশি, মালিনীর সুদীর্ঘ উক্তিগুলি এইরূপ আবৃত্তি প্রধান।

কোরাসের মধ্যে দিয়ে গ্রীক নাটকের নেপথ্যঘটনা বিবৃত হয়। পরোক্ষভাষণের মধ্যে প্রত্যক্ষের প্রতীতি উদ্বোধন করার কৌশলটি গ্রীকনাট্যকারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুপ্রিয়ের দীর্ঘ উক্তি থেকে ক্ষেমংকর চরিত্র ও তার আচার-আচবণ সম্পর্কে অনুরূপ প্রতীতি জন্মায়।

এস্কাইলাস সফোক্লেসের নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য ত্রিচবিত্র প্রধান। মালিনীতেও তিনটি চরিত্রেব প্রাধান্য।

Conflict betwen good and better— ভাল ও মহত্তর এই উভয়েব দ্বন্দ্বে সুপ্রিয়ের অন্তর্ঘাতবেদনা, তার বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম ও সত্যের আকর্ষণে আত্মউদ্ঘাটন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, বন্ধুর হাতে আকস্মিক মৃত্যু—এই শোচনীয় পরিণাম গ্রীক নাটকের অদৃষ্টবাদের কথাই স্মরণ করায়।

তথাপি 'মালিনী'তে শেষ পর্যন্ত শেক্সপীরীয নাটকের মত চরিত্রগত প্রাধান্য বর্তমান। এবং চরিত্রেব ভাষা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে তার পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিধর্ম চরিত্রগুলিকে আক্রমণ করেছে। ফলে সেগুলি সূক্ষ্ম, জটিল, অন্তর্মুখী হয়েছে। গ্রীক নাটকের ঋজুতা, স্পষ্টতা, সরলতা সুপ্রিয় বা মালিনী কারও মধ্যে নেই অথচ এরাই প্রধান চরিত্র। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাই বলেছেন—

> '....দু'চারটি টেকনিক্যাল সাদৃশ্য ছাড়া গভীরতর কোনো সাদৃশ্য মালিনী ও গ্রীক নাট্যের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।'

তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত ভাবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেই গ্রীক নাটক রচিত হয়। কিন্তু মালিনীতে কবির রোমান্টিক ধর্মচেতনা, নবপ্রবুদ্ধ মানরিকতাবাদ, প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদর্শকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সমালোচক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> '.. ..ধর্মের আদর্শ তাহাদেব জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে... . তাহারই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু।'

আবেগ, প্রেরণা, ভাব ও চরিত্রের দিক থেকে মালিনী নাটকের সঙ্গে রোমান্টিক নাটকের স্বাধর্ম্যই বেশি করে লক্ষিত হয়। কিন্তু বহিরঙ্গ শিল্পকলার দিক থেকে অর্থাৎ দেশকালের অবিচ্ছিন্নতায় গ্রীক নাটকের সংযত সংহত আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য মালিনীতে খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়। সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মনে করেন—

'এই সমস্ত গুণসাধর্ম্যের জন্যই রবীন্দ্রনাটকের ভাবকেন্দ্র ও ঘটনাবিন্যাসের পার্থক্য সত্ত্বেও ইহার মূল আবেদন অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।'

মালিনী নাটকে সুপ্রিয়র চরিত্র সর্বাপেক্ষা জটিল। আনুষ্ঠানিক প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা, ধর্মকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে, তাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে সংসারকে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধনে বাঁধবার একটা আনন্দময় প্রেরণা ও মালিনীর মধ্যে সেই প্রাণময় প্রেমধর্মের জীবন্ত মূর্তি দেখে তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, গভীর বন্ধুপ্রীতি ও নির্ভরশীলতা এবং মানবী মালিনীর প্রতি সৌন্দর্য ও প্রেমের অতি নিগূঢ় আসক্তি—এসবের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বই তার চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত।

প্রথমেই দেখা যায় রাজকুমারীর নির্বাসনপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তার মতদ্বৈধ। প্রেম ও দয়াধর্মকে সে দোষ দিতে পারে না—

'যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্মবলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে?......'

কিন্তু যখনই তার বন্ধু ক্ষেমংকর তাকে 'পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি', 'প্রাণপ্রিয় পিতৃধর্ম' ও 'চির-আচরিত কর্ম' ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে, তখনই আবার সে ঘুরে গিয়ে বলেছে—

'...... রেখে দিব আমি,
তব বাক্য শিরে ধরি। যুক্তি সূচি পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।'

আবার যখন সে সেই দয়া ও প্রেমধর্মের বিগ্রহ-স্বরূপিণী মালিনীকে দেখল, তখন তার অভূতপূর্ব ভাবান্তর—

' মিথ্যা তব স্বর্গধাম
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল।....'

তারপর ক্ষেমংকর যখন বোঝাল যে 'আর্যধর্ম-মহাদুর্গ তীর্থ-নগরী এ পুণ্য কাশীর' উপর অন্ধকার রাত্রি নেমে আসবে, সেই বিশ্বব্যাপী দুর্যোগে প্রলয়ের রাত্রে সুপ্রিয় তাকে ছেড়ে যাবে, তখনই সুপ্রিয় উত্তব দিচ্ছে—

'কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।'

সুপ্রিয়র মধ্যে এই যে চলৎ-চিত্ততা, দোদুল্যমান মানস-ক্রিয়া, এর প্রধান কারণ তার মূল চরিত্রগত দৌর্বল্য। সে একান্তভাবে হৃদয়াবেগের অধীন। আবেগের চরম মুহূর্তে অনুভূতির মধ্যে যা ধরা দেয়, তাকেই সে একান্ত সত্য বলে মনে করে। সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

'তাহার ধর্ম হৃদয়-ধর্ম, তাহার অন্তর-প্রকৃতির ধাতু,
কবির ধাতু, আর্টিস্টের ধাতু।'

ক্ষেমংকরের সঙ্গে বন্ধুত্বও তার একটা হৃদয়াবেগের সামগ্রী, একটা অনুভূতির সত্য, তাই সে তার হৃদয়ের উপর অত আধিপত্য বিস্তার করেছে। ধর্মের আধ্যাত্মিকতার বা আনুষ্ঠানিক সাধনার দিকে তার চিত্তের কোনো প্রবণতা নেই. সে হৃদয় দিয়ে একটা আদর্শকে অনুভব করতে চায়, হৃদয়াবেগের ইন্ধন জোগাতে পারে এমন একটা অনুপ্রেরণা চায়। সমালোচক ড. সুকুমার সেন মনে করেন—

> 'সুপ্রিয় শাস্ত্রকে গ্রহণ করে হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া, ক্ষেমংকর হৃদয়কে পিষিয়া ফেলে শাস্ত্রের রথচক্রতলে। চরিত্রের এই বৈপরীত্যই তাহাদের দুইজনের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনের ভিত্তি।'

ক্ষেমংকর দেশত্যাগের পর সুপ্রিয় মালিনীর নিকট-সান্নিধ্য লাভ করলো। ভাবময়ী, সৌন্দর্যময়ী, প্রেমময়ী মালিনীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলো। আবার অন্য একটি হৃদয়বস্তুও সুপ্রিয়র ছিল—অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি। কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রেমই জয়ী হয়েছে। বন্দী ক্ষেমংকরের নিকট সে স্বীকার করেছে যে তার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের রূপ সে মালিনীর মধ্যেই দেখেছে—

> 'মোব ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্তলোকে
> ওই নারীমূর্তি ধরি।...'

এই ধর্মরূপিণী দেবীর জন্য সে প্রাণের অধিক বন্ধু-প্রণয় বিসর্জন দিয়েছে—

> 'প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়
> তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
> তুচ্ছ শতবার!'

শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার পূর্বেও সে বলেছে 'দেবী তব জয়।' সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

> '......মালিনী নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে মানব ধর্ম লৌকিক শাস্ত্রীয় ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'

ক্ষেমংকর-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিসর্জনের জয়সিংহ ও মালিনীর ক্ষেমংকরের চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার বিশেষ শক্তি প্রকাশিত। এই দুটি বিভিন্নমুখী চরিত্র সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের মধ্যে অনেকটা সত্যকার নাটকীয় বর্ণ-গন্ধ-স্বাদযুক্ত ও সার্থক ট্রাজিক চরিত্র।

বুদ্ধি ও মনস্বিতাব প্রখর দীপ্তি, স্বীয় জ্ঞান, বিশ্বাস ও মতবাদের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অসাধারণ চরিত্রবল ক্ষেমংকরের বৈশিষ্ট্য। এইরূপ আর একটি সৃষ্টি রঘুপতি। তবে রঘুপতির মধ্যে সর্বাঙ্গীণ পবিপূর্ণতা ও গৌরব নেই। কিন্তু যে ধাতুতে ক্ষেমংকর গড়া, তা একেবারে অবিমিশ্র—তার মধ্যে অসত্য নেই, মালিন্য নেই, ফাঁকি নেই। প্রয়োজনের অনুরোধের সে কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি। জীবন ও ধর্ম তাতে একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। উভয়েই সমান অচলপ্রতিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছেন—

> 'বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ক্ষেমংকরের বৈশিষ্ট্য নয়; স্ফটিককঠিন চারিত্র্য-ই তাহার প্রধান সহায়। এই স্বচ্ছস্ফটিকে নানা ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু স্ফটিকের পরিবর্তন হয় নাই; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহা সমান অনমনীয়, সমান দৃঢ়পিনদ্ধ।'

তার বন্ধু-প্রণয়েও কোন ফাঁকি নেই। জীবন, ধর্ম ও বন্ধু-প্রণয় তার কাছে একত্রে একই সত্যে বাঁধা। সুপ্রিয়র বক্তব্যের উত্তরে ক্ষেমংকর জানিয়েছে—মৃত্যুর কষ্টিপাথরেই ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণীত হয়, পরমত্যাগই ধর্মের সত্যাসত্যকে প্রমাণ করে। তাই সে বন্ধুকে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করাবার জন্য মৃত্যুবরণ করতে আহ্বান করেছে, মৃত্যুই প্রমাণ করবে কার ধর্ম সত্য—

'মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি,—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে। বন্ধুবর,
এসো তবে, কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই সেথা দোঁহে একসনে'—

এই কথায় বিন্দুমাত্র ছলনা নেই, এ তার গভীর বিশ্বাস, তার অকপট উক্তি। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন—

'এই বিচার-বিতর্কের মধ্যে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও গভীর হৃদয়ালোড়ন সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতেই ইহা কাব্যসৌন্দর্য হইতে নাট্যমহিমায় উন্নীত হইয়াছে।'

ক্ষেমংকরের আদর্শ উচ্চ, তাতে স্বার্থবুদ্ধির কোনও সংস্রব নেই, ব্যক্তিগত আত্মাভিমান তৃপ্তির বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। নবধর্মের অভ্যুদয়ে ভারতের শিরে মহাদুর্ভাগ্য নেমে আসছে, পিতৃকুল উদ্বেগ-অধীর, আজ দুর্যোগের রাত্রে সে সতর্ক প্রহরী। এই পিতৃধর্মরক্ষার মহৎ অভিযানে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে; সেজন্যই সে বিপদ-দুঃখ-মৃত্যু অক্লেশে সহ্য করতে প্রস্তুত, নিজের ব্যক্তিগত ভোগসুখের প্রশ্ন তাই গৌণ হয়ে পড়েছে।

সে কঠোরস্বভাব, দুঃখবিলাসী তপস্বী নয়—ভাবাবেগবর্জিত, হৃদয়হীন, যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানমার্গীও নয়। জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেদনে সে সচেতন, মালিনীকে দেখে সেও একদিন বিচলিত হয়েছিল, কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে সে এই ভাবাবেগকে দমন করেছে—

'আমি কি দেখিনি ওরে?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে'

বা

'তবু কি সবলে
ছিঁড়িনি মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ....'

এই সুকঠোর সংযমের দ্বারাই তার চারিত্রিক শক্তি ও সৌন্দর্য অধিকতর পরিস্ফুট। পৃথিবীর সকল আদর্শবাদী বীর বিপ্লবীদের সে সমগোত্রীয় সমান মর্যাদালাভের যোগ্য।

এই নাট্যকাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাবপ্রধান হয়ে উঠেছে। তাই —

(১) কাহিনীকে অতিক্রম করে সমগ্র নাটকে একটি মানবমুখী সেবা, ক্ষমা, প্রেম, মৈত্রীর আদর্শ প্রবাহিত।

(২) শাস্ত্র-আচার-যাগযজ্ঞ প্রভৃতি রক্ষণশীল প্রাচীন ধর্ম এবং মানববাদী হৃদয়ের সত্যধর্ম এ নাটকে একটি বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। সেই দ্বন্দ্বে রক্ষণশীল প্রাচীন ধর্মের

প্রতি নাট্যকারের সচেতন অনীহা এবং প্রগতিশীল মানবধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ বা আকর্ষণ অভিব্যক্ত।

(৩) চরিত্রের সংলাপের ভেতর দিয়ে খণ্ডধর্ম ও নিত্যধর্মের বিরোধ ফুটে উঠেছে।

(৪) নাটকে মালিনী ও কখনও কখনও সুপ্রিয়ের উক্তির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট মানবহৃদয়বাদী সত্যধর্মের প্রচার করেছেন তার সঙ্গে তাঁর সমকালীন কবিতা ও রচনার যে ভাষাগত যোগ আছে তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যের মূল কাহিনীর সংযোগ নিতান্তই আংশিক। বাকী অংশ যে সামান্য ঘটনায় নাটক হয়ে উঠেছে—তা সমস্তই কবি কর্তৃক উদ্ভাবিত।

সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের মৌলিক পরিকল্পনা। এরাই তো বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণের নেতা। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার আনুগত্য স্বীকার করলে অসহায় ক্ষেমংকর পররাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহের আশায় প্রস্থান করে—রেখে যায় বন্ধু সুপ্রিয়কে। এরপবের ঘটনা সকল পাঠকই অবগত আছেন। মালিনীকে বাদ দিলেও এ নাটকে ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় দুটি প্রধান চরিত্র এবং প্রথম অংশেব ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহের ঘটনা ছেড়ে দিলেও নাটকের উপসংহারে ক্ষেমংকর কর্তৃক সুপ্রিয়কে হত্যা নাটকের প্রধান ও চূড়ান্ত ঘটনা।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

> 'এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটি নাটকের অভিনয হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে।'

কবি-উল্লিখিত এই স্বপ্নাদ্য ঘটনাটি থেকেই শেষতম দৃশ্যটিকে আমরা পেলাম—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক বন্ধু কর্তৃক অপর বন্ধুর হত্যা। স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুসারে ঘটনাস্রোতের উজানে গেলেই সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরেব কাহিনীটিকে পাওয়া যাবে। মূল কাহিনীর সঙ্গে স্বপ্নলব্ধ ঘটনাটিকে যোগ করে দিলেই নাটকটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বাকী থাকে নাটকের অন্তর্লোকের সংবেদন। সে-সংবেদন 'মালিনী' নাটক গ্রথিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই বাষ্পরূপে কবির মনে একটা আশ্রয় খুঁজছিল। মালিনীর মূল কাহিনী কবির দৃষ্টিতে পড়ামাত্রই এই ভাব রূপ পরিগ্রহ করলো। যে ভাব হতে 'মালিনী' নাটকের রূপে গিয়ে কবি পৌঁছেছেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যায়। কবি বলেছেন—

> 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরিশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল না, সে বিগলিত হযে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ কবেছে।...... এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে মূল কাহিনী, স্বপ্নলব্ধ ঘটনা ও ভাবসংবেদন—এই তিনটিকে একত্র করলে 'মালিনী' নাটকের রূপ পাওয়া যায়—যা একান্তই কবির মৌলিক উদ্ভাবন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাই যথার্থই বলেছেন—

'মূল কাহিনীর অতি-প্রাকৃত অংশ, স্থূলত্ব এবং কাশ্যপ কর্তৃক শত্রুগণের হত্যার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্জিত হইয়া নাটকখানি স্ফটিকশিলার নির্মলতা ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে।'

'জীবনস্মৃতি' : শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ্য গ্রন্থ

ইংরেজ মনীষী স্যামুয়েল জন্‌সন্‌ মনে করতেন 'No man's life could be better written than by himself'আত্মজীবনী কোন ব্যক্তির সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ আত্মপরিচয়। কিন্তু নানা কারণে এই সত্যনিষ্ঠা বিঘ্নিত হতে পারে। কারণ অনেক সময় উত্তরকালে প্রথম জীবনের স্মৃতি স্পষ্ট থাকে না। হার্বার্ট স্পেনসার অত্যন্ত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আত্মজীবনী লিখতে বসেও তাঁর শৈশবজীবনের কথা উল্লেখ করেননি। ফরাসী ভাষায় লিখিত অসংখ্য জীবনীর লেখক আঁদ্রে মারোয়ার ভাষায় "The autobiography whether conciously or not censors what is unpleasing to him." অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মজীবনীকার অনভিপ্রেত সংবাদগুলিকে গোপন করতে পারেন অথবা সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁরা কোন প্রাক্তন ঘটনার স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যা করতে পারেন। যেমন করেছেন জর্জ সাঁদ তাঁর আত্মজীবনী Histoire de ma vie বা History of my life গ্রন্থে এবং আলফ্রেড মুসে তাঁর La Souvenir. গ্রন্থে। আঁদ্রে জিদ, স্তাঁধাল বা রুশোর মতো সত্যনিষ্ঠ অকপট আত্মবিবৃতিকার খুব কমই আছেন। কখন কখনও আত্মজীবনীকে অতিরিক্ত সাহিত্যিক মর্যাদা দেবার জন্য অনেকে জীবনের বহু ঘটনাকে বর্জন করে থাকেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আঁদ্রে মারোয়া বলেছেন "The autobiographer if he wishes to treat his story as a walk of art, finds himself compelled to eliminate many facts for aesthetic reasons." রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন —

> 'প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ
> কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের গুণ নাই,
> তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার
> যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের
> মতো তারা কবি আয়ত্বের অতীত।'

এই জন্যই জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনেব তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করেননি। আত্মজীবনী ও স্মৃতি কথা ঠিক একই জিনিস নয়। স্মৃতিকথা কেবল ব্যক্তিজীবনের বর্ণনায় বক্তার চোখে সমকালের বিবৃতি।

ডায়েরী সম্পর্কে আঁদ্রে মারোয়া বলেছেন—"A diary is a day to day autobiography." ছিন্নপত্রাবলী কিছুটা diary ধর্মী। সুইফ্‌টের জার্নাল, এমিয়েলের জার্নাল, ক্যাথারিনের ম্যানস্‌ফিল্ড, আঁদ্রে জিদ বা বদ্‌লেয়ারের ডায়েরী রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়। তবে এই ধরনের অন্তরঙ্গ প্রধান diary-র

প্রধান দোষ বৈচিত্রহীনতা। মারোয়াঁর মতে এই দোষ এমিয়েলের জার্নালেও আছে। অনেকের চিঠিপত্র "Intimate diary" মতো। যেমন বালজাকের বা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী। আবার হোরেস ওয়ালপোলের চিঠি নিতান্তই ঘটনার সংকলন। আঁদ্রে মারোয়াঁ বলেছেন "A letter may be a document, it is never a proof."

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রাবলী এইদিক থেকে বিচার করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন সৃষ্টি। জীবনস্মৃতি একপ্রকার autobiography এবং ছিন্নপত্রের মধ্যে diary ও letter দুই ভঙ্গিরই মিশ্রণ আছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য তাঁর কাব্যের মতই সৃষ্টির প্রাচুর্যে বিস্ময়কর। কবিজীবনের কৈশোর পর্ব থেকে প্রৌঢ় অধ্যায় পর্যন্ত কাব্যসৃষ্টির সমান্তরালে গদ্যরচনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর কবিসত্তার দ্বারা অভিভূত। সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায় তাঁর গদ্যরচনা তাঁর কাব্যজীবনের সারাংশ। তাঁর লেখা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের পরিমাণ তাঁর কাব্য নাটক উপন্যাসের চেয়ে কম নয়। ধর্মনীতি, সমাজতত্ব, ইতিহাস, ছন্দ, ভাষাতত্ব এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন নি। বিবিধ সৌন্দর্য ও গভীর মনস্বিতায় পূর্ণ সাহিত্যরূপে তার বিচার করতে হবে। এই সকল প্রবন্ধ ত্রান্তদর্শীকবির সৌন্দর্য দর্শনের তৃতীয় নয়ন বিশিষ্ট কবির কলমে লিখিত। সেখানেই তাদের যথার্থ মূল্য। সাধারণ তত্ত্ববেত্তা প্রাবন্ধিক পদাতিক, সে বেচারা যেন্ পায়ে হেঁটে বহু পরিশ্রমে যেখানে পৌঁছান, দৈবী কল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সেখানে একপদক্ষেপে পৌঁছে যান। দুজনের লক্ষ্য এক কিন্তু দুই পথ, একজনের পথ তথ্য ও যুক্তি, অপরের পথ কল্পনা ও সহৃদয়তা। একজন প্রাবন্ধিক, অপরজন প্রাবন্ধিক হয়েও কবি।

গদ্য ক্ষেত্রে দুটি কথা প্রচলিত—(১) রীতি (২) Style। রীতি মানে সাজানো অর্থাৎ 'Arrangements of best words in best forms.' আর Style এর মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠার অর্থাৎ 'Personal ideosyneracy of expression বা 'Style is the man himself.' এই কথা বোঝায়।

আয়ুষ্কালের দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের মাঝামাঝি বয়সে অর্থাৎ ৫০ বছরে 'জীবনস্মৃতি' লেখা হয়েছে (১৯১২)। জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনস্মৃতি মধ্যমণির মতো দুলছে। এর পূর্বের ও পরের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্পর্কে শত্রু মিত্র একমত। এই গ্রন্থে কবি সকলের মন হরণ করে নিয়েছেন। এবার দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের বিপুলতার মধ্যে জীবনস্মৃতি কোন পর্যায়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাধারণতঃ ৪টি পর্বে বিভাগ করা যায়—(১) ১৮৭৪-৭৬ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য রচনা শুরু করেন যা ১৮৮৪-৮৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এই পর্ব রবীন্দ্রনাথের আদিপর্ব বা বাল্যপাঠ। (২) ১৮৮৪-৮৫-১৯১৩ পর্যন্ত সবুজপত্রের পূর্ববর্তীকাল। (৩) সবুজপত্রের পর্ব ১৯১৪-১৯৩০। এই পর্বের বেশিরভাগ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'কালান্তর' গ্রন্থে। (৪) ১৯৩০-১৯৪১ সাল, শেষ পর্ব।

মোটামুটি ভাবে এই চারটি পর্বে এই গদ্যরীতিকে ভাগ করা যায়। তবে বিশ্লেষণী দৃষ্টি

দিয়ে এর বেশি ভাগ করাও সম্ভব। জীবনস্মৃতি লেখা হয়েছে ২য় পর্বে। এখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সমস্ত মাধুর্য এতে বর্তমান আছে, ভাষা কোথাও পল্লবিত হয়ে ভাবকে ছায়াচ্ছন্ন এবং বিষয়কে বর্ণবহুল করেনি। জীবনস্মৃতির পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রগদ্যরচনার দিকে একবার দৃকপাত করলে জীবনস্মৃতি সম্পর্কে এই কথা আরও জোর করে বলা যাবে। জীবনস্মৃতির পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রগদ্যরীতির পরিচয়ে দেখা যায়—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, চিঠিপত্র, পঞ্চভূত, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, ব্যঙ্গকৌতুক, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, রাজা ও প্রজা সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ব, ধর্ম ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পর্ব। অর্থাৎ জীবনস্মৃতির পূর্ব পর্যন্ত গদ্যরচনায় পত্রসাহিত্য, ডায়েরী জাতীয় রচনা, প্রবন্ধ, লঘুপ্রবন্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি আছে। কিন্তু রমনীয় ভঙ্গী, নিরাসক্ত দৃষ্টিটি যেন নেই। রবীন্দ্রনাথের আদিযুগের গদ্যে প্রচুর আড়ষ্টতা ছিল। কবিতার ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, গদ্যের ক্ষেত্রে তা পারেননি। গদ্যে অনেক ভেবেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, অনুশীলন করেছেন। এখানে ছায়াছন্নতা অনেক বেশি। ভারতীয় যুগের প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষ প্রভাব হতে রবীন্দ্রনাথ বিমুক্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'করুণার' উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়।

জীবনস্মৃতির ভাষারীতি বা স্টাইলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির একটি প্রধান লক্ষণ অলঙ্কার বাহুল্য। তবে এটাই সবক্ষেত্রে গুণ নয়, দোষও বটে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাময়িক প্রবন্ধাদির একটি প্রধান দোষ অলঙ্করণ বহুলতা, যেমন বিচিত্র প্রবন্ধে বা প্রাচীন সাহিত্যে। অলঙ্কার বাহুল্য তাঁর গদ্যরীতির সাধারণ লক্ষণ, তুলনায় কৈশোরের কতকগুলি রচনায় অলঙ্করণ প্রবণতা অনেকটা কম। জীবনস্মৃতি ও গোরা এই পর্বের। বোধহয় জীবনস্মৃতির চেয়েও গোরাতে অলঙ্কার ব্যবহার অল্প। তাঁর গদ্য রচনারীতির মধ্য পর্বে দেখা যায়—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদ্বয়ের অধিকাংশ গদ্যগ্রন্থ অলঙ্কার ভারে মন্থরগতি। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মধ্যপর্বে রচিত গোরা ও জীবনস্মৃতির ন্যায় গ্রন্থ বহুপরিমাণে এই দোষ হতে মুক্ত— সেইজন্যই এই পর্বের গদ্যরীতি এমন একটি ঋজুতা ও দার্ঢ্য লাভ করেছে যা অনন্যসাধারণ। জীবনস্মৃতি ও গোরার ভাষায় যে ভারসাম্যটি দেখা যায় রবীন্দ্রগদ্যের অন্যত্র তা বিরল।

রবীন্দ্র গদ্যরচনারীতির আলোচনা করলে মনে হয় যে গোরা ও জীবনস্মৃতিতে অনুসৃত গদ্য ভাষাটাই পরবর্তী গদ্য রচনারীতির পক্ষে সুফল প্রসব করেছে। কারণ লেখক এখানে সাধারণের অনুকরণযোগ্য একটি রাজপথ তৈরী করেছেন। এ তাঁর নিজের কীর্তি কিন্তু একান্তভাবে যেন নিজস্ব নয়, আবার শেষের কবিতা বা তিনসঙ্গীর ভাষা কেবল তাঁর নিজের কীর্তিমাত্র নয়, তা নিতান্তই তাঁর নিজস্ব। এ যেন গরুড়পক্ষীর অধিপতি একমাত্র বিষ্ণুরই যোগ্যবাহন, অপরে তা দেখে বিস্মিত হতে পারে, কিন্তু পিঠে চড়তে গেলেই বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কা।

গোরা ও জীবনস্মৃতির গদ্যে রচনারীতির ভারসাম্যের আর একটি কারণ, এখানে

তৎসম, তৎভব, দেশী শব্দের একটি সুষ্ঠু ও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিদ্যাসাগরের আমল থেকে বাংলা গদ্য এই সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছে— বাংলা গদ্যরীতির এই পরীক্ষা ও এই আদর্শ এখনো সম্যকভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এই আদর্শে উপনীত হয়নি সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গদ্যরীতির একটা সার্থকতা ঘটে গিয়েছে। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনে নয়, বাংলা গদ্যরীতিব বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও গোরা ও জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি একটা স্থায়ী উল্লেখ লাভ করবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের দ্বিতীয় পর্ব রবীন্দ্রগদ্যের ঐশ্বর্য পর্ব। বৌ ঠাকুরানীর হাট, চোখের বালি, রাজর্ষি, গোরা, নৌকাডুবি—এই পর্বে এই পাঁচটি উপন্যাস লেখা হয়। এখানেই উপন্যাসের সমূহ পরিণতি লাভ করে। এই যুগেব হিতবাদী পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ২য় পর্ব সবচেয়ে বেশি সুপরিণত বা matured। এখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সুকর্ষিত ও পরিণত। রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষা বঙ্কিম প্রভাবিত নয়, তা একান্তই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের ঋজুতা ববীন্দ্রনাথেব নেই, ববীন্দ্রনাথের আছে সুচিক্কণ ভঙ্গী ও কবি ধর্ম। শেষের দিকে রচনায় গোবা ও জীবনস্মৃতি একই সাথে যেন যমজ সৃষ্টি। গোরা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

অনেকের ধারণা যে, ক্রিয়াপদের দীর্ঘ ও হ্রস্বতাব উপরেই চলিত ভাষার নির্ভর। বস্তুত ক্রিয়াপদের রূপেব সঙ্গে সাধুভাষাব বা চলিত ভাষাব সম্বন্ধ সামান্যই। দীর্ঘ ক্রিয়াপদ সত্বেও ভাষা চলিত হতে পারে, উদাহরণ 'আলালের ঘরের দুলাল'। আবার ক্রিয়াপদ হ্রস্ব হওয়া সত্বেও ভাষা সাধুভাষা হতে পারে, যেমন—রাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারত। আলোচ্য বিষয়বস্তুব উপরেই বহুল পরিমাণে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব নির্ভর করে। বিষয়ভেদে ভাষা মন্থরতা বা দ্রুততা লাভ করে। আমরা যাকে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব বলি তা মূলতঃ দ্রুততার উপর নির্ভরশীল। হ্রস্ব ক্রিয়াপদ অনেক সময়ে ভাষাকে কেন্দ্র কবে তোলে বলেই অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এটাই বুঝি চলিত ভাষার অপরিহার্যতম লক্ষণ। ক্রিয়াপদের রূপের সঙ্গে ভাষার রূপেব যে কার্যকারণ সম্পর্ক নেই একথা আমরা জেনেছি। উদাহরণে বলা যেতে পারে চলিত ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের গদ্য রচনারীতি, প্রধানত নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছে—গোরা, জীবনস্মৃতি ও চতুরঙ্গ।

জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের অন্য গদ্য গ্রন্থের তুলনায় সম্ভবত বেশি করে অতৃপ্তি প্রসূত। কারণ জীবনস্মৃতির মত এত ভাষার বৈচিত্র্য আর অন্য কোন গদ্য গ্রন্থে নেই বলেই মনে হয়। গ্রন্থপাঠে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে একাধিক পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন। এখানে বিষয়ের সঙ্গে Style জড়িত। ১৯১২ সালের আগে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার জীবনের স্মৃতি লেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেন নি। জীবনের ঘটনাকে তিনি দেখাতে নাবাজ, আবেগকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে কবিজীবন কথা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সফল কাব্যই কবির জীবন।' তাই যখন তাগিদে পড়ে মধ্যবয়সে এসে জীবনস্মৃতি লিখলেন তখন মান রক্ষা হল, কিন্তু মন রক্ষা হল না। জীবনস্মৃতিব ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ ছবি আঁকবার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি শুধু পঞ্চাশ বছরের কবি

নন, প্রথম শ্রেণীর গদ্য লেখকও বটে। গদ্যের বিষয়বস্তুর উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এখন জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর কলম তুলি হয়ে গেল। এই নীরব সিদ্ধান্তে জীবনী লেখা হল। ক্ষুদ্রখণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তকে একত্র করলেন। পরস্পর অসংলগ্নকে বাঁধতে গেলে সমগ্রের উপর তরল পদার্থ ঢেলে দিতে হয়। ভাষা এই কাজ সমাধান করলো। তাই ভাষার রমনীয় দ্যুতিই জীবনস্মৃতির স্টাইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার লীলা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবি লিখেছেন ঃ—

'বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল,
এমনকি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন
খুশী যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না।
সেজন্য বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে
দেখিতাম। .... দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাইরেই।"

এই গেল এক রকম। আবার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে মৃত্যুশোক অধ্যায়ে তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর জীবনে শোকের যে দূরপনেয় বিষণ্ণতা আক্ষিপ্ত করেছিল তা উল্লেখযোগ্য। এখানে মৃত্যুশোকে চোখের জলে আভা লেগেছে। আবার যেখানে বিষয়বস্তু স্কুলের বর্ণনা সেখানে রবীন্দ্রনাথ অট্টহাস্য করেছেন। তাই অতীতের স্মৃতি— বর্তমানের ভাষা এই দুয়ের সমন্বয়ে জীবনস্মৃতি সম্পূর্ণ। পরিণত বয়সের প্রকাশভঙ্গী আর অপরিণত বয়সের প্রেম, পুলক, দুঃখ, বিস্ময়, বেদনা নিয়েই জীবনস্মৃতির মেরুদণ্ড, রমণীয় লঘুত্বে স্মৃতির রূপ সাগরে একবার ডুবেছেন আর উঠেছেন। শিশুর স্মৃতি নদীতে পুনঃপুনঃ অবগাহন এবং তদ্‌জনিত জলের গভীর থেকে বস্তু সংগ্রহ করে, সেই সংগ্রহে শৈবাল আছে, জলচরজীব আছে, কর্দম আছে আর তারই সঙ্গে দু একটা মুক্তারও আভাস পাওয়া যায়।

তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ কখনই বিশুদ্ধ প্রাবন্ধিক নন। অর্থাৎ প্রবন্ধে তথ্যহার, বিদ্যাবিলাসিতা, নৈয়ায়িকতা, সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করে বিরুদ্ধমতের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করা ও আপন বক্তব্যের পক্ষে বিজয়ীর পতাকা উত্তোলন করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ একান্তই কবি, কেবল কাব্য নয়—গল্পে উপন্যাসে নাটকে চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সর্বত্রই তিনি কবি। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যের উপাদানে নির্মিত। গ্যেটে গদ্যে ও পদ্যে একই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। শেলীর গদ্যও তাঁর কবিতাব মতো উচ্ছ্বসিত, ভাবালুতাপূর্ণ এবং প্রবহমান। কোলরিজের গদ্য কাব্যের তুলনায় অনেক ভারবাহী। কীটসের গদ্য উপমাবহুল ও কল্পনাপ্রবণ, মধুসূদনের গদ্যে কাব্যের স্থাপত্য ও লাবণ্যের সমন্বয় ঘটেনি। আর রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার ভাষা। হয়তো ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সিদ্ধান্তই অপরিবর্তিত থাকে।

সাধারণতঃ স্মৃতিকাহিনী লিখতে গেলে গদ্যে দুর্বলতা আসে। সুতরাং যে আমি লিখছি এবং যে আমিকে নিয়ে লেখা এই দুজনকে আলাদা করে দেখতে হবে। শিল্পীর মনোরম ব্যক্তিত্বে 'আমি'কে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। পঞ্চাশ বছরের রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসরের

বালক রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। সুতরাং এর মধ্যে নিজের কথা বললেও উগ্র আতিশয্য নেই, স্মৃতির সুরভিতে তা ভরপুর। জীবনস্মৃতিতে প্রসাদগুণের প্রসন্নতা এবং মাধুর্যগুণের মিষ্টতা বিদ্যমান। প্রমথ চৌধুরী তাই মনে করেন—

'জীবনস্মৃতির ভাষা অতি সাত্বিক ভাষা।'

তবে জীবনস্মৃতির গদ্যের চেয়ে অনেক বেশি ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় অন্যত্র মিলবে। অন্যখানে এর চেয়ে বেশি নাট্যগুণ থাকলেও এখানে যেমন প্রসাদগুণ এবং স্টাইল আছে তেমনটি বোধ হয় আর কোথাও নেই।

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান না। তিনি বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করেন ব্যক্তিত্বকে, বিতর্কের ভাষায় এসে লাগে কণ্ঠস্বরের লাবণ্য, যুক্তির অঙ্গে চাপিয়ে দেন অলঙ্কারের মানিক্য, তথ্যের বদলে ব্যবহার করেন চিত্র। বুদ্ধির কাছে আবেদন জানাবার পূর্বে তিনি কামনা করেন হৃদয়ের সখ্যতা। তাঁর প্রবন্ধে বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর সমকালীন কবিতার যোগ দেখা যায়; যেন একই ভাবানুভূতি কখনো কাব্যের ছন্দ—হিল্লোলে, কখনোও গদ্যের ঋজুভূমিতে প্রকাশ পেয়েছে। যেন তাঁর জীবনদর্শন কখনও কখনও সেই সমস্ত উভচর লতার মতো যা জলে ও ভূমিতে জন্মে। সেই জন্য তাঁর প্রবন্ধে বিষয়ের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি বিষয়কে আঘাত করেন না। কাব্যিক উপলব্ধির গভীর অন্তর্ভেদী ক্ষমতার দ্বারা তিনি বিষয়টিকে একেবারে উদ্ভাসিত করে দেন। তাই বিষয়বস্তুর প্রাধান্য এবং বিষয় নিরপেক্ষ রচনা গৌরব—এই দুই মূল শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার শ্রেণীবিভাগ করলে ক্ষতি নেই।

জীবনস্মৃতির গদ্য অতি চতুর রমণীয় ভঙ্গির রচনা। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শিষ্ট সাহিত্যিক গদ্যে তাঁর আত্মস্মৃতি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করেন নি, কেবল উপরিতলের আলোছায়া মুখরিত লীলাতরঙ্গের চিত্রপট অঙ্কন করেছেন। পূর্ববর্তী আত্মপরিচয় গ্রন্থে কাব্যজীবনের রহস্যলোকে অবগাহনের গভীর মননশীল গাম্ভীর্য এখানে অনুপস্থিত। বিষয়ের চাপল্য এখানে বিলাসকলা কুতূহলে অভিব্যক্ত, মুখ্যত শৈশব ও কৈশোর জীবনের স্মৃতি এ গ্রন্থের উদ্দিষ্ট বলে তাঁর ভাষায় একটি প্রসন্ন নির্লিপ্ততা, একটি কৌতুকপরায়ণ সুদূর পর্যবেক্ষণ, একটি রমণীয় নিরাসক্ত স্পর্শকাতরতা ফুটে উঠেছে। ভাষা এখানে স্বপ্নভঙ্গ নির্ঝরের মত তথ্যের উপলখণ্ডের উপর দ্রুতগতিতে ধাবমান, তার উপর কাব্যিক অনুভূতির সূর্যকর পড়ে লক্ষবিন্দু রামধনুর বর্ণাঢ্যতা সৃষ্টি করেছে। স্মৃতির পটে জীবনের ছবি— এই ধ্রুবপদের দ্বারা কেবল জীবনস্মৃতির গদ্যভঙ্গিমার চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের স্টাইল তাই পিকচারেস্ক, চিত্রময়।

এই গ্রন্থের গদ্যবৈশিষ্ট্য —

১) জীবনস্মৃতির মধ্যে কোনরকম আতিশয্য নেই। রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের লেখায় হয়ত নতুন স্টাইল আছে কিন্তু তার আবেদন সার্বজনীন নয়। শেষের কবিতার ভাষা চোখ ঝলসায়, কিন্তু গোরার ভাষায় চোখ ঝলসায় না। রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যই আতিশয্যহীন, অত্যন্ত ভারসাম্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে জীবনস্মৃতিতে।

২) এর ক্রিয়াপদ সাধুভাষা বটে কিন্তু চলিত ভাষা এসে পড়েছে ক্রিয়াপদের সচলতায়। এতে অলঙ্কার আছে, সেই সঙ্গে ভাষার অপূর্ব লাবণ্যও আছে। জীবনস্মৃতিতে চলৎশক্তি আছে, আছে চলতি মেজাজ। এভাষা প্রথাকে মেনেছে কিন্তু সচলতার হানি হয় নি।

৩) জীবনস্মৃতির ভাষা নিটোল ও মসৃণ। এর গতি সাবলীল। এখানে আগে থেকে কিছু ভাবতে হয় নি, সরসতা ও মসৃণতা আপনাআপনিই এসে পড়েছে।

৪) স্মৃতিকথার প্রচুর তথ্যও এখানে আছে— এর মধ্যে কবির পারিবারিক জীবনের তৎকালীন কলকাতার চিত্র, প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে মন্তব্য প্রভৃতি আছে। স্মৃতির চিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে ভাষার অতিনিবন্ধতা নেই, পরিমিতিবোধ এর স্টাইলের বড় কথা।

৫) প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ই স্বয়ং সম্পূর্ণ। ক্ষুদ্রাকার লঘুপ্রবন্ধের মতো 'লিপিকার' রচনার সঙ্গে তুলনীয়।

৬) সমগ্র গ্রন্থেব স্মৃতিচর্চার কোন ধারাবাহিকতা নেই। এলোমেলো বিষয়সূত্রে সেগুলি সঙ্কলিত। কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ, কখনো পরিবেশ কবির স্মৃতিচিন্তার অনুবর্তী হয়েছে। এজন্য সেগুলিকে ধারাবাহিকতা দেবাব জন্য, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য কৌতুকের পরিহাসের উচ্ছল শিকরনির্ঝর দ্বারা সিক্ত করা হয়েছে।

৭) যেখানে প্রকৃতি বা নিসর্গ কবির চেতনালোকে উদ্ভাসিত সেখানে ভাষা হয়েছে গম্ভীর ও রহস্যময়, লীলাত্মিকা। যেখানে বিষয় কোন পুরাতন ঘটনাময় স্মৃতি, সেখানে ভাষা শিশুকণ্ঠের কলতানের মধ্যে করতালিব মতো, নৃত্যচপল উল্লসিত। যেখানে আলোচ্য বিষয় শোক সেখানে ভাষায় ক্রন্দনের গাঢ়তা লেগেছে, বিষাদের নিবিড় বেদনায় সে ভাষা কম্পমান। মানুষের স্মৃতিভেদে ভাষাব রংবদল হয়েছে। কবিতার আলোচনায় ভাষায় লেগেছে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা শক্তি।

জীবনস্মৃতি পরিমিতি বোধ ও সংযমের জন্যই সুখপাঠ্য হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মনস্বিতা, গভীর বস্তুভেদী অন্তর্দৃষ্টি যে কোন বিষয়কেই অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথেব যে কোন গদ্যরচনাতেই খানিকটা বিষয়গৌরব অপরিহার্য। কবির মননশীলতায় তুচ্ছ বস্তুও অসাধাবণ উচ্চতা লাভ করে। সাধারণ একটা চিঠিতেও তিনি দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথাকে কত অর্থবহ করে তুলতে পারেন আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখি। রবীন্দ্রনাথ কখনও Pure knowledge-এ বিচরণ করেন না। কবিসত্তার দ্বারা প্রভাবিত বলে রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যপথে 'জীবনস্মৃতি' স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। জীবনস্মৃতির দীপ্তি ইস্পাতের দীপ্তি নয়, ফুলের উপর চাঁদের আলোর দীপ্তি। এখানে অলঙ্কার এত সুকৌশলী, এত সূক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না। অনলঙ্কৃত হওয়াই যে কত বড অলঙ্কার তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি'।

রবীন্দ্রনাথ কোন উল্লেখযোগ্য জীবনী রেখে যান নি। ১৩০২ সালে 'সখা ও সখি' নামে পত্রিকায় তিনি সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধে কবিজীবনের কতকগুলি অন্তরঙ্গ সংবাদ

প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে আত্মজীবনীসুলভ কোন বিশিষ্ট সংবাদের অভাব ছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার লেখক' গ্রন্থে 'কবির আত্মপরিচয়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে রচিত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও কবি তাঁর জীবনের ব্যবহারিক ঘটনাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেন নি। যে ঘটনাগুলিকে কবি জীবনের উন্মেষের সহায়করূপে বিশ্বাস করতেন কেবল সেইগুলিকেই গ্রন্থভুক্ত করেছেন। জীবনস্মৃতি তাই পরিণত বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর দ্বারা ব্যাপকভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন পঞ্চাশ বছরের পরে। কবিব জীবন সংক্রান্ত তথ্য ঘটনা ইত্যাদি জানার জন্য দেশবাসীর ক্রমবর্ধিত কৌতূহলের মাত্রা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যেই জীবনস্মৃতি রচনার সূত্রপাত। কবি তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতির দায়িত্ববোধ তাঁর রচনাকে স্বভাবতঃই সতর্ক, সংযত, সুশৃংখল, পরিপাটি ও মার্জিত করেছে।

পক্ষান্তরে ছিন্নপত্রাবলী কবির প্রগলভ্ তারুণ্যের রচনা। যদিও জীবনস্মৃতির পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি বনফুল, কবি কাহিনী, ভগ্নতরী, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি গ্রন্থের পটভূমি, পরিবেশ ও বাতাবরণ রচনা করেছেন। আর ছিন্নপত্রের মধ্যে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, কাহিনী, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, গল্পগুচ্ছ, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবলোকটিকে উদঘাটিত করেছেন। ফলে এই উভয় গ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত একটা রেখালেখ্য রচনা করা যায়।

ছিন্নপত্র পত্রগুচ্ছ হলেও আসলে জীবনস্মৃতিরই একটি দৈনিক সংস্করণ মাত্র। এই কারণেই জীবনস্মৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের কথা এসে পড়েই। উভয় ক্ষেত্রেই কবি তথ্যের প্রতি অসহিষ্ণু, মুখ্যত চিত্রকর। জীবনের ছবি রচনায় তাঁর আগ্রহ স্মৃতিরই পটে। জীবনস্মৃতিতে অতীতের স্মৃতি, ছিন্নপত্রে দৈনন্দিন স্মৃতি। কিন্তু উভয়ত্র তিনি পটকার। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয় গ্রন্থে ব্যবধান থাকলেও দুটি গ্রন্থেব রচনাই কবির। সাহিত্যে অন্যান্য শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচবণ থাকলেও প্রধানতঃ কাব্য রচনা মুখ্য হয়ে উঠেছে উভয় গ্রন্থে। দুর্মর সৌন্দর্য্যবাসনা, প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আসক্তি, বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার আকুলতা, জীবন সম্ভোগের বলিষ্ঠতা, সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা, খণ্ডভূখণ্ডের মধ্যে বিশ্বাত্মবোধ, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এইগুলি অপরূপ ভাষায় দুটি গ্রন্থে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনস্মৃতি বৃহত্তর পাঠক সমাজকে উদ্দেশ্য করে রচিত, ছিন্নপত্রাবলী ব্যক্তিগত পত্র— কিন্তু উভয় রচনাতেই অন্তরঙ্গ, অকপট, আত্ম-উদঘাটনের ও আত্মরহস্য প্রকাশের শ্রীময় রীতি দুই ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

জীবনস্মৃতি আত্মজীবনী—ফলে এখানে বক্তা ও বক্তব্যের মধ্যে একটা দূরত্ব স্বাভাবিক। অতীত তাঁর কাছে রহস্যময়, রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। ছিন্নপত্রেও রোমান্টিকতা কম নেই। অতি সাধারণ ঘটনা, তথ্যহীন অনুভূতি, কবির বর্ণনায় কি অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তা এই দুটি গ্রন্থে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। জীবনস্মৃতিতে কবি প্রৌঢ় বর্তমানের ছায়াবীথিকায় দাঁড়িয়ে প্রভাত সূর্যালোকিত যাত্রা পথটিকে অবলোকন করেছেন। দৃষ্টিতে এসে মিশেছে অতীতের প্রতি কৌতুক ও মমতা, স্নেহ ও করুণা,

দার্শনিকতা ও গভীরতা। কিন্তু দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের মধ্যে দূরকালের ব্যবধান বলে হয়তো সেগুলিতে কিছু অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু এ অতিরঞ্জন সাহিত্যের সামগ্রী। কেননা 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—পল্লীর মা এবং সাহিত্যের মা এক কণ্ঠে শোক প্রকাশ করে না আর ছিন্নপত্রাবলীতেও কবি প্রত্যক্ষ বর্তমানকে বিবৃত করতে বসে তথ্যের পুঞ্জীভবন ঘটান নি। সেখানেও তাঁর বক্তব্য বস্তু সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনকথা যখনই বর্ণনা করেছেন তা অতীতের বা বর্তমানের, যাই হোক না কেন, তখনই তার বিকাশসূত্রকে তিনি সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, কবিমানসের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কুঞ্চিকাটি পাঠককে দান করেছেন। প্রভাত-সন্ধ্যার মর্মকোষে যে অমৃত মধু ক্ষরিত হয়, হরিৎ শষ্যক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তে যে আশ্চর্য সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে, কলস্রোতা নদীর তরঙ্গরেখায় যে রহস্যময়ী কর্ণধারের হাতছানি দেখা যায়, দূর সিন্ধুকূলের জ্যোৎস্না-প্লাবিত হিমাদ্রী শিখর থেকে যে অপরিচিত বিদেশিনীর নূপুরনিক্কন ধ্বনিত হয়, শ্যামায়মান তমালতালীবনের ঘনায়িত অন্ধকারে যে ব্যাকুল বিরহ বিদীর্ণ হতে চায় তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি আবেগ-এমন সন্তর্পণে, এমন সবেদন আনন্দে, এমন বিপন্ন বিস্ময়ে, হৃদয়ের রক্তরাগে অংকিত করেছেন কবি আলোচ্য দুটি গ্রন্থে—যা তুলনারহিত।

জীবনস্মৃতি এবং ছিন্নপত্রাবলীতে কবি তাঁর কাব্যজীবনের ভাষ্য রচনা করেছেন। আপনার অজ্ঞাতসারে তাঁর কবি জীবনটি কোন অদৃশ্য বিধাতার হাতে পর্বে পর্বে, স্তবকে অধ্যায়ে শতদল পুষ্পের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে, এ উপলব্ধি তাঁর সমগ্র জীবনের। কি ব্যক্তিগত পত্র, কি আত্মজীবনী সর্বত্রই তিনি শিহরণ, রোমাঞ্চ, উল্লাস, বিস্ময়কে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শোকে মূর্ছাতুর, পরিহাসে উন্মুখর, স্বপ্নে রোমাঞ্চিত, তৃপ্তিতে তন্ময, বিস্ময়ে হতবাক, উল্লাসে উচ্চকণ্ঠ, ক্রন্দনে অধীর, সখ্যে স্নিগ্ধ এই দুই গ্রন্থের আশ্চর্য গদ্য তাঁর লেখনীকে পদে পদে পংক্তি চরণ অনুচ্ছেদে ধন্য করেছে।

জীবনস্মৃতি'তে কবি যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ় লগ্নের দ্বারদেশে এসে জীবনেবই স্মৃতি তর্পণ কবেছেন। ছিন্নপত্রাবলী নিঃশব্দে রচিত কবির অন্তবঙ্গ জীবন-চরিত, মহাজীবনের মহাভাষ্য, কবি জীবনের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।

জীবনস্মৃতির রচনাগুলো আলোচনা করলে দেখা যায় যে এক সর্বত্রগামী 'আমি'—এই রচনাগুলির স্রষ্টা, আমরা নয়। এই উত্তমপুরুষ গীতিকাব্যের বক্তার মতই দেশকালের বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হয়েও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। তাই জীবনস্মৃতির ভাষায় Art is concealed হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের অলঙ্কার গোপনে বিরাজ করছে, নিজেকে কাঙালের মতো প্রকাশ করছে না। আর করে না বলেই তো 'জীবনস্মৃতি' সর্বকালের সর্ব শ্রেণীর পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হয়েছে। আর সুখপাঠ্য হবার শেষ কথা— 'আমার এক মাত্র পরিচয় আমি কবি'।

রক্তকরবী : একটি সমীক্ষা

অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ টাইটানিক ওয়েল্‌থের যে পরিচয় পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বাস্তব অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় ১৩৩০-৩২ এর মধ্যে 'রক্তকরবী' নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু যক্ষপুরী নামক সংগ্রহশালার অসূর্যম্পশ্য অভ্যন্তরে কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবীর সংঘাত। রবীন্দ্রনাথ সমাজসচেতন কবি এবং নাট্যকার সেইজন্য তাঁর নাটকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আধুনিক বস্তুসর্বস্ব যন্ত্রবিজ্ঞান তার গ্লানিভারাক্রান্ত অপচ্ছায়া বিস্তার করেছে। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বময় কবিপ্রাণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে তাঁর নাটকগুলিতে তথ্যসর্বস্ব বাস্তবতার অনুকৃতি নেই। রূপকে, সংকেতিকতার আভাসে, রেখায়, সঙ্গীতে তিনি যে জগতের চিত্রাঙ্কন করেন তা ঊর্ধ্বতর বাস্তব (higher reality)। এই জন্য রক্তকরবী নাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার উপর রচিত হলেও এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি রাজা।

রক্তকরবীর রাজা রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি। রাজা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও নাটকে একটি পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দ। রাজর্ষি, শারদোৎসব, রাজা ও রানী, রাজা, মুক্তধারা, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকে একটি করে রাজা চরিত্র আছে। এই রাজা কখনও ঈশ্বর, কখনও ত্যাগভূয়িষ্ট সম্পদ, কখনও রাষ্ট্রশক্তি বা কখনও ধনতান্ত্রিক বিপুলতার প্রতীক। রাজা নাটকে রাজা যুগপৎ ঈশ্বর ও রাষ্ট্রশক্তি। প্রথম দিকের নাটকের এই রাজা জাতীয় চরিত্র প্রাচীন ভারতীয় রাজর্ষি চরিত্রের নিকটবর্তী। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসন শক্তির সাম্রাজ্যবাদস্পৃহা ও সম্পদ বাহুল্যের একটি প্রাণঘাতী স্বরূপের একটি বিকল্প রূপ (hypothesis) তার নাটকে সন্নিবেশিত করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার নাট্যকার নন। তাঁর নাটক higher reality র নাটক, তাই ঘটে যা তা সব সত্য নয়। কবির মনোভূমিতেই এই সম্ভাব্য সত্যের অবস্থান। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা জাতীয় চরিত্র বাস্তব রাজার অর্থাৎ শাসক শক্তির প্রতিস্পর্ধী সম্ভাব্য বাস্তবতা। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ রাজাকে অন্ধকারে অথবা জালের আড়ালে রাখেন। শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার পাশে কবির আদর্শ সমাজ চেতনার প্রতিষ্ঠা ঘটার পর রাজা অন্ধকারের বাইরে আসেন। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক আদর্শের যে অতিবৃদ্ধির সমালোচনা তাঁর নাটকের বিষয়, কবির শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সেই অতিবৃদ্ধির রূপান্তর ঘটায়, তাই রাজা নাটকে সুদর্শনার সঙ্গে রাজাব মিলন ঘটলে কুদর্শন রাজাকে অপরূপ সুন্দর মনে হয়। রক্তকরবী নাটকের রাজা জালের আবরণ থেকে বেরিয়ে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

প্রসঙ্গত 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ভাবসত্যের একটি প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছেন। সীতাহরণ এবং তার ফলে লঙ্কাধ্বংস রামায়ণের মূল বিষয়। নাটকেরও মূল বিষয় নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে আনয়ন ও যক্ষপুরী ধ্বংস। রক্তকরবীর নাট্য পরিচয়ে রাজা চরিত্রটির নিম্নরূপ পরিচয় দান করা হয়েছে—

(১) রাবণের মত রাজার একাধিক বাহু বা মুণ্ড না থাকলেও 'আমার পালায় রাজা শক্তি বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন'।

(২) 'ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী, বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ দ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করতো।' রক্তকরবী নাটকেও রাজা শ্রমশক্তিকে যক্ষপুরীতে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করেছে।

(৩) রামায়ণে দেবদ্রোহী সমৃদ্ধিব মাঝখানে সীতার আগমনে ধর্মের জয় হয়েছে। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর আগমনে রাজার পরাজয় ঘটেছে।

(৪) রামায়ণের রাবণ স্বর্ণালঙ্কার অধীশ্বর, রক্তকরবীর রাজাও স্বর্ণসংগ্রহী। নন্দিনী বলেছে যে 'বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সোনার তালগুলিকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলো তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম'।

(৫) 'রামায়ণে রাবণ ও বিভীষণ স্বতন্ত্রচরিত্র কিন্তু সহোদর ভাই। কবির ভাষ্যে একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে।' কিন্তু রক্তকরবী নাটকে—'রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।'

রক্তকরবীর রাজা একই সঙ্গে মানুষ এবং শক্তি, বাস্তব এবং তত্ত্ব। এইজন্য রক্তকরবীর অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে রাজা চরিত্রের একাধিক মাত্রা বা demension আছে। যক্ষপুরী সম্পর্কে রাজার এক মূর্তি, নন্দিনী সম্পর্কে রাজার অন্য এক মূর্তি, সর্দারদের সম্পর্কে রাজাব একমূর্তি এবং স্বর্ণসংগ্রহ সম্পর্কে রাজার আর এক মূর্তি। রাজার এই বিভিন্ন মূর্তি যক্ষপুরীর চরিত্রগুলির পাবস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আভাসিত হয়েছে।

অধ্যাপক। — আমাদের মরাধনের প্রেতেব যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ -ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। — দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ীব সিংহদ্বার, বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গেব লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

নন্দিনী। — ও যেন হাজার বছরের বটগাছ আমি যেন ছোট্ট পাখী।

রাজার সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তি যুক্ত হয়ে তাকে প্রবল প্রতাপশালী করে তুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজা কেবল শক্তির সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর প্রতীক নয় তার মধ্যে রিক্ততাও আছে। রাজা নিজের সম্পর্কে বলেছে—'আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।' নন্দিনী বলেছে—'সেই চূড়ার বুকেও ঝর্ণা ঝরে। তোমার গলাতেও মালা দুলবে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজা চরিত্রে একটি মানবসুলভ দুর্বলতা স্থাপন করে রাজা চরিত্রের পবিবর্তন সাধন করেছেন। রাজার এই রিক্ততা রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত

হয়েছে। রাজা সংগ্রহ করে কিন্তু সেই সংগ্রহ নিষ্প্রাণ। দুর্গম থেকে রাজা হীরা মুক্তা সঞ্চয় করে কিন্তু সহজের থেকে প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারে না। কবি জানেন আর সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। তাই রাজার মর্মভেদী আত্মসমালোচনা— 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি— 'আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটি কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে। ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।' এইজন্যই নন্দিনীর আগমনে রাজার এতাবৎ শুষ্কজীবনে বিক্ষেভের আবির্ভাব ঘটেছে। এই মানবকন্যার স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় রাজার মধ্যবর্তী সহজাত মানববুদ্ধি ও প্রয়াসলব্ধ বৈজ্ঞানিক শক্তি আন্দোলিত হতে আরম্ভ করেছে। অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর মানববুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'একই দেহে পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণ। একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ।'

রক্তকরবী নাটকে রাজা চরিত্রের এই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মানববাদী ধারণার পরিচায়ক। কবি মানুষের পাপবুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভ বুদ্ধিতেই আস্থা রাখেন। রাজা ধনতান্ত্রিক স্ফীতির প্রতীক কিন্তু অন্তরে তিনি মানুষ। নাটকের প্রথম দৃশ্য তিনি সর্দারদের করায়ত্ত, নাটকেব শেষ দৃশ্যে রাজার অভিযান মুক্ত মানুষের বিজয় সংগ্রামের সঙ্গে। রাজার অপরিমিত শক্তি যদি সংগ্রহের ক্লিষ্টতার বদলে জীবনে কল্যাণে ব্যয়িত হয় তবেই বৈজ্ঞানিক শক্তির চরিতার্থতা, যন্ত্রপীড়িত রাজার শেষ মুক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ মুক্তি প্রাণেরই মুক্তি। এজন্য রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে রাজাকে রাবণ ও বিভীষণ বলেছেন। জয়ের কাছে আত্মসমর্পণই পাপ। শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির আবির্ভাবে এই পাপকে রাজা পরাজিত করেছে। মৃত রাজার অভিশাপে তার জীবন পরিবর্তিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে রাজা চরিত্রটি বারবার দেখা যায়। তিনি কখনও রাজর্ষির ঐতিহাসিক রাজা, রাজা নাটকে তাঁর আধ্যাত্মিক রূপ, শারদোৎসবে, মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে রাজার পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিচয় আছে। খেয়ার দুঃখরাতের রাজা এবং 'মহারাজ একি সাজে এলে' এগুলিও আধ্যাত্মিক রাজার ইংগিত।

রক্তকরবী নাটকের রাজা স্পষ্টতই রাষ্ট্রশক্তি সংক্রান্ত কিছু রূপক। এই নাটক রচনার পূর্বে মার্কিন দেশে ধনতান্ত্রিক সঞ্চয় ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত মালিকানার অতি স্ফীতি এবং দেশের নানাস্থানে শিল্পকেন্দ্রে শ্রমজীবীদের দুরবস্থা—এই অভিজ্ঞতা কবির মনে ছিল। এই শোষণজীবী সভ্যতার সমালোচনার সূত্রে রক্তকরবীর যক্ষপুরীর পরিকল্পনা।

শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্রপুরুষটিকে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপুরীর রাজা রূপে কল্পনা করেছেন। এই কল্পনার পেছনে আছে হৃদয়হীন খনিমালিক শিল্পপতি পুঁজিবাদীগণ— যাদের শোষণলব্ধ সঞ্চয়ের দ্বারা ধনস্ফীতি হয়, দেশের শ্রমিকদের দারিদ্র্য বাড়ে। সমবণ্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত উৎপাদন কমে আসে। ধনতান্ত্রিক সমাজ একচেটিয়া মালিকানার সমর্থক। সুতরাং এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির অভিমান। এই যন্ত্রনির্ভর জীবনে হৃদয়ের স্থান নেই, রাজায় প্রজায় সুস্থ সম্পর্ক নেই, মানবিক শাসনব্যবস্থা নেই, প্রজা এবং রাজা এখানে উভয়েই নিষ্পেষিত এবং মনুষ্যত্বহীন।

মুক্তধারার রাজা ছিলেন যন্ত্রের উপাসক এবং পররাজ্য লোলুপ। রক্তকরবীর রাজা খনিজ সম্পদের অধিকারী, শিল্পযুগের ধনশক্তির মদমত্ত শাসক। যন্ত্রবাদী সভ্যতা মানুষের জীবনের পক্ষে কি শোচনীয় রকমের ভয়াবহ নাটকে তার আভাস আছে। নন্দিনী—'চেয়ে দেখ ওকি ভয়ানক দৃশ্য, প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি? ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে, ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে'।

সর্দার—ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।.......

অধ্যাপক—একবার শিখার দিকে তাকাও দেখবে তার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে।

নন্দিনী—সে যে (রাজা) অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক—সেই অদ্ভুতটি হলো যার জমা, এই কিম্ভুতটি হলো তার খরচ। ঐ ছোটগুলো হতে থাকে ছাই। আর ঐ বড়টা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড় হবার তত্ত্ব'।

এই বড় হবার তত্ত্বের উপরেই রাজা চরিত্রটি গড়ে উঠেছে। জনৈক সমালোচক বলেছেন—রাজা পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক। যে যান্ত্রিকতার উপর আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা যক্ষপুরীর রাজার মধ্যে তারই পরিচয়। রাজার ভিতর দিয়ে কবি যেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্যজীবনাদর্শের ভেদ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, রক্তকরবীর রাজা কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতারই পরিচায়ক নয়, বিশ্বব্যাপ্ত ধনতান্ত্রিকতার সংকেতে রাজার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক বহির্ঘটনার সংঘাত মাত্র নয় যেহেতু সেগুলি টমসনের ভাষায় Drama of ideas, সেইজন্য সেখানে পুনঃপুনঃ inner drama লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ প্রকাশ করেননি, মহাকবির আর্য দিদৃক্ষার দ্বারা ধনতান্ত্রিক সমাজে ভবিষ্যৎ ইংগিতও দিয়েছেন। তাই রাজা যুগপৎ reality এবং illusion, বাস্তব এবং রূপক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস পাপের মধ্যেই তার মৃত্যুবাণ থাকে, ধনতান্ত্রিক অমিতাচারের মধ্যেই রয়েছে তার রিক্ততার অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমগ্র রক্তকরবী নাটক তাই কেবল নন্দিনী বলে মানবীর ছবি নয়, রাজা বলে একটা সভ্যতার সংকটেরও ছবি। শেষ জীবনে এই সাম্রাজ্যস্পৃহধনগর্বী সভ্যতার প্রতি ধিক্কার দিয়ে কবি বলেছিলেন—

'এই কথা আজ বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। নিশ্চিত এ মত প্রমাণিত হবে যে—

> 'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তুবিনশ্যতি।'

এইজন্য রক্তকরবীর সূচনা থেকে রাজার একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রাজার শক্তির মধ্যে শান্তি নেই, তার অন্তঃস্থলভেদী ক্ষুব্ধ অশান্তির হাহাকার ভেসে আসে। অপরিমিত শক্তির বাহু মেলে সহস্র সুন্দর জীবনকে রাজা কবলগ্রস্ত করে, যৌবনকে সে গ্রাস করেছে। এই শক্তি দিয়েই সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে অধিকার করতে চায়। যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তরের দিকটি কেবলই রিক্ত। এই রিক্ততার বেদনায় যক্ষপুরীর ভিত্তিমূলকে শেষ পর্যন্ত শিথিল করে দিয়েছে। অন্তঃসারশূন্য পর্বতের মত রাজা একদিন

ভেঙে পড়েছে। এইদিক থেকে রাজা অর্ধসাংকেতিক অর্ধরূপক চরিত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ও সঞ্চয়ের দিক থেকে রাজা রূপক প্রধান, অন্যদিকে রাজা আবৃত ও বিবৃত মনুষ্যত্বের প্রতীক এবং সেই হিসাবে সাংকেতিকতা চিহ্নিত। নাটকে বারবার 'সোনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার সঞ্চয় এই নিষ্প্রাণ স্বর্ণের কিন্তু মৃত্তিকার উপরিভাগেব যে প্রাকৃত সোনা ফসল, পৌষ উৎসবের গান যে সোনার লাবণ্য, নবান্নের আনন্দ যে সোনার মূল্য, সেই সোনার সঙ্গে এই স্বর্ণের সাংকেতিক ভেদটি সহজেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অন্তর্বেদনায় রাজার চরিত্রটি করুণ হয়ে উঠেছে।

কারলাইল বলেছেন—'In a symbol there is concealment and yet revelation.' রক্তকরবীর রঞ্জন এইরূপ একটি চরিত্র। সে একবারও মঞ্চে আসে না তবু প্রতিক্ষণেই তার চরণধ্বনি শোনা যায়। রাজা কণ্ঠস্বরে উপস্থিত, দেহে অদৃষ্ট। রঞ্জন নন্দিনীর শিহরণে পুলকে উপস্থিত; রাজকণ্ঠের ঈর্ষায় উপস্থিত। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে অদৃশ্য মনে হয়। শেষ পর্যন্ত তার মৃতদেহের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দেহটিও দর্শকের নেপথ্যে থাকলেও কিছু এসে যায় না, কারণ তার মৃত্যুই যথেষ্ট।

রক্তকরবীর সূচনা থেকে নন্দিনীমুখে রঞ্জনের প্রসংগ শোনা যায়, জানা যায় নন্দিনীর বিশ্বাসে তার আগমন সম্ভাবনার কথা। নাটকের মধ্যভাগে সর্দারদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে জানা যায় রঞ্জন যক্ষপুরীব মধ্যে আনীত জনৈক শ্রমজীবীর নাম, কিন্তু তার আচরণে শৃংখলের প্রতি প্রণতি নেই, শোষণের প্রতি দাস্য নেই, মারেব প্রতি ভক্তি নেই। সে অনায়াসে চাবুকের পাশে সারেঙ্গী বাজায়, গাম্ভীর্য্যের পাশে অট্টহাস্য করে। শেষ দৃশ্যে জানা যায় কেবল নন্দিনীর প্রতি অনুরাগ ঘোষণার ঔদ্ধত্যে রাজা তাকে নিঃশেষে হত্যা করেছে। সুতরাং একই নাটকে রঞ্জনের একাধিক সত্তা। রঞ্জন নন্দিনীর নির্ভীক বন্ধু ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, রঞ্জন যক্ষপুরীর দুর্ধর্ষ-দুর্বিনীত শ্রমিক, রঞ্জন ঔদ্ধত্যে ও অধিকারের স্পর্ধায় রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী। এককথায় রঞ্জন নিখিল যৌবনের প্রতীক। যে যৌবন জীবনের সৌন্দর্য রঞ্জন তারই পরিচয়। যক্ষপুরীর রাজা দু'বার রঞ্জনকে হত্যা করেছে।—'ও কেন বললে না ওর নাম, কেন এমন স্পর্ধা করে এল।'—এই হত্যা অতর্কিত, সাম্প্রতিক কিন্তু এর আগেও রঞ্জনকে বহুদিন ধরে রাজা হত্যা করেছে।—'আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।' যক্ষপুরীর রাজা যৌবনের শত্রু, সেজন্য তিনি রঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী, এখানে আনন্দময় যৌবনের প্রবেশ নিষেধ। যক্ষপুরীর রাজা রঞ্জনকে হত্যা করে তার যৌবনকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। রঞ্জনের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে রাজার জীবনের একটি মানসিক ঘটনা। এই দৃশ্যটি তারই নাটকীয় রূপ। এইজন্য নন্দিনীকে রাজা ডাক দিয়ে বলেছে—'আমাকে তোমার সাথী কর।' রঞ্জনের তথাকথিত মৃত্যু যেন রাজার আত্মবিকাশের নামান্তর। তাই শেষ পর্যন্ত রঞ্জনকে ব্যক্তির স্বরূপে আর দেখা যায় না।

রাজা ও রঞ্জনের সম্পর্কটি জটিল। সম্ভবতঃ কবির নিজের কাছেও এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। এইজন্য বারবার তিনি নাট্যপ্রসংগে পাঠকের ও দর্শকের দৃষ্টি নন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। নাট্যকাহিনীর ঘটনা বিবৃতি ও ভাবতাৎপর্য্যের দিক থেকে কোন কোন সমালোচক রাজা রঞ্জনকে অভিন্ন মনে করেন। উভয়ে একই ব্যক্তির

ছদ্মবেশে দুই পরিবেশে অবস্থান করে—এই দিক থেকে ব্যাপারটি দেখা উচিত নয়। কিন্তু রাজার পূর্ব নাম, পূর্ব পরিচয় ও স্বরূপেই যেন রঞ্জন। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে রঞ্জনের চির অদৃশ্যতা ও রাজার স্বভাবধর্ম অনেকটা সুবোধ্য হয়। এইরূপ ব্যাখ্যায় বলা যায়—

(১) রাজার বর্তমান নাম মকররাজ। তাব হারিয়ে যাওয়া নাম রঞ্জন।

(২) নাটকে আগাগোড়া রাজার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আপন শক্তিব প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নন্দিনী জানে রাজার হাতের আশ্চর্য ছন্দের কথা। সুতবাং বলা যেতে পাবে মকররাজ রঞ্জনের বিপরীত বিকাশ নয়, বিকৃত বিকাশ।

(৩) নন্দিনীর প্রতি রাজার প্রেম জেগেছে। রঞ্জনকে সেই প্রেমের পাত্র জেনে রঞ্জনের প্রতি নিদারুণ ক্রোধ ও ঈর্ষা জেগেছে এবং নিজে রঞ্জন হয়ে উঠতে না পারলে নন্দিনীকে লাভ করতে পাববে না—একথা বুঝে পরাজয়ের গ্লানি জেগেছে। এই গ্লানির পরিণামই রাজার অবসাদ, ধ্বজাপূজার আয়োজন ও রঞ্জনের মৃত্যু। জালের বাইরে রাজার বহির্গমন এবং রাজার নবজন্ম।

(৪) রাজাব এই নবজন্মের জন্য রাজারও মৃত্যু দরকার।

রাজা —'তোমাকে এই মুহূর্তে যে মেরে ফেলতে পারি।'

নন্দিনী —'তারপর থেকে আমার সেই মরা মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাকে মারবে, আমার অস্ত্র নেই, আমাব অস্ত্র মৃত্যু।'

এইভাবে বাজা আবার রঞ্জন হয়ে উঠেছে। রঞ্জনের জীবন সাধনাকে গ্রহণ করেছে। নন্দিনীর প্রেম আর রঞ্জনের রক্তকরবী নয়, বাজার প্রলয় পথেব দীপশিখা।

(৫) সর্দাবদের সংলাপে যে দৃশ্যে বঞ্জনের উল্লেখ আছে সেখানে রঞ্জন যক্ষপুরীর অন্যতম শ্রমিক মাত্র। নন্দিনীর প্রেমের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সেখানে সে যক্ষপুরীর অন্তর্গত। যেখানে কেবল তার ঔদ্ধত্যের পরিচয়, সেই দৃশ্যে নন্দিনী উপস্থিতও নেই।

(৬) নাটকেব সর্বত্র রাজার সঙ্গে নন্দিনীর কথোপকথন হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন চবিত্র কখনও রাজার সঙ্গে কথা বলেনি।

(৭) বাজা ও রঞ্জনের নাম সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

(৮) রাজা ও রঞ্জনেব এই তাত্ত্বিক সাযুজ্য স্বীকৃত হলে রঞ্জনেব মৃত্যুর পর রাজার প্রতি নন্দিনীর ব্যবহাবে অসংগতি থাকে না।

অবশ্য এই চিন্তার কতকগুলি বাধাও আছে। রঞ্জনেব মৃতদেহ, অন্যান্য চরিত্রের মুখে রঞ্জনেব উপস্থিতি সংবাদ, কিশোরের সঙ্গে রঞ্জনের সাক্ষাৎ—এগুলিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কারণে আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রঞ্জন সম্পর্কে মনস্থির কবতে পাবেননি। অবরুদ্ধ হয়ে নদীস্রোতই সরোবরে পরিণত হয়। তখন সে পূর্ণ গহন কিন্তু তবঙ্গহীন। কোন বর্ষার প্রবল বারিপতনে সেই সরোবর পুনরায় নদী হতে পারে। পূর্বতন নদীর স্রোত যেন রঞ্জন, অবরুদ্ধ সরোবব যেন রাজা, নন্দিনীব প্রেম যেন বর্ষাধাবায় সরোবরকে মুক্ত করেছে। সরোবব কিন্তু পূর্বেব স্রোতে কেবল গতি ছিল, সরোবব ভাঙা গতি স্রোতে আছে জলপ্লাবন। রাজা ও বঞ্জনেব এই পার্থক্য।

রক্তকরবী নাটক নয়, তত্ত্বনাট্য, সুতরাং নাটকীয়তাব দিক থেকে বিচার না করে তত্ত্বেব দিক থেকে বিচার করলে বলা যায জাতিগতভাবে রাজা ও রঞ্জন দুই পৃথক জীবন

সাধনা হলেও একটি প্রেমের দুই সাধনা; একই দেহে অর্ধনারীশ্বর রূপের মত, সূর্যালোকে উদ্ভাসিত চাঁদের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—দুই পক্ষেব মত।

প্রাচীন যুগের নাট্যকারগণ স্থূল ও হৃদয়ভেদী প্রবৃত্তিব মধ্যে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করতেন। কিন্তু আধুনিক সমাজের জটিলতা এই সকল প্রবৃত্তির বাহ্যিক উদ্যমকে সংকুচিত করেছে-ফলে দুঃখ জ্বালা জীবন সমস্যার সংঘাত এখন বাইরের ঘটনা নয়, অন্তরেব অনুভূতিতে প্রবল। পুরাতন ট্রাজেডির বীরত্বপূর্ণ অলংকার বহুল ভাষা বর্তমানে আতিশয্য বলে মনে হয়। এখনকার ভাষা সহজ গদ্যের কিন্তু গভীর অর্থযুক্ত। এখনকার নাটক পঞ্চাঙ্ক নয়, এক অঙ্কেই বৃহৎ জীবনকে ধরা যায়। সেক্সপীযর, মার্লো বেন জনসনের যুগ থেকে নাটক সরে এসেছে। এখন বাইরের সংঘাত বা বহিঃপ্রেরণার বদলে অন্তর্গত সংকেত নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে। জীবন সম্পর্কে এখন সাংকেতিকতা, অতীন্দ্রিয় রহস্য ও রূপকার্থ প্রযুক্ত হতে শুরু করেছে। মেটারলিংক, ইবসেন, হপম্যান, সিঞ্জে, আঁদ্রেভ প্রভৃতি নাট্যকারগণ এই ধারার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এই প্রকাব নাট্যরীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অচলায়তন, মুক্তধাবা, রক্তকরবী নাটকগুলিকে রূপক সাংকেতিক বা তত্ত্ব নাট্য বলা যায়।

রূপক ও সংকেত নাটকের দুটি পারিভাষিক শব্দ। নাট্যকাবদের কাছে এর মূল্য গভীর নয়, সমালোচকরাই এর পশ্চাদধাবন করেন। তাসের দেশ রূপক কিন্তু ডাকঘর বা রাজা সাংকেতিকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত। সম্ভবতঃ নাট্যকাব নিজেই তা জানতেন না। রূপক একটি বস্তুর উপব একটি তত্ত্ব বা নীতিকথা বা উদ্দেশ্যের আলগোছে আবোপ মাত্র। বাইরের রূপটির দ্বারা একটি মর্মার্থ উদঘাটন কবাই রূপকেব কাজ। একটি রূপক চরিত্র তার ভাষণে বেষ্টিতে (action) কার্যকারণ সংযুক্ত পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সচেতন বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ প্রদর্শন করে। বিদ্রূপ বা হাস্যকর পরিবেশের জন্য রূপক ব্যবহার হয়। কিন্তু সাংকেতিকতা কবি প্রতিভার একটি দুর্লভ শক্তি। রূপক নাটকের একটি কথাশিল্প, সাংকেতিকতা নাটকের কবিতা। যে সত্য অতীন্দ্রিয়, যে দৃশ্য অনির্দেশ্য, যে সৌন্দর্য অলক্ষিত তাকে আভাসে ইংগিতে ব্যঞ্জনায় অনুভবগম্য করাই সংকেতের কাজ। চক্ষুকর্ণের মত বহিরিন্দ্রিয় রূপকে বুঝতে পারে কিন্তু সংকেত অনুধাবন করা খানিকটা মনন ও অনুভবের কাজ। সংকেতে রূপকের মত আবোপিত আখ্যানেব প্রয়োজন হয। তাই রূপক সংহত কিন্তু সংকেত শিথিল বিন্যস্ত। আখ্যানের জটিলতার দ্বারা, আপাত বাস্তব চরিত্রের দ্বারা, দুর্বোধ্য সংলাপের দ্বারা, অর্ধস্ফুট পরিবেশের দ্বারা এক ইন্দ্রিয়াতীত আভাসের সৃষ্টি করে। এই সম্পর্কে কবি ইয়েটস্ বলেছেন—

'A symbol is indeed a possible expression of some invisible essence, a transperent lamp about a spiritual flame, while allegory is one of many possible representations of an embodied thing or familier principle or belongs to fancy and not to imagination, the one is revelation, the other an amusement.'

অতি সূক্ষ্ম জটিল ও অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির রূপায়ণে সাহিত্যিক শিল্পীরা সাংকেতিকতা ব্যবহার করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তত্ত্বপ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, তথা অসহিষ্ণু ভাববাদী কবি। সেইজন্য কাব্যনাট্যে তিনি সাংকেতিক বা প্রতীকবাদী। অবশ্য

ঠিক imagist নন। রাজা নাটক সম্পর্কে তিনি একবার বলেছিলেন—The human soul has its inner drama. জনৈক নাট্যকার Theatre of the soul নাটকের মানবাত্মার কয়েকটি স্তরের সন্ধান দিয়েছেন। যথা—'The rational self or reason, emotional self or feelings, physical self or eternal.'

রক্তকরবী নাটকে সাংকেতিকতার সঙ্গে বাস্তবতা ও রূপক মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অধ্যাত্মশোকের নাটক নয়, এর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। মার্কিন দেশ পর্যটনের অভিজ্ঞতা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের শিল্পাঞ্চলগুলির অভিজ্ঞতা এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছে। ধনতান্ত্রিক যন্ত্রে নির্ভর শ্রম উৎপাদন পরিবেশে নাটকটি গড়ে উঠেছে।

নাটকের উদ্দেশ্য বস্তুধর্মীর প্রতিফলন। নাটক নানা সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্যক্তির ব্যপ্তিমান জীবন কথারই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। জীবনের রূপাগত সত্তাই নাটকের কেন্দ্র। আবার রূপের একটি ভাবগত বাস্তবতা আছে। রূপক নাটকে এই রূপ অপেক্ষা ভাব প্রাধান্য লাভ করে। এখানে আরোপ অপেক্ষা আরোপনেরই প্রাধান্য বেশি। এই আরোপনের রীতি কাব্যধর্মী। নাটকে এই রীতিকে প্রাধান্য দিলে কাব্যধর্মিতার অনুশাসনে নাটকের আবেদন অবহেলিত হয়। কাব্য ভাবাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কবি সেইহেতু তাঁর নাটকে এই বাস্তব চেতন খানিকটা ভাববাসিত। তথাপি রক্তকরবী রচনার আশি বৎসর পর আধুনিক দৃষ্টিতে নাটকে আর সাংকেতিকতা মনে হয় না। সেইজন্য সমকালীন অনেক বস্তুবাদী সমালোচক মনে করেন রক্তকরবী একটি বাস্তবধর্মী জীবন আলেখ্য, ঘটনাংশের দুর্বলতা অনস্বীকার্য। কিন্তু চরিত্রগুলি বাস্তবজীবনের চমৎকারিত্বে এর সংলাপ, ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রাগ অনুরাগ প্রভৃতি বাস্তব জীবনের আবেগ স্পর্শে জীবন্ত। অন্ততঃ রক্তকরবীর অভিনয় এই বিশ্বাসকে আরো জীবন্ত করে।

রক্তকরবী নাটকে প্রচলিত নাট্যরীতির স্থানকালের পরিমিত সীমায় একটি গতিবেগের দ্রুতি যুক্ত হয়েছে বলে এই নাটকে এই চতুর্মাত্রিক ভাব (four dimensional effect) সৃষ্টি হয়েছে। স্থান কাল পাত্রের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে ভাবীকালের ইংগিত একটি আপেক্ষিক গতিকে সঞ্চার করেছে। dramatic irony না থাকলেও সমগ্র নাটকে একটি মানসিক উৎকণ্ঠা আছে।

সাংকেতিক নাটকে প্লটের প্রয়োজন সামান্যই। একটি কাহিনীর আভাসে এখানে ভাবকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। মেটারলিংকের Intruder নাটকে একটি পাণ্ডুর ক্ষীণালোক গৃহে কেমন করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর আগমন ঘটছে তারই কাহিনী বর্ণিত। রক্তকরবী নাটকে একটি রুদ্ধালোকে অসূর্যম্পশ্য ভূগর্ভগ্রথিত অথচ স্বর্ণগরিষ্ঠ যক্ষপুরীতে কেমন করে নন্দিনী নামক একটি দুর্বিনীত আনন্দের আগমনে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটলো তাই বর্ণিত আছে।

সাংকেতিক নাটকে সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংলাপ কেবলমাত্র বোধ্য বাস্তবকে ব্যক্ত করে না ঘটনা ও চরিত্রকে ব্যক্ত করে। একে মেটারলিংক বলেছেন 'second degree', রক্তকরবী নাটকে প্রত্যেকেরই সংলাপ দ্বিমাত্রিক। সাংকেতিক সংলাপ বাক ও অবাকের সমষ্টি। এখানে কথিত ও অকথিত পাশাপাশি থাকে। অধ্যাপক,

গোকুল, রাজা এদের ভাষা এইরূপ সাংকেতিকতার লক্ষণাক্রান্ত। প্রত্যেকেরই সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ।

> 'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক,'তারা জ্বালা ধরিয়েছে বলছে কাজ কর। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া সোনা মেলেছে মায়া ওরা নেশা ধরিয়েছে। বলেছে ছুটি ছুটি—'

রক্তকরবীতে নৈঃশব্দ অপেক্ষা সাংগীতিক ধ্বনির ব্যবহার করা হয়েছে। অবিরাম, অনবচ্ছিন্ন মৃদু অথবা তীব্র সুরে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' এই গানের দ্বারা। এই গানটি যক্ষপুরীর সমস্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে জীবনের ঘোষণা। অন্যান্য সাংকেতিক নাটকের মত রক্তকরবীতেও একটি নেপথ্যাভিনয়ের মূল্য আর এক ধরনের আবেদন জাগিয়ে তোলে। ধনতান্ত্রিক শাসনের অতিকায় স্ফীতি রূপ রাজা, উদ্দামতারুণ্য রূপ রঞ্জন এবং যন্ত্রযুগের বলি অসহায় মৃতকল্প শ্রমিকরা। অনুপ, উপমন্যু, শক্‌লু, কঙ্কু ইত্যাদি নামের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত নিষ্পেষিত জীবনের ইংগিত করা হয়েছে মাত্র।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হলো তার জমা, এই কিম্ভূতটি হলো তার খরচ। ঐ ছোট গুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়টা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড় হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

এই রাক্ষসের তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্যই নেপথ্যদৃশ্যের প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংগীত একটি অপরিহার্য্যতম অঙ্গ। সম্ভবতঃ ডাকঘর এবং মালিনী এর ব্যতিক্রম। যদিও ডাকঘরের জন্য 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কেবল তাই নয় যেহেতু নাট্যরচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সংঘাতময় ঘটনাসর্বস্ব বাস্তবতাকে গ্রহণ না করে ভাবময়তাকে বিষয়ীভূত করেছেন, সেইসূত্রে ভাবরূপকে ফোটাবার জন্য সংগীত তার প্রধান সহায়ক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই গেয়েছেন—'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি, তখন তারে চিনি তখন তারে জানি।' সুতরাং যে তত্ত্ব আভাসগম্য, কথায় যার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়, যে প্রতীক কেবলমাত্র সহৃদয়ের ইংগিতের অপেক্ষায় থাকে রূপে, বস্তুতে ভাষায় তাকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে চান নি। তাই গান তাই সুর। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কেবল গান গান নয়—চরিত্র বিশেষের অবসর বিনোদনের আনন্দ মাত্র নয়। যেখানে গান সুরাশ্রিত বিগলিত সংলাপ, সেখানে গান চরিত্রের ভাষ্য, ঘটনার দৌত্য, কাহিনীর ব্যাখ্যা—পরিবেশনের সূচীতত্ত্ব। সেখানে গান কখন কখনও স্বয়ং নাট্যকারেরই আনন্দরূপ। গিরিশচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে নাটকে গান ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সেভাবে করেননি। সেইজন্য নাটকে সংগীত ব্যবহারে প্রচলিত মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানের বিচার করা অবাস্তব, অসংগত ও হাস্যকর। গ্রীক নাটকের কোরাসের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতের তুলনা হয় না। কোরাসের গান কাহিনীকে হঠাৎ থামিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে যায়। যাত্রার বিবেকের গানের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান একটা স্বতন্ত্র জগতের নিজস্ব ভাষা, সেই তত্ত্বের জগতে,

কবিমানসের সেই অনির্বচনীয় জগতে যদি বুদ্ধি দিয়ে প্রবেশ করা না যায় তবে সুরের সাহায্যে প্রবেশ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই—

'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো..................।।'

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে সাধারণতঃ সব চরিত্রই অল্পবিস্তর গান গাইতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে—এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার প্রশ্ন অবান্তর। তবে এক জাতীয় ঠাকুর্দা আপন ভোলা উদাসীন অথচ জ্ঞানীবৃদ্ধ জাতীয় চরিত্রে মুখেই সঙ্গীতের বাহুল্য থাকে। বাউল, ঠাকুরদা, দাদামশাই, কবি ইত্যাদি নামের মূল ভূমিকাই এইরূপ সঙ্গীত প্রধান।

বিশু জীবনের প্রতি আসক্ত অথচ বৈরাগ্য ও উদাসীনতা তার বহির্বেশ। সংগীতই তার সংলাপ, ভাষাই তার ভাষা। সে সূক্ষ্মতাবাদী, সে দার্শনিক, তাই ঘটনা বা বিষয়ের বস্তু বা চরিত্রের নির্যাসটুকু সে অনায়াসে নিষ্কাশিত করে নেয়। বিশুর গান—

(১) 'মোর স্বপন তরীর কে'—মুখ্যতঃ নন্দিনী সম্পর্কে গীত। এই গানের মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে নারীর প্রেম ও সৌন্দর্য যে অনির্বচনীয়তার আভাস আনে এই গানে তার বন্দনা করা হয়েছে।

(২) 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে, তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে''—যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মদ্যাসক্তি প্রসংগে গীত। যক্ষপুরীর মানুষ নির্বীজ তাই মদ খাইয়ে তাদের চাঙ্গা করা হয়। অর্থাৎ নেশার দ্বারা তাদের ভুলিয়ে রাখা হয়। এইভাবে তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিশুব তত্ত্ব বৃহত্তর। বিশুর বক্তব্য 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে।' এইখানে সেই কথা বলা হয়েছে।

(৩) 'তোমায় গান শোনাবো'—নন্দিনী প্রসংগে গীত। কিন্তু এ গান শুধু নন্দিনীব বন্দনাই নয়, 'স্বপন তরীর কে' উক্ত গান উদ্দিষ্টের প্রতি ধাবমান। এই গানটি আত্মানুসন্ধানের গান। এই প্রত্যহের গ্লানিযুক্ত অবরুদ্ধ মারখাওয়া জীবনে চেতনা যখন অসাড় হয় তখনও কেউ জেগে থাকে কোন অনাগতের প্রত্যাশায়, নিবিড় দুঃখের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। সেই প্রত্যাশা এই গানে ফুটে উঠেছে। 'স্বপন তরীর কে' গানের জিজ্ঞাসা আছে—আর এই গানে আছে, প্রত্যয়, বিশ্বাস, আপন কর্তব্যবোধেব চেতনা-- 'তোমায় গান শোনাবো' এমনকি এই গানে বিশু নন্দিনীকেও জাগিয়েছে।

নন্দিনী —''যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।''

(৪) 'ও চাঁদ, চোখের জলে লাগলো জোয়ার'—প্রেমের গান। বিশু নন্দিনীকে ভালবাসত। কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় নীরবে পথ থেকে সরে এসেছে, তাই সেই গোপন ব্যথাব নীরব রাত্রি অবসানের স্মৃতি এই গানের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

(৫) 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে'—পথ চাওয়ার গান।

'ভালবাসি ভালবাসি'.......এই গানটি বিশু নন্দিনীকে শিখিয়েছে, নন্দিনী রাজাকে শুনিয়েছে। গানটি বাহ্যিক অর্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রেমের গান। প্রকৃতি ও মানব জীবন বিধৃত। এই ভূমিমেখলা পৃথিবীর প্রতি অনন্ত অনুরাগের চিরন্তন আকৃতি এই গানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু গানটির একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। গানটি বিভ্রান্তচিত্ত মনুষ্যত্ব বিমুখ রাজার স্মৃতি উদ্দীপক সংগীত। নন্দিনীকে রাজা কিছু পূর্বেই তার অন্ধকারশায়ী ব্যক্তিত্বের অসীম

রিক্ততার কথা বলেছে। নন্দিনী এসেছে রাজার কাছে— লুপ্ত ব্যক্তিত্বের কাছে জীবনের প্রতীক হয়ে। ধীরে ধীরে রাজার মধ্যে মুক্তি ও বন্ধনের সংগ্রাম জেগেছে। রাজা নন্দিনীকে বলেছে—'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা।.....আমি কত শ্রান্ত।'—আর ঠিক সেই পরম দুর্বল মুহূর্তে নন্দিনী গেয়েছে—'আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে, দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি'—রাজার অন্তরের সংগ্রাম সেই মুহূর্তে তীব্রতম হয়ে উঠেছে। রাজা চীৎকার করে বলেছে—'থাক্ থাক্ থাম তুমি, আর গেয়ো না। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ শাপের কাছে সাপুড়ের নিরন্তব বাঁশীর মত নন্দিনীর জাগরণের গান তখনও শোনা গেছে।

'সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী,
ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।'

রাজা আর সহ্য করতে পারেনি—পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম এই পালিয়ে যাওয়া রাজাকে প্রতিমুহূর্তে বিদ্ধ করবে, দগ্ধ করবে। তার সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং পূর্বতন মুক্ত স্বাধীন আনন্দময় জীবনের স্মৃতি রাজার চিত্তে উজ্জীবিত হয়েছে। ভুলে যাওয়া গানের বাণী এবং ভোলা দিনের কাঁদন হাসি রাজাকে শেষ পর্যন্ত জালের আবরণ থেকে মুক্ত করবে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপ্রধান প্রতীকী নাটকগুলির ভাবার্থ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নানাবিধ বিতর্ক আছে। রক্তকরবী নাটক সম্পর্কে প্রস্তাবনায় কবি স্বয়ং এমন কতকগুলি আপাত বিরোধী মন্তব্য করেছেন যার ফলে এই নাটকটিও বহুবিধ ব্যাখ্যা ও বিতর্কের কারণ ঘটেছে। রক্তকরবীর ভূমিকায় কবি বলেছেন—'এই নাটকটি সত্যমূলক। এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।'

এই মন্তব্যের আলোকে ঐতিহাসিক সত্য এবং কাব্যিক সত্য এই দুটি পৃথকসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্ত ঐতিহাসিক সত্য তাঁর আলোচ্য নয়—কাব্যিক সত্যই তাঁর বিচার্য্য। এখন এই দুই সত্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি এবং সত্যকে দুই পৃথক অভিধায় ভিন্ন করা যায় কি না ভেবে দেখতে হবে।

বিচ্ছিন্ন একক নাট্যসৃষ্টি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীকে বিচার করা যায় না। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এই উপাধির দ্বারা রক্তকরবীব রচয়িতার পূর্ণ স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যচেতনা তাঁর সমাজসত্তা ও ব্যক্তি সত্তা একই সঙ্গে তাঁর যে কোন সাহিত্যিক কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর সমাজ সচেতন কবি। জগৎ ও জীবনের প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি কাব্যসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বস্তুজীবনের চাঞ্চল্য তাঁর সারস্বত সাধনার উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। জগতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেদনও দার্শনিক। তিনি বস্তুকে তার স্বরূপে দেখেন না চৈতন্যে দেখেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বাস্তবধর্মী নাট্যকার

নন। ষোড়শী সমালোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ একবার শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকতো তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।'
এই পত্রের তারিখ ১৩৩৪ সাল। অর্থাৎ এর পূর্বেই ডাকঘর, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী রচিত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজে যথার্থ নাটক লিখতে পেরেছেন এমন দাবী করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাটক একান্তই রাবীন্দ্রিক। তাঁর নিজস্ব কবিভাবনা, দার্শনিক প্রত্যয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সামাজিক বিশ্বাস—এই সকলের সমাহার। সুতরাং বাস্তব জগতের তথ্য অবলম্বনের সংজ্ঞায় তিনি 'সত্যমূলক' শব্দটি ব্যবহর করেন নি। কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য এই শব্দটির প্রতি আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক বিচ্ছিন্ন বস্তুব মধ্যে কার্যকারণ শৃঙ্খলা এবং নিয়ম আবিষ্কার করেন। দার্শনিক জগতের নৈয়ায়িকতা অথবা উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে থেকে দার্শনিক সূত্র আবিষ্কার করেন। এইভাবে বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি সকল বিষয়েই এক একটি দর্শন গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী এবং দার্শনিক কবি। তিনিও বাহ্যজগতের অন্তরাল থেকে সর্বদা এই তত্ত্ব নিষ্কাশন করার প্রয়াসী বিশেষকে তিনি সেইজন্য নির্বিশেষ করে তোলেন, ব্যষ্টিকে সমষ্টির আলোকে দেখেন। তাই প্রেম তাঁর কাছে পথের আলো। শকুন্তলা নাটক একই সংগে তাঁর কাছে স্বর্গচ্যুতি এবং স্বর্গ পুনরুদ্ধারের। তাই যন্ত্রজীবনের সংঘাত তাঁর চোখে একটি ঝর্ণাব উপর বাঁধ বাঁধার মত। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে সঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁর পরিকল্পনায় যক্ষপুরীর মত। একেই তিনি সত্য বলেছেন। এই সত্যকে higher reality বা truth যাই বলা যাক না কেন—স্থপতি মন্দির নির্মাণ করেছে, দার্শনিক সেই মন্দিরের শিল্পকার্যের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার লীলা দেখেছে। একে যেমন philosophy of architecture বলা যায় রক্তকরবী নাটকেও সেইরূপ ধনতান্ত্রিক যুগের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার সঙ্গে কৃষি জীবনের সম্পর্ক কবির চোখে একটি Philosophy Sociopolitical thought এর সৃষ্টি করেছে। বিষয়টা বর্তমানেরই। যেমন ক্রোচে বলেছেন—

> 'Our civilization is materially truth spiritually barbarous. ravenous of wealth and utterly insincere to all that is good for life.'

একালের অনেক মনীষীর চোখেই বর্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার রূপটি ধরা পড়েছে। রাসেল একে আক্রমণ করেছেন। এলিয়ট একে শ্মশানের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নাটকের ইংগিতধর্মিতার সাহায্যে এই আত্মগর্বী, মদমত্ত, প্রাণঘাতী, বীভৎস সভ্যতার পরিণাম রচনা করেছেন। এর পেছনে আছে খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা, খানিকটা জীবন সম্পর্কে মহাকবির আশাবাদ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং সমাজের শুভ কল্যাণময় সমাজের বিশ্বাস, ফলে তাঁর সৃষ্টি সভ্যতার প্রতি শুধু ধিক্কার হয়নি—বর্তমানের প্রতি অকুণ্ঠিত গ্লানি হয়নি, তাতে আছে ভাবীকালের মহৎ সম্ভাবনা, অপবাজেয় মানবের চিরন্তন বিশ্বাস, মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থা। ফলে সাময়িক এবং চিরন্তন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সম্ভাবিত এবং সম্ভাব্য, real এবং

probable তাঁর দৃষ্টি জ্ঞানপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করেছে। যদি কেবল অভিজ্ঞতাকেই মন্তব্যহীন নিরাসক্তির সংগে চিত্রিত করতেন তাহলে সেই সৃষ্টি হত শুধু তথ্যমাত্র। কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞান, তথ্যের সংগে ভবিষ্যৎ বাণী যুক্ত হয়েছে সেখানে এই কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সত্য। মনে রাখতে হবে কবি কেবলমাত্র কাব্যস্রষ্টা অর্থে নয়—ঋষি অর্থে প্রযুক্ত।

রামায়ণ ব্যাখ্যায় এই কারণে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। রামরাবণের যুদ্ধকে তিনি আর্য অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষ হিসাবে দেখেছেন এবং সীতা তাঁর মতে মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা। এই কৃষিমূলক সভ্যতা ও যন্ত্রমূলক সভ্যতাই তাঁর ভাষায় কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। রক্তকরবীর নাট্যবস্তুর সংগে এই ভাবটিকে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। সেইজন্য যন্ত্রসভ্যতার প্রাণপুরুষকে তিনি রাবণ, নন্দিনীকে সীতার সংগে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

> 'কৃষিকাজ থেকেই হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে।'

তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা, দ্বেষ, হিংসা, বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসের মত। সুতরাং বক্তকরবী নাটকটি রামায়ণেব আদর্শে গড়ে ওঠেনি—আধুনিক যুগের এই সমস্যাব সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেই রক্তকরবী সত্যমূলক। মার্কিনদেশের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে কবিব চাক্ষুস অভিজ্ঞতা, ভারতবর্ষের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের সম্পর্কে তার বহুকাল সঞ্চিত জ্ঞান এই নাটকের সত্যভূমিকা রচনা করেছে।

বক্তকরবী পালাটি রূপক নাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ, বিবহ-মিলন, ভাল-মন্দ নিয়ে বিরোধেব কথা। মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্য চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা, এই বিবোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের আর একদিকে শ্রেণীগত মানুষের। 'আমার নাটক একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের ও মানুষগত শ্রেণীর। সুতরাং যক্ষপুরীব পটভূমিকায় একই সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ও একটি শ্রেণীগত কাহিনী আছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে এই যক্ষপুরী ও তার চরিত্রগুলি—সেখানকার ঘটনাগুলি কাল্পনিক। বাস্তব জগতের সংগে তার কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু শ্রেণীগত দিক থেকে এই নাটকটি সত্যমূলক।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'।

> 'অবসাদ বন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
> সে আনিয়া দেয় চিত্তে
> কলনৃত্যে
> দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
> বীণার তন্ত্রের মত গতি তার সংগীতস্পন্দিনী—
> নাম কি নন্দিনী।'

এই নন্দিনীর স্বরূপ কি? আমাদেব মনে হয় রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর চরিত্র পরিকল্পনায় দুটি উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হয়েছে। প্রথমতঃ নাটকের স্বাভাবিক গঠনে রাজা ও রঞ্জন এই দুটি অদৃশ্য ও অদৃষ্ট চরিত্রের দ্বারা এই নাটকের নায়কের ভূমিকা সম্পন্নের পর

নন্দিনীকে নাটকের নায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাজা ও রঞ্জনের সংগে নন্দিনীর সম্পর্ক নায়কের সংগে নায়িকার সম্পর্কের মতই। রঞ্জন সম্পর্কে রাজার ঈর্ষাও একান্ত মানবিক। সুতরাং নন্দিনী কাহিনী গঠনে নাটকের নায়িকা, নায়ক চরিত্রে অবয়বী অনুপস্থিতির জন্য নায়িকার প্রাধান্য ঘটেছে। যেমন রাজা নাটকে নায়ক একজন কিন্তু তিনি অদৃশ্য। তাই নায়িকারই প্রাধান্য ও সেখানে নায়িকা দুইজন সুদর্শন ও সুরঙ্গমা (নাম সাদৃশ্য লক্ষণীয়), রক্তকরবী নাটকে নায়ক দুইজন রাজা ও রঞ্জন (নাম সাদৃশ্য লক্ষণীয়) এবং নায়িকা একজন। দ্বিতীয়তঃ, ভাবমূল্যের দিক থেকে নন্দিনীর সম্পর্ক চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিকতার সাহায্য নিয়েছেন, তত্ত্ব আরোপ করেছেন।

নন্দিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্দ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।' রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর পরিবেষ্টনে পুরুষ নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় নিযুক্ত। এখানে যে নারী আছে তারাও যথার্থ পুরুষের জীবন সঙ্গিনী নয়, স্বর্ণমৃগের নেশায় বশীভূতা। সুতরাং চন্দ্রাজাতীয় নারীকে নারী বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চান পুরুষের সঙ্গিনীর যথার্থ স্বরূপ কি? সোনার নেশা নয় আনন্দ দানই নারীর কর্তব্য। সুতরাং তাই নারীকে সাধারণভাবে নন্দিনী বলা যায়। এইজন্য যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আগমন ঘটায়—'পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল', এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

তত্ত্বের দিক থেকে নন্দিনী আংশিক সাংকেতিকতার লক্ষণাক্রান্ত। নন্দিনী লীলাময় প্রাণের প্রতীক। প্রাণের লীলার সহজপ্রকাশ আনন্দের মধ্যে। এইজন্য আনন্দকে সহজিয়া বলা যায়। আনন্দের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সৌন্দর্যে ও প্রেমে, সহজ সম্পর্কে ও মুক্তিতে। রাজাকে অন্ধকার মনুষ্যত্বপিষ্ট জাল থেকে মুক্তি, বিশুকে তার আত্মভোলা ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি, কিশোরকে তার কৈশোরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, সর্দারকে তার অহমিকা থেকে মুক্তি, অধ্যাপককে তার তত্ত্বসর্বস্ব জ্ঞান থেকে মুক্তি দেবার নামই নন্দিনী। জীবনে, সংসারে, সৌন্দর্য ও প্রেম আনে নারী। নাটকে এই সার্বভৌম মুক্তি কামনাকে 'নন্দিনী' নামক নারীভূমিকার মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে মানবী বলেছেন। মানবী অর্থে নন্দিনী চরিত্রে বাস্তবতার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আগমন রাজার সঙ্গে তার অবিরাম সংলাপ, অন্যান্য চরিত্রের সংগে তার সাময়িক কথোপকথন—নন্দিনীর মুখে রঞ্জনের পুনঃ পুনঃ নাম শুনে রঞ্জন সম্পর্কে রাজার ঈর্ষা ও ক্রোধ, নন্দিনী কর্তৃক রঞ্জনের আগমন সংবাদ ঘোষণা করা, নন্দিনীর চরিত্র সম্পর্কে সর্দারদের দুশ্চিন্তা ও রাজার দুর্বলতা এবং শেষ পর্যন্ত কারাগার ভেঙে নন্দিনীর সংগে রাজার মিলন ঘটনার দিক থেকে মানবী নন্দিনীর এইটুকু মাত্র পরিচয়। কিন্তু রক্তকরবীর কাহিনী নিয়ন্ত্রণে নন্দিনীর কোন ভূমিকা নেই। রাজার আত্মদ্বন্দ্ব ও অন্তর দুর্বলতা পূর্বকৃত। নন্দিনী তাকে বর্ধিত করেছে মাত্র। যক্ষপুরীর শ্রমিকদের উপর অত্যাচারই তাদের বিদ্রোহের কারণ। রঞ্জনকে হত্যা করেই রাজা জাল থেকে বাইরে এসেছে। যক্ষপুরীর সকলের প্রতি নন্দিনীর ব্যবহার একই প্রকারের। সেখানে তাত্ত্বিক

সহানুভূতি আছে, হৃদয়গত অনুরাগের হ্রাস বৃদ্ধি নেই। রঞ্জনেব প্রতি প্রেমও তত্ত্বগত। যৌবনের প্রতি প্রাণের স্বাভাবিক অনুরাগ। তাই তত্ত্বময়ী নন্দিনী অনায়াসে মৃত রঞ্জনের দেহের উপর রক্তকরবীর মঞ্জরী রেখে রঞ্জনের হত্যাকারী রাজাব হাতে হাত রাখে। সুতরাং চরিত্র হিসাবে নন্দিনী যতখানি বাস্তব ততখানি সাংকেতিক।

মাঞ্চেষ্টাব গার্ডিয়ানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নন্দিনী চরিত্রে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে— Nandini abstraction নয়, তাঁর ভাষায় 'Nandini is a real woman who knows that wealth and power are Maya and that the highest expression of life is in love.' কিন্তু এই উক্তি নাটকে সত্য হয়ে ওঠেনি। ধনসম্পদের তুলনায় প্রেমের প্রতি আকর্ষণই তার জীবনের বৈশিষ্ট্য হলেও তাব আচরণে individual features কম—তা অস্বীকার করা যায় না। রঞ্জনের প্রতি অনুরাগ রাজায় স্থানান্তরিত হওয়ার আকস্মিকতাই তার চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেছে। তাছাড়া সমগ্র নাটকের পরিবেশ স্থান কাল এবং চবিত্রগুলি abstract হয় তবে একটিমাত্র real character বাস্তবতা রক্ষা করতে পারে না।

'অলকে তার একটি গুছি
করবী ফুল রক্তরুচি।
নয়ন করে কি ফুল চান
নীল গগনে দূরে দূরে।।'

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায়, গানে, নাটকে, চিত্ররচনায় রক্তকরবীর বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। কবিদের কাছে স্বভাবতই পুষ্প সংকেতের দ্যোতক। শেলীর ফুল অশরীরী ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের প্রতীক। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফুল জাগতিক সৌন্দর্যের নিগূঢ়তার প্রতীক, কীটসের কাছে পুষ্প জীবনেব নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য উপভোগের করুণ ব্যঞ্জনা, দেবেন্দ্রনাথের ফুল দেহবাদী সৌন্দর্যভোগেব প্রতীক। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আফিমের ফুল বিপদের রক্তনিশানা। রবীন্দ্রনাথের ফুল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। এদেব মধ্যে রক্তকরবী প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের ঘনীভূত নির্যাস।

যান্ত্রিক জীবনের জড়বাদ জীবনের সহজ সৌন্দর্য ও অবিরাম আনন্দকে নিষ্পেষণ করে। যন্ত্রের দ্বারা অপচয়িত জীবনেব প্রতি কবিব বেদনাবোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। রক্তকরবী নাটকে কবি বাস্তব সমাজের এই অভিজ্ঞতাটিকে একটি প্রতিভাসিত সত্যে বিন্যস্ত করেছেন। যক্ষপুরী বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি, নন্দিনী কবির আদর্শবাদের সৃষ্টি। সুতরাং রক্তকরবী নাটকে রক্তকরবীর নাট্যগত সার্থকতা নন্দিনীর চারিত্রিক প্রয়োজন ও স্বরূপের উপর নির্ভবশীল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বক্তকরবী নাটকের সূচনায় কবি এর নামকরণ করেছিলেন যক্ষপুবী, তারপর নন্দিনী ও সবশেষে রক্তকববী নামটিকে বজায় রাখা হয়েছে। ভাবগত দিক থেকে রক্তকরবী ও নন্দিনীর মধ্যে যোগসূত্র আছে।

যক্ষপুরীর যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আধুনিক চেহারার একটি সংশোধিত নাট্যরূপ। নন্দিনী এই সমাজব্যবস্থার কবির মানসকন্যারূপে একটি প্রাণপূর্ণ চিৎশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। চিৎশক্তির দুটি দিক আছে—একদিকে সে রসজ্ঞ জীবনের সৌন্দর্য

মাধুর্য উপভোগ করবার জন্য উৎসুক, অপরদিকে সে ভাবগত, চেতনার সাহায্যে সে জানবার প্রয়াসী। নন্দিনী একাধারে মাধুর্যের উৎস ও প্রগতির প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে একই সংগে এই দুই কোটিতে স্থাপন করেছেন। নির্বীয প্রাণ শক্তির কাছে নন্দিনী মুক্ত সহজ আনন্দময় জগতের হাতছানি। অন্যদিকে শোষণ শক্তির কাছে সে ভীতির প্রতীক। সে অপরাজেয় মানবাত্মার জয় ঘোষণা করে। এই প্রথমটির নাম নন্দিনী দ্বিতীয়টির নাম রক্তকরবী। এককথায় নন্দিনী সেই শক্তির প্রতীক যে শক্তি মানুষের মরণশীলতায় প্রাণসঞ্চার করে, অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমান থেকে মানুষকে রক্ষা করে। রক্তকরবী ফুলটি সেই অন্তরের শক্তির প্রতীক, নন্দিনী তার মন্ত্রসাধিকা। রূপকথার রাজকন্যার প্রাণ যেমন দৈত্যপুরীর দুর্ভেদ্য পেটিকায় গোপন থাকে, নন্দিনীর প্রাণশক্তিও সেইরূপ রক্তকরবী ফুলের রূপ ধরে সকলকে আনন্দিত অথচ প্রয়োজন মত ভীত করেছে।

অনেক যন্ত্রণা, পেষণ ও অবরোধ ভেদ করে একটি ফুলের জন্ম হয়। ফুলের পাপড়ির সেই রক্তরাগ মাটির গোপন যন্ত্রণারই রক্তরুচি। প্রকৃতির হাতে যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই কারণ প্রাণের কি মৃত্যু হয়? সেও সেই ফুলের মতই অবরোধের জঞ্জাল ভেদ করে মাথা তুলেছে। তাই নন্দিনীর সংগে রক্তকরবী ফুলের আরোপতা সার্থক হয়েছে।

নন্দিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—'চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।' রক্তকরবী নাটকে একটি ফুলের গাছের ইংগিত আছে যার সন্ধান কিশোর জানে। এই গাছটি একান্তই তার গোপন সংবাদ। কিশোর নন্দিনীকে বলেছে—"তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না ....ঐ গাছটি থাক্ আমার একটি মাত্র গোপন কথার মতো!..........এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব—এ আমারই নিজের ফুল......ওদের মারের মুখের উপর দিয়ে রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।' নাটকে চন্দ্রা বলেছে—বিশুকে 'নন্দিনীতে পেয়েছে' কেবল বিশুকে নয়, সব চরিত্রই অল্পবিস্তর নন্দিনীর দ্বারা আবিষ্ট, তেমনি রক্তকরবী ফুলের স্পর্শও অন্যান্য চরিত্রে সংক্রামিত হয়েছে। অধ্যাপকের মনে হয়েছে নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর আভরণের কিছু একটা মানে আছে। ঐ রক্ত আভায় একটা ভয় লাগানো রহস্য আছে।

কিন্তু নন্দিনীর কাছে রক্তকরবীর অন্য একটি অর্থ আছে। নন্দিনীর ভাষায়—'রঞ্জন আমাকে কখনও কখনও আদব করে বলে রক্তকরবী। জানিনে আমার কেমন মনে হয়। আমার রঞ্জনের ভালবাসার রঙ রাঙা। সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' সুতরাং রক্তকরবীব যুগপৎ দুই উদ্দেশ্য। মাধুর্য এবং ভয় লাগান রহস্য। নন্দিনীও দুই উদ্দেশ্যের প্রতীক। রঞ্জন তথা যৌবনের প্রতি প্রাণের প্রেম এবং যক্ষপুরীর অবরুদ্ধ মানুষগুলির শক্তিব প্রেরণা। সুতরাং এই দিক থেকে বক্তকরবী ও নন্দিনী অভিন্ন।

রাজা জালের অন্তরালে থাকে কিন্তু জালের বাইরে তার দৃষ্টি আছে। নন্দিনীর রক্তকরবী ফুলের সংগে রাজাবও পরিচয় ঘটেছে। সর্দার বলেছে রক্তকরবী নন্দিনীর হৃদয়ের দান। রাজার উক্তি—'ঐ ফুলেব গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত

আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনও ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তাহলে হয়ত আমি সহজে মরতে পারব।'

নাটকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রক্তকরবী ফুল সম্পর্কে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এই প্রকার মতামত শোনা যায়। এইগুলি সংক্ষেপে—

(১) রক্তকরবী রঞ্জনের ভালবাসার প্রতীক।

(২) রক্তকরবীর রক্তরাগে যক্ষপুরীর ভবিষ্যৎ পবিবর্তনের ইংগিত তথা ভয় লাগান রহস্য।

(৩) কিশোরের নির্বাক সহিষ্ণু পীড়ন সহ্য কবা জীবনের আনন্দের প্রতীক।

(৪) রাজার শনিগ্রহ।

নাটকের শেষ কটি মুহূর্তে রক্তকরবী কেবল ফুল নয় একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নাটকের দ্রুত সংঘটিত ভূমিকায় রক্তকরবী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ কবেছে। কিশোর রঞ্জনকে রক্তকরবী ফুল দেবে এইরূপ কথা ছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে বাজার জাল উদঘাটিত হবার পর দেখা গেল রঞ্জনের মৃতদেহ, তাব হাতে মাথায় রক্তকরবীর মঞ্জরী কিশোর প্রদত্ত। এই ফুল দিয়ে কিশোর তার ঔদ্ধত্য দিয়ে রাজাকে আঘাত করেছিল। রাজার প্রচণ্ড শক্তির কাছে সে বুদবুদের মত উড়ে গেছে। তারপর লড়াই বাঁধল মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের। রাজা তাঁর বহুসঞ্চয়ী বহুগ্রাসী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ধ্বজা ভাঙলেন প্রলয় পথের দীপশিখা নন্দিনীর হাতে হাত বেখে। সর্দারদের বক্ষণশীল ক্ষমতার সংগে রাজার যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠলো। অর্থাৎ যক্ষপুরীর চিরকালীন যন্ত্রজীবনে পরিবর্তনের ইংগিত দেখা গেল। সর্দারদেব শোভাযাত্রার পুরোভাগে সর্দারদের বর্শার গায়ে ঝোলান রয়েছে কুন্দফুলের মালা। নন্দিনী বলল—'ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।' সর্বশেষ দৃশ্যে ফাগুলাল ও বিশু যখন সর্বাত্মক বিপ্লবেব অধিনেত্রী নন্দিনীর জয়ধ্বনি করছে তখন দেখা গেল তার হাতের রক্তকববীব কঙ্কণ ধুলায় লুটচ্ছে। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। ফাগুলাল বলেছে—'তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।' এই উক্তি স্পষ্টতঃই নন্দিনীর মৃত্যু ঘোষণা করে। অভিজিতের মৃত্যু ঘটেছিল কিন্তু মুক্ত জলধারায় তাব জীবনের চিরন্তন প্রাণপ্রবাহ রক্ষিত হয়েছে। মানুষ নন্দিনীর মৃত্যু হলেও বেঁচে আছে তার প্রাণরূপ রক্তকববীর ফুল, তার শেষ দান। কবির ভাষায়—'নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে ভাই মরিনি তো, আমাকে মারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা ছিল। নাটকটিতে তাই যক্ষপুরী নন্দিনী বলে আমার মন তৃপ্ত হয়নি—তাই নাম দিলাম রক্তকরবী।'

'পুনশ্চ': গদ্য রীতির স্বরূপ ও সার্থকতা

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম গদ্যছন্দে কাব্যচর্চাব পরীক্ষা করেন এবং 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' এই চাবখানি কাব্যেব ছন্দকে তিনি গদ্য নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৩৬ সালের পর দু-একটি দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর গদ্যকবিতা লেখেননি।

আমাদের মনে হয় পুনশ্চে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখার প্রেরণাগুলি নিম্নরূপ—

(১) আধুনিক ইংরাজী কবিতার পর্ব স্বাধীনতা। হুইটমান উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর ইংরাজী কাব্যে গদ্যছন্দের প্রবর্তন করেন। বিশ শতকের ইয়েট্‌স্, হপকিনস্, এলিয়ট, স্পেনডার, অডেন প্রভৃতি কবিরা এই ছন্দকে ব্যবহারে প্রতিষ্ঠা দান করেন।

(২) সংস্কৃত গদ্যে হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্বরের উত্থান পতন, বিদর্ভী রীতির ধ্বনি স্পন্দন, বাণভট্টের ধ্বনি গাম্ভীর্য যুক্ত গদ্যরীতিও রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের অন্যতম প্রেরণা। পত্রপুটে 'পৃথিবী' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(৩) 'The Child' এর বঙ্গানুবাদ।

(৪) সাহিত্যে আধুনিকতাব আন্দোলন, আধুনিক কাব্যে বাস্তবতার প্রবর্তনা, কবিতাকে নূতন সাজ পবাবাব চেষ্টা, তরুণ কবিদের কাব্যানুভূতি ও বিশ্বাসেব প্রভাব।

(৫) রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বাভাবিক ছন্দ বিবর্তন, নানাবিধ ছন্দযুক্তির তথা ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ধীবে ধীরে ভাবছন্দের প্রবর্তনা।

(৬) কাব্যের প্রাণকেন্দ্র আবিষ্কাব কবির চিরন্তন কৌতূহল। কবিত্বের মূল উৎস কোথায় তার আবিষ্কারে আগ্রহাতিশয্যে জীবনের নানা পর্বে বহু দুঃসাধ্য পবীক্ষায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

এই প্রেরণাগুলি কোনটি সাময়িক ভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে কিন্তু প্রতিটিরই স্বতন্ত্র মূল্য আছে। গদ্যছন্দ প্রসঙ্গিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বারবাব চতুর্থ প্রেরণাটার উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু অন্যান্য কাবণগুলিকে অস্বীকার করা যায় না।

এখন প্রশ্ন, এই কাব্যেব ক্ষেত্রে কবিতার এই ব্যবহারিক রূপকে তিনি কেন অস্বীকার কবলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

(১) 'কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে , তাকেই বলে ছন্দ ; গদ্যের বাছবিচাব নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যেব প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত'।

(২) 'যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য, কাব্য প্রাত্যহিক

সংশয়ের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতখানি দূরে ছিল এখন তা নেই। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে।'

(৩) 'কাব্যকে বেড়া ভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তাহলে সাহিত্য সংসাবের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যেব দিক, তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়।'

(৪) 'গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।'

আলোচ্য মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—ছন্দের অভ্রান্ত নিযমানুগত্যের মধ্যে কবিতা খানিকটা সংকুচিত হয়। শেষ বয়সে ববীন্দ্রনাথ কবিতার অপরিহার্য কতকগুলি স্বভাবকে বর্জন করে কাব্যকে যুক্তিমূলকতার দিকে নিযে আসছিলেন। বলাকা পলাতকাব ছন্দে চরণের দাসত্ব থেকে কবিতাকে মুক্ত করা হয়েছে। পুনশ্চের পূর্ববর্তী পবিশেষ কাব্যের—'আগন্তুক' 'ভাবতী' 'সাথী' প্রভৃতি কবিতায় মিলহীন প্রবহমানচরণ সৃষ্টি করে কবিতাকে গদ্যের অনেক নিকটবর্তী করা হয়েছে। পুনশ্চের 'বাঁশি' কবিতাটি উক্তরীতিতেই রচিত। পুনশ্চের ভূমিকায কবি বলেছেন—

> 'পদ্যকাব্যে ভাষাব ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ ও সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যবীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।'

এই বিশ্বাস থেকেই 'পুনশ্চ' কাব্য সৃষ্টি। এতকাল কাব্য যেন আদিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিকতার বাহন ছিল। এখন গদ্য ছন্দে যেন আদিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসান হয়েছে। সেজন্য প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, দৈনন্দিন প্রসঙ্গ, মুহূর্তের অনুভূতি, অবহেলিত অপাঙক্তেয় লোকচিত্র, চোখ এড়িয়ে যাওযা চলতি ছবি, অবান্তর উপাদান পুনশ্চ কাব্যে অধিকার করেছে। পুনশ্চের ঠিক পূর্ববর্তী কাব্য 'পরিশেষে'র 'প্রণাম' কবিতা। সেখানে তিনি বলেছেন—

> 'নিখিলেব অনুভূতি সংগীত সাধনা-মাঝে রচিযাছে
> অসংখ্য আকৃতি। এই গীতিপথপ্রান্তে হে
> মানব, তোমাব মন্দিরে দিনান্তে এসেছি আমি
> নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে আরতির সান্ধ্যক্ষণে,
> একের চরণে বাখিলাম বিচিত্রেব নর্মবাঁশি—
> এই মোর রহিল প্রণাম।'

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে অনুভূতির তীব্রতাই এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিব কাব্যত্বের একমাত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> 'যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।"

সুতরাং গদ্য বা পদ্য বহিরঙ্গ রূপমাত্র। কাব্যত্ব তার উপর নির্ভব করে না। 'গদ্য কবিতার

কাব্যত্ব' বা 'বচনাতীতের আস্বাদ' তার সমাপ্তির করুণ আবেদনে, বর্ণনার শিথিলতার মধ্য দিয়ে উৎপন্ন কোন কোন বিদ্যুৎচকিত মন্তব্যে, অপাংক্তেয় চরিত্রে গভীর ব্যর্থতার উদ্‌ভাসনে। একটি মুহূর্তের তুচ্ছতার মধ্যে নিহিত কোন চিরন্তন বেদনার উদঘাটনে নিহিত থাকে।

বিশেষকে অবলম্বন করে সামান্যে পৌঁছান। যথা-হরিপদ'র জীবনকে কেন্দ্র করে অনাদি কালের মানুষের বিরহ বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই দৃষ্টিতে বিচার কবলে— কোপাই, অপরাধী, শেষদান, কোমল গান্ধার, স্মৃতি, ছেলেটা, বিশ্বশোক, বালক, কীটের সংসার, অন্তঃপুরের মেয়ে, একজন লোক, বাঁশি এই কবিতাগুলিতে বিশেষের কথা, বিশেষ ব্যক্তির নাম, সংজ্ঞা, দুঃখ, দেশ-কাল বর্ণিত। কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতার আবেদন শেষ পর্যন্ত পাঠক চিত্তে একটি নির্বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে। সমস্ত কবিতা পাঠের পর এই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সমগ্র কবিতা পাঠের পর এই অনুভূতি আসে। এই অনুভূতি কোন বঞ্চিতেব দুঃখজাত একটি সহানুভূতি পরায়ন দীর্ঘশ্বাস। একটি মৃদু অকথিত বেদনা হয়তো তাব বেশি নয়। কিন্তু সমস্ত মনকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখে। একেই রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয় বলেছেন। ধরা যাক 'সুন্দর' কবিতাটি। এই কবিতায় কোন বস্তু নেই। কতকগুলি টুকরো টুকরো স্মৃতি, এলোমেলো ছবি, বিশৃঙ্খল কয়েকটি অনুভূতি। ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার পক্ষে এই অনুভূতিগুলির কোন মূল্য নেই। কিন্তু গদ্য কাব্যের কবি এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তুকে কেন্দ্র করে সৌন্দর্য্যর সৃষ্টি করতে পারেন। এই যে নানা এলোমেলো অসংলগ্ন চিত্র ও দৃশ্যখণ্ডের মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া অতীতের একটি মুহূর্তের বিহ্বল অনুভূতি ও স্মৃতিটুকুই অনির্বচনীয়ত্ব 'প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।' এই স্মৃতি খুবই তুচ্ছ এবং একটি বিশেষ অতীতের। কিন্তু এক মুহূর্তে কবির কাছে মনে হয়েছে—

'এই আকাশবীণায় গৌড়সারেঙের আলাপ—
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।'

এই সর্বকালের নেপথ্য এবং অনাদিকালের বিরহ বেদনা ভাষার দিক থেকে অভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যে সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনটিকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলেছে যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্য বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্য শ্রেণীতেই গণ্য করি অথচ চেহারায় সে গদ্যের মত হতেও পারে। তাব মধ্যে বেসুর আছে। প্রতিবাদ আছে নানা প্রকার বিমিশ্রতা আছে। সেই জন্যই চরিত্রশক্তি আছে।'

সহযাত্রী, শেষ চিঠি, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, কীটের সংসার, খেলনার মুক্তি—এই কবিতাগুলিতে কবির ভাষাই প্রতিদিনের সংসারেরই ছবি। কিন্তু এগুলি কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সহযাত্রীর চারিত্রিক অসংগতি ও দৃষ্টিকটুত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তার একটি character ফুটে উঠেছে। সেখানেই এ কবিতাব কবিত্ব। শেষ চিঠি কবিতার সমস্ত অসুন্দর অতি সাধাবণ বর্ণনাকে অতিক্রম কবে একটি অবোধ বালিকার শেষ মুহূর্তে অন্তিম অথচ অন্তরঙ্গ অতিসাধারণ অথচ পৃথিবীব করুণতম একটি ইচ্ছা যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে—'তোমাকে দেখতে বড়ডো ইচ্ছা করছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা বচন অনির্বচনের সদ্যমিলনের পরিভূষিত উৎসব। এখন থেকে সাহানা রাগিনীটা অশ্রুত বাজবে।' পুনশ্চের অধিকাংশ কবিতাতেই কাব্যরস প্রত্যক্ষ গোচর নয়। এখানে বাক্যেরই সমষ্টি অবাক্ কেবল সূক্ষ্মশ্রুতিগোচর মাত্র। যথার্থ সহৃদয় সংস্কারমুক্ত উদার কবিচিত্ত থাকলে তবেই পুনশ্চ গদ্য কাব্যের কাব্যরসের অশ্রুত সাহানা রাগিনী শোনা যাবে। এগুলি ঠিক ব্যাখ্যা করার সামগ্রী নয়।

পুনশ্চের 'কোপাই' কবিতাটি অবলম্বন করে কবিরচিত এই গদ্যছন্দের একটি ব্যবহারিক সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোপাই গদ্যছন্দের সার্থক চিত্রকল্প। উক্ত কবিতায় নদীর উপমানে গদ্যছন্দের নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া যায়—

(১) গদ্য ছন্দ অশাস্ত্রীয় অনার্য, প্রাচীন গোত্রের গরিমাহীন।

(২) গদ্যছন্দ কাব্যও গদ্যের মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করে যদিও কবিতার সৌন্দর্য ও গদ্যের বলিষ্ঠতা, কবিতার লালিত্য ও গদ্যের কাঠিন্য এই ছন্দে আছে।

(৩) গদ্যছন্দের ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা, তাকে সাধু ভাষা বলে না।

(৪) গদ্যছন্দ সহজ ও গম্ভীর, প্রসন্ন ও প্রচণ্ড উভয়রূপই ব্যক্ত করতে পারে।

(৫) গদ্য ছন্দের পথ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের শোভাযাত্রাকে পরিচালিত করা যায়।

প্রথম লক্ষণটি আলোচনা করলে বলা যায় গদ্যছন্দ কাব্যের কনিষ্ঠ বাহন এবং কবিতার ইতিহাসে অর্বাচীন এ বিষয়ে মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় লক্ষণ সম্পর্কে বলা যায়—পুনশ্চের অধিকাংশ কবিতার দৃশ্যরূপটি গদ্যময়। বাক্যগুলি গদ্যেরই। ইচ্ছামত কবিতার চরণগুলি খণ্ডিত করে তাদেব প্রবহমান করা হয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন—

> "অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে ইহাদিগকে বিন্যস্ত না করিয়া ছদ্মবেশ বর্জিত গদ্যেব রূপে ইহাদের কি ক্ষতি হইত বুঝা যায় না।'

প্রকৃত পক্ষে এই গ্রন্থের ভাষা ও বাক্য প্রায়শ গদ্যেরই ব্যাকরণ সম্মত। কেবল ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তনের ঈষৎ শিথিলভাবে প্রযুক্ত গদ্যচ্যুতির মনোভাব দেখানো হয়েছে।

যথা— 'মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে।
বেলা হত আলস্যে শিথিল।'

[অস্থানে]

অথবা

'নাম তার কমলা,
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা।'

[ক্যামেলিয়া]

সমগ্র কবিতায় অনুভূতিব তীব্রতাই এই কবিতাগুলির কাব্যত্বের একমাত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য যেরূপেই আসুক
তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙমুখ হব না।'

সুতবাং গদ্য বা পদ্য বহিরঙ্গ রূপমাত্র। কাব্যত্ব তার উপর নির্ভর করে না। 'গদ্য কবিতার কাব্যত্ব' বা 'বচনাতীতের অতীত' তার সমাপ্তির করুণ আবেদনে বর্ণনার শিথিলতার মধ্য দিয়ে উৎপন্ন কোন কোন বিদ্যুৎ চকিতমন্তব্য, অপাংক্তেয় চরিত্রে গভীর ব্যর্থতার উৎভাসনে একটি মুহূর্তের তুচ্ছতার মধ্যে নিহিত কোন চিরন্তন বেদনার উদ্ঘাটনে নিহিত থাকে।

তৃতীয় লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা যায়, গদ্যছন্দের ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা, 'কোপাই' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

' কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।'

পুনশ্চ কাব্যে এই ভাষার গান ও গৃহস্থালী আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে। অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ বা তুচ্ছপ্রসঙ্গ। কিন্তু তার সর্বাঙ্গে তিনি মাখিয়ে দিয়েছেন একটি অনবদ্য বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও অলংকারের লাবণ্য যার ফলে গৃহস্থালিও সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। ফলে ব্যবহারিক মুহূর্তেই তার তুচ্ছতার আবরণ অপসারিত করে কাব্যত্ব লাভ করেছে। কোথাও ভাষা অত্যন্ত প্রাকৃত; শব্দ নিতান্তই ঘরোয়া, শব্দপ্রয়োগে কোন বিচার নেই কিন্তু সেই মৌখিক আলাপের ভঙ্গি সাময়িক বর্ণনার মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অলংকৃত বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়—

'শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর উপর ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনেব মতো।' (খোয়াই)

ছন্দের ললিত লাবণ্যের মধ্যে প্রসাধন কলার মধ্যে যে মানব মহিমা ধরা দেয়নি তাকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন তিনি। ফেলে দিলেন জীর্ণ বসন, নেমে এলেন গদ্যের বন্ধুর পথে। এই অবস্থার মধ্যে গদ্যছন্দের আবির্ভাব ঘটেছে। এইভাবে তিনি কাব্যের সীমানা বাড়িয়ে দিযেছেন।

'পুনশ্চ' গদ্যছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য। এই গ্রন্থে বৃত্তপ্রবাহধৃত অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত প্রথাগত পদ্যছন্দে দু-একটি কবিতা থাকলেও এই গ্রন্থ গদ্য কবিতারই

সংকলন। প্রকাশে ও প্রস্তাবে, ঋতু ও রীতিতে, বক্তব্য ও ভঙ্গিতে পুনশ্চ রবীন্দ্রকাব্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

প্রাক-পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রবীন্দ্র কাব্যধারার কয়েকটি স্তরভেদ লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যোন্মেষ কাল থেকে চিত্রা চৈতালী পর্যন্ত যে স্তর যেখানে আছে কবির এই জগৎ ও জীবনকে জানবার কি আকুল আগ্রহ। পৃথিবীর মাটি, জল, গাছপালা, পাখি, সমুদ্র, নদী, মানব, বিচিত্রময়ী নারী, প্রভৃতি তাঁর কবিচিত্তকে এক সৌন্দর্য্যময় লোকের নিরুদ্দেশ যাত্রায় টেনে নিয়ে গেছে। কবি মানসের এক সুতীব্র অনুভূতির প্রকাশ এই যুগের বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। এর পরের যুগ আধ্যাত্মিকতার যুগ। 'খেয়া' থেকে 'গীতালী' পর্যন্ত এর পরিক্রমাপথ। এ যুগের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য জীবনের দিকচক্রবালে যে প্রকৃতি ও মানুষ বিরাজ করতো অধ্যাত্মযুগে তা বিলীন হলো কোন এক মায়াস্পর্শে। কবিপ্রাণ পূর্ণ হল ভগবদ্ উপলব্ধির অমৃতরসে। বৈচিত্র্য পিয়াসী কবিচিত্তের বৈশিষ্ট্য হল—কোন বিশেষ ভাবচক্রে বেশিদিন আবর্তিত না হওয়া, অপার্থিব প্রিয়তমের সঙ্গে যে লীলা রসে মগ্ন ছিলেন সেই তন্ময়তাকে অতিক্রম করে তিনি ফিরে এলেন 'বলাকা'র যুগে। বিস্মৃতপ্রায় এই প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ও মানুযের সুখ-দুঃখের প্রতি কবি সচেতন হয়ে উঠলেন। বলাকা পূর্ববর্তী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ ও জীবনকে দেখেছিলেন, সে জগৎ ও জীবন সম্পূর্ণ ছিল কাব্যের। কিন্তু বলাকাব জগৎ শুধু কাব্যেব নয়, কাব্যদর্শনের। এ যুগপ্রবাহ শেষ হল 'পরিশেষে'। কবির কণ্ঠে যে মাটির ডাক পৌঁছেছিল, সেই ডাকে সাড়া দেবার আন্তরিক উদ্দীপনাই এ পর্বের বৈশিষ্ট্য। তবুও তাঁর মনের মনিকোঠা একটা পরিতাপের গোপন কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। তাঁর এই বিবাট কাব্যজীবনে যে তুচ্ছ, নগণ্য অতিসাধারণ বস্তু ও মানুষের স্পর্শ তিনি এড়িয়ে গেছেন সেই অপূর্ণ জীবনবোধ থেকেই কবি অনুভব করেছিলেন—

> 'আমার কবিতা জানি আমি
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'

সুতরাং কবিতাকে সর্বত্রগামী করার প্রয়াসই হল 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকা। যে মানুষ এতকাল কবির জীবন তোরণের অন্তরালে ছিল, পুনশ্চে তারা কবির অন্দর মহলে হাজির হয়েছে। পুনশ্চের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ এমনকি মনুষ্যত্বের, প্রাণী পর্যন্ত এই কাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। দরিদ্র, গৃহস্থ, অফিসের কেবানী, ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে, মাঠের চাষী, ছেঁড়া ছাতিমাথায় তিনটাকা মাইনের গুরুমশাই—গদ্য ছন্দরূপ কোপাই নদীর অগভীর স্রোতের বালি, পাথর, তারাই মাড়িয়ে এসেছে। অপরাধী তিনু, পরের ঘরে মানুষ অযত্নে বর্ধিত আগাছার মতো ছেলেটা, জাহাজের করুণার পাত্রী অদ্ভুত সেই সহযাত্রিটি, হিরন মাসির বোনপো, সাঁওতাল পরগণার গৃহস্থ পরিচারিকা, খোপায় ক্যামেলিয়া গোঁজা সেই মেয়েটা, বিধাতার শক্তির অপব্যয় অন্তঃপুরে মালতী, আধবুড়ো হিন্দুস্থানী, বকুর কাকিমা, হঠাৎ নামকরা সাহিত্যিক, সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী—এই চরিত্রগুলির মধ্যে সেই মানবমহিমাকেই ব্যক্ত কবা হয়েছে। এই কারণে শালিক, মাকড়শা, পিঁপড়ে রাস্তাব কুকুর এদের প্রতিও কবির মমতা বর্ষিত হয়েছে।

'কোন দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে, আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি'

এক সুতীব্র অনুশোচনা মর্মান্তিক ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। পুনশ্চ কাব্যে কবিকল্পনাব নিরক্ষরেখার একপ্রান্তে রয়েছে এই সমস্ত মনুষ্যেতর জীবজন্তু অন্যপ্রান্তে রয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের গুঞ্জরন। সুতরাং ছন্দের ললিত লাবণ্যে বা প্রসাদ কলার মধ্যে যে মানব মহিমা ধরা দেয়নি তাকে অনুসন্ধান করতে করতে কবি পুনশ্চের জগতে এসে পৌঁছেছেন।

পুনশ্চ কাব্যে কবি যে রস পরিবেশন করতে চেয়েছেন তার শ্রেণীবিভাগ করে বলা যায় কতগুলি কবিতায় সুরের লঘুতা ও কল্পনা অর্ধসক্রিয়ভাবে ফুটে উঠেছে। এগুলি আখ্যায়িকা জাতীয। অপরাধী ছেলেটা, বালক, সহযাত্রী, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, উন্নতি প্রভৃতি। এ কবিতাগুলির রস ঠিক কাব্যমূলক নয়, চরিত্র সৃষ্টিমূলক। বালক কবিতায় অতিদুষ্ট বালক তার দৌরাত্ম্যে অবাধ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনহীন আনন্দের চরিতার্থতার দ্বারা গ্রামের সমস্ত তুচ্ছ পদার্থের উপর নূতন দাবী সৃষ্টি করছে। 'অকস্মাৎ এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কবি নিজ বাল্য জীবনের বহিপ্রতিরদ্ধ মানস চঞ্চলতার প্রগাঢ় কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ভরিয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে কাব্যোৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'ছেলেটা' কবিতায় বালকদের মধ্যে আছে দুষ্টুমি, দুঃসাহসিকতা, নূতন অভিজ্ঞতা আহরণের কৌতূহল, প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং কিছু পরিমাণে কল্পনা প্রবণতা। এই বালককে নিয়ে ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখা যায় না। তার জন্য কবিতাই দায়ী। কারণ সাধারণ কবিতায় ব্যাঙের খাঁটি কথা বা নেড়ি কুকুরের স্থান নেই। অন্যান্য কবিতা গুলির ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলির বিষয়বস্তু এত অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ যে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এগুলির দীনতাই ধরা পড়ত।

পুনশ্চে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে। যেখানে মনের ক্ষণিক অগভীর উচ্ছ্বাস চলতি মুহূর্তগুলি অর্ধসক্রিয় কল্পনার উপব স্বল্পস্থায়ী ছায়া তুলিকা বুলিয়ে দেয়। এগুলি গদ্য কবিতাব আলগা বুনুনির মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য সংহতি নেই। এখানে ভাবের অনুষঙ্গের মধ্যে শিথিল আকস্মিকতা ও অযত্ন বিন্যস্ত পারম্পর্য আছে। কবি যেন অলস মন্থর গতিতে উদ্ভ্রান্তচিত্তে ভাব থেকে ভাবান্তরে গেছেন। তাঁর চোখেব সামনে উপস্থিত বস্তুপুঞ্জের বিশৃংখলার মধ্যে কোন মতে সংকীর্ণ পথ করেছেন। 'পুকুরধারে' ও 'সুন্দর' কবিতা দুটিতে তিনি স্মৃতির গভীর অরণ্যে পথ হারিয়েছেন। বর্তমানের নোঙর ছেঁড়া দুটি দিন তাঁকে অতীতে অনুরূপ অনুভূতির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। 'স্মৃতি' কবিতায় পশ্চিমের একটি নিরুদ্বিগ্ন শহর ও তার শান্ত জীবনযাত্রার চিত্র নিতান্ত অকারণে কবির মনের মধ্যে আনাগোনা করে। এই ছবিটি যে কবিকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে তার কোন নিদর্শন নেই। 'বাসা' তে ময়ূরাক্ষী নদীর কবিত্বপূর্ণ নাম কবির মনে এইরকম একটি সৌন্দর্য শান্তিতে ঘেরা কাল্পনিক নীড় রচনার ইচ্ছা জাগিয়েছে---

'সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুনগুন গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে।'

ছন্দোবদ্ধ কবিতায় প্রতিবেশিনীর স্থান হতনা। 'দেখা' কবিতায় বর্ষাদিনের একটি দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নের দুটি রূপ বিনা ছন্দে অপূর্ব কাব্যত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এই চিত্র 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে' জাতীয় কোন উল্লাস জাগিয়ে তোলেনি। এ শুধুই 'দেখার টুকরো'-'ছন্দে গাথা কুঁড়েমির কারুকাজ।' সেজন্য এগুলি অক্ষয় কাব্যানুভূতি দাবী করে না। 'ফাঁক' কবিতায় কবি বার্ধক্যে কাজ ভোলার প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যের বিস্মৃতির ফাঁক দিয়ে প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য ও মানবজীবনের লীলাকোল ব্যথাকরুণ মুহূর্তগুলি তাঁর মনে প্রবেশ লাভ করে। 'একজন লোক' কবিতায় একজন পথিকের পরিচয়হীন অন্তর বাহির অজ্ঞাত ইতিহাসের অস্তিত্ব কবির মনে একটি ভাবলেশহীন চিন্তার ছায়া প্রক্ষেপ করেছে। সুতরাং এই কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা যায় এগুলি অন্য কোন রূপে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যান্য কবিতায় গদ্য ছন্দ কেবল প্রকাশ ও আকৃতিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেগুলি প্রকাশ করা যেত না—একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। 'শাপমোচনের' মতো কবিতা অনায়াসে দৃঢ় সংবদ্ধ কাব্যরূপ লাভ করতে পারতো। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় গদ্যরূপটি স্বভাবতই একটি মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এটি ঠিক গদ্য কবিতা নয়, একে বলা যেতে পারে অপরাজেয় মানব মহিমার চলমান প্রবাহের একটি অবিস্মরণীয় ধ্বনিরূপ।

'পুনশ্চ' কাব্যটি ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত। সপ্ততি অতিক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি নবতর পরীক্ষা কাব্য পুনশ্চ। এই কাব্যের প্রকৃতি ও প্রসঙ্গেব ক্ষেত্রে এক মৌলিক অভিনবত্বের সূচনা হয়েছে, প্রধানতঃ গদ্যছন্দের জন্যই পুনশ্চের খ্যাতি।

গদ্যছন্দ বচনার পশ্চাতে যে ইতিহাস আছে তার এক প্রান্তে 'লিপিকা'র নাম করা হয়ে থাকে। লিপিকার গদ্যকথিকাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম সচেতন ছন্দমুক্তির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ লিপিকাকে গদ্যকবিতা বলেন নি, লিপিকার রচনারীতি যেন গদ্যের দিক থেকে কবিতার যাত্রা অর্থাৎ গদ্যে কবিতার গীতিপ্রবণতা, তথ্যভারমুক্ত লাবণ্য বা বস্তুর নির্যাস রচনাব চেষ্টা। আর পুনশ্চে দেখা যাচ্ছে কবিতার দিক থেকে গদ্যে পৌছান। অর্থাৎ লাবণ্য আর লালিত্যের মধ্যে যুক্তি ও বস্তুকে পুরে দেবাব চেষ্টা। সে কাবণে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রচনার ইতিহাস আসলে কবিতা ও গদ্যের একটি মাঝামাঝি স্থিতাবস্থা রচনার ইতিহাস। কখন গদ্য থেকে কবিতায়, কখনও কবিতা থেকে গদ্যে এসে মেলার চেষ্টা। কোনটি সার্থক বা কোনটি গদ্যছন্দ এই প্রশ্ন অবান্তর। রীতির দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, গদ্যছন্দে একটি ভাবছন্দ আছে এবং তাকে ধরার জন্য ইন্দ্রিয়ের অতিসূক্ষ্মতার প্রয়োজন। এই ছন্দ একান্তই রাবীন্দ্রিক এবং ব্যক্তিত্ব প্রধান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের নিজেরই লেখা দুই সময়ের গদ্যছন্দ একরকম নয়। তাই পুনশ্চের

গদ্যছন্দকে 'গদ্যছন্দ' নামক কোন শব্দের দ্বারা আখ্যাত করা চলে কিনা বিচার করে দেখতে হবে। বরং 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ' এই অনিবার্য বিশেষণেই এদের আখ্যাত করা যায়। এই ছন্দে পর্ব ও মাত্রার কোন প্রশ্নই ওঠে না, চরণের স্বাধীনতাও প্রবল। বাক্যগঠন কথ্যভাষা রীতির, অন্বয় মোটামুটি কথ্যভাষার বা মৌখিক গদ্যসুলভ। ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনির্দিষ্ট, উপমাদি অলংকার ব্যবহার অত্যন্ত বেশি, এই গদ্যছন্দ মুহুর্মুহু সাদৃশ্যপ্রবণ। সাধারণ গদ্যের সংগে এর লক্ষণীয় পার্থক্য অব্যয় জাতীয় শব্দের ব্যবহারে। অর্থাৎ একটি গদ্যছন্দে একাধিক বাক্যের মধ্যে সংযোজক বিয়োজক ইত্যাদি জাতীয় অব্যয় বা সর্বনামবাচক বিশেষণ বা অনুরূপ শব্দ প্রায়শ বর্জন করে একে গদ্যের ভারসাম্য থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য বাক্যগুলি ঈষৎ কম্পিত শিথিল। গদ্যছন্দ এর রীতিতে নেই, প্রকৃতিতে আছে। এর বাক্যে নেই, বাক্যের মিলিত ধ্বনিতে আছে। কেননা এই ছন্দ কি বলছে তা সম্পূর্ণ না শুনে বা কোন বিষয় বর্ণনা করছে তা পবিপূর্ণ না জেনে বা তার সামগ্রিক আবেদনটি উপেক্ষা করে কখনই বলা সম্ভব নয় এটা গদ্যছন্দ হয়েছে। কবিতা পাঠ শেষ করাব পর বুদ্ধিমান পাঠকের বিশ্বাসে আছে যে কবিতাকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আধুনিকতার উপর আস্থা রেখে গদ্যছন্দ কেবলমাত্র বিস্ময়কর সৃষ্টি নয়—গণতান্ত্রিক সৃষ্টিও বটে—প্রাচীন সাহিত্যে এই ছন্দ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ এব অর্ধেক থাকে কবিতায়, অর্ধেক সৃষ্টি করেন পাঠক। ইচ্ছে করলে একে গদ্যও বলা যায়। চোখ ও কানকে প্রতারিত করার একটা সজ্জা আছে, বিন্যাসের একটা ভঙ্গী আছে, যদিও তার নিয়মেব নাম নিয়মহীনতা। পুনশ্চের গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যিকারীতি' কথাটি চমৎকার। অর্থাৎ এ গদ্য নয়—গদ্যিকা, গদ্যের কূল থেকে কবিতার জলে নামা।

প্রকৃতপক্ষে রীতির দিক থেকে গদ্যছন্দে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছু নেই। নেই কোন সম্ভ্রান্ত নিযম বা অনুশাসন। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেব হাতেই এই স্বেচ্ছাচার সুষমা লাভ করতে পারে। অপটু হাতে এ ছন্দের সৃষ্টি নেই। এ আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'নাটক' কবিতায় করে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন গদ্যছন্দ লেখার চেষ্টা করলেন এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি অনুমান করতে পারি ঃ—

(১) কবিতা লিখতে হবে অথচ ছন্দকে শৃঙ্খল বলে মনে হচ্ছে। গদ্য লিখবেন না, কবিতাই লিখবেন। কিন্তু ছন্দেব বন্ধন স্বীকার করা কষ্টকব। ঘুবিয়ে বললে বলা যায় যুক্তিমূলক রচনা লিখবেন না, আবেগমূলক বচনাই লিখবেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশে সংযম থাকবে—সুতরাং তার জন্য নতুন বাহনের দরকাব।

(২) ছন্দের মধ্যে একটা নিধাসক্তি আছে, তার একটি সার্বভৌম আভিজাত্য আছে—কবি তার দাসত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না।

(৩) গদ্যের মধ্যে একটা সংযত লালিত্য সৃষ্টি করা যায় এ পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল উত্তীর্ণ। গদ্যকে বুদ্ধির কাছে আবেদন সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত প্রসাধনের দরকার পড়ে না।

(৪) কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়ের নির্বাচন অনেকটা সীমাবদ্ধ। সেখানে চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা সৌন্দর্যবোধের উন্নাসিকতার দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু গদ্যছন্দে বিষয়ের নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা আছে।

এই বিষয়ের আকর্ষণই গদ্যছন্দের সবচেয়ে বড়ো কথা। মনে রাখতে হবে সমগ্র দেশকাল জুড়ে তখন বুদ্ধিজীবির মানস সংকট চলছে। গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মন মুক্তি চাইছে। নতুন লেখকেরা চেতনাব নতুন বাতায়ণ খুলে দিচ্ছেন। বাস্তবতার প্রতি মোহমুক্ত ঋজুদৃষ্টি পড়ছে। সুতরাং এখন আর ছন্দ নয়, সোজা-সরল-বলিষ্ঠ করে কথা বলা দরকার—একথা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া কবি জীবনের আয়ুর দিক ধূমায়িত হয়ে আসছে, নিকটের প্রতি মমতা এবং চলমান মানুযের জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। কবি বুঝতে পারছেন মানুষের দৈনন্দিন ধূলিমলিন বেদীতে নিত্যকালের দেবতার চরণ পড়ে। ববীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করছেন ইতর প্রাণী জীবজন্তু কীটপতঙ্গ তরুলতা সবই বেঁচে আছে। সকলে সূর্যালোক এবং মৃত্তিকার স্তন্যরস পান করছে। তাই যাবার আগে আর একবার এদের দিকে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সকলের উপর করুণ কল্যাণ হস্ত বুলোতে ইচ্ছে করে। এই অবিস্মরণীয় বাসনাকে, এই কল্যাণী ইচ্ছাকে কোন ছন্দে, কোন শৃঙ্খলায়, কোন নিয়মানুবর্তে রবীন্দ্রনাথ বাঁধতে চান নি। যা ভেবেছেন তাই-ই বলেছেন। কোন কিছুই বর্জন করেননি, নিষ্ফল বলে ফেলে দেননি।

সুতরাং ছন্দের পরিমিত বন্ধনে প্রসাধনবলীর সতর্ক শাসনে সূক্ষ্মকলারুচির নিয়ন্ত্রণে যে সব কথা, যে সব ছোটখাট বাসনা, যে সব প্রসঙ্গ অবান্তর বলে মনে হতো বা বর্জন কবতে হতো—তারাই গদ্যছন্দের প্রসারিত করপুটে স্থান পেয়েছে। অথচ সেই স্তূপীকৃত বস্তুর মধ্য থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা কাব্যরস।

কিন্তু এগুলি কবিতা হয়েছে কি? এই প্রশ্নের আগে সেই পুরাতন জিজ্ঞাসা কবিতা কাকে বলে? কিন্তু এর উত্তরটি পুবাতন নয়। কবিতা কাকে বলে নতুন করে ভাবা দরকার। আধুনিককালে সাম্প্রতিক শিল্পশাস্ত্রের শর্ত মিলিয়ে কেবল বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের রাসায়নিক যোগেই কবিতার জন্ম হয় না। রস সৃষ্টি বা ধ্বনি সৃষ্টি একটি যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। কবিতা সম্পর্কে এখনকার পাঠকমন অনেক বেশি সম্প্রসারিত, অনেক বেশি উদার। আমরা মনে করি যখনই কোন মুহূর্ত জীবনকে গভীবভাবে নাড়া দিতে পারে, তখনই তা কবিতার উপাদান হতে পারে। মুহূর্তের ছোট ছোট হাসিকান্না, একটা ব্যর্থতাবোধ বা নৈরাশ্য ইত্যাদি তুচ্ছ অনুভূতিগুলিকেও জীবনের গভীরতা ও আন্তরিকতার দ্বারা পরিমিত করলে তাকে কবিতার উপাদান করে তোলা যায়। উপাদান যার এত সামান্য—স্বাভাবিকভাবেই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা সেখানে কিছু থাকে না। এইজন্যই পুনশ্চে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন কথা বলতে আর দ্বিধা নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি—'The greatness of an art lies in the greatness of its greatest moment'—'পুনশ্চ' এই greatest moment-এরই কাব্য। সেদিক থেকে এ কাব্যের বাহন গদ্যছন্দ—সার্থক এবং অতুলনীয়।

কালান্তর

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে সমসাময়িক যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধেই সরল বাক্যবিন্যাসে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করে ও কৌতুকের চমৎকারিত্বে তাঁর সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। শচীন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন সেই আলোচনাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে তিনি তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর রচনাকে রচনাকালীন সময় ও প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত করে আলোচনা করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে পারিবারিক প্রভাবের কথা স্মরণীয়। ভারতবর্ষের সর্বজনীন ও সর্বকালীন আদর্শের প্রতি ঠাকুর পরিবার বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সেকালে আমাদের পরিবার ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্মসংস্কার করবার উৎসাহে সর্বদা জাগ্রত ছিল। বালককালের সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষভাবে দীক্ষিত করেছে।' রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ভারতীয় শাশ্বতধর্মের প্রতি একান্তভাবে আস্থাশীল অথচ ধর্মসংস্কারের প্রেরণায় তাঁকে সর্বদাই উচ্চকিত করে রেখেছে। কালান্তরের প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যই প্রকাশলাভ করেছে।

১৮৮৫ সালে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। উনিশ শতকের শেষাংশে জাতীয় চৈতন্যের যে জোয়ার এসেছিল তার প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল সভাসমিতিতে সংবাদপত্র প্রকাশে এবং সামাজিক জীবনে জাতিধর্ম ভেদের দূরীকরণ প্রয়াসে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতীয় সভ্যতার মহান আদর্শের আনুগত্য করে অতীতকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, তাগিদ ও নিষেধ এই দুটি জিনিসকে বিচার বিবেচনা করে গতিবেগকে মন্থর করাই যে বিবেচনা এবং ঝোঁকের মাথায় চলাই যে অবিবেচনা রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল তীব্র প্রগতিবাদ। অধ্যাত্মদৃষ্টি বলে তিনি দেখিয়েছিলেন মৃত্যুহীন প্রাণের অমর অভিযান। যাঁরা প্রাচীন ও অতীত আশ্রয়ী তাঁদের প্রতি তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। অতীতমুখী ভারতকে তিনি বলেছেন—'পক্ক কেশের শুভ্র মরুভূমি।' সেখানে প্রাণের রসের ধারা ইতিহাসকে সচল ও সজীব করে রাখে না। ভারতের রাজনৈতিক অকৃতকার্যতার জন্য রবীন্দ্রনাথ দায়ী করেছেন ভারতের মানুষকে। কারণ তাঁরা কর্মের

সঙ্গে প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টিব কোন উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই।' তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণের জন্য যে দুঃসাহসিক প্রাণেব তৎপরতা প্রত্যাশা করেছেন মানুষেব মধ্যে. সেই অনন্ত প্রাণচৈতন্যের উদ্বোধন ঘটে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে। অবিবেচনার বেগ ও বিবেচনার সংযম এই দুই-ই প্রাণের ধর্ম। সামাজিক উন্নতির পথে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক প্রাণপুরুষেরই জয়গান গেয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলাদেশের সামাজিক রূপ ও বাজনৈতিক চিন্তা নতুন পথ অবলম্বন করেছে। তখন এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যে বঙ্গবিচ্ছেদের জন্য হিন্দুমুসলমান মৈত্রী আবদ্ধ হয়নি। বাংলাদেশের ভদ্রসম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীদের অপমান করতে চিরদিন অভ্যস্ত ছিল। নিম্নশ্রেণীদেব মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের কারণ ভদ্রসমাজের হৃদয়হীনতা। এই কথা উপলব্ধি করে তখন বাংলাদেশ লোকহিতের নেশায় মেতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নেশাকে সমর্থন করেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমরা য়ুরোপেব অনুকরণে লোকহিত শুরু করেছিলাম— এর মধ্যে বিশুদ্ধ অন্তরের তাগিদ ছিল না। লোকহিত দ্বারা সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই লোকহিতকে একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্ম বলে মনে করেননি। তিনি মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম শক্তি ও সামগ্রিক প্রীতির উদ্বোধনে বিশ্বাসী। অকুণ্ঠিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'হিত কবিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনও অপমান নাই। কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।' রবীন্দ্রনাথ মানুষেব তথা মনুষ্যত্বের অপমানকেই বড়ো করে দেখেছেন। সমাজের বাহ্যমুখকে প্রাধান্য দেননি। নাইট স্কুল করে মানুষকে শেখানো ভালো বটে কিন্তু মনুষ্যত্বেব জাগরণ না ঘটলে এইরূপে সমাজ হিতৈষণা হাস্যকব হয়। মানুষেব মনের মুক্তিকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্মেষকেই ববীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান কাজ বলে মনে কবেন। তাই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যাত্ম চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। 'লোকহিত' প্রবন্ধের শেষেব দিকে কৌতুকছলে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন—'রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের বাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে।' রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত', 'ছোটবড়ো', 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রতিটি প্রবন্ধেই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণেব পশ্চাতে একটি আধ্যাত্মিক মনের সক্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। য়ুরোপে যে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বাতন্ত্র্যকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেননি। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'স্ববাজের প্রতিষ্ঠা বাহিবে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।' বিশ্বরাজ্যের দেবতা মানুষকে চিরদিনের স্ববাজ দিয়েছেন। মানুষ আত্মশক্তিতে আস্থাশীল হয়ে যদি এই বিধিদত্ত স্বরাজ গ্রহণ করতে পারে তাহলেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতি সহজে আয়ত্ব হবে। অধ্যাত্মবাদের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যকে মুখ্য করে তোলেননি। ভারতবর্ষকে তিনি য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য নিকেতনের দ্বার খুলতে বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি তত্ত্বকে অবলম্বন করতে বলেছেন। উপনিষদের 'মাগৃধঃ কম্যবিদ্ধনম্' এইরকম তত্ত্বকে আশ্রয় করেই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

য়ুরোপের রাজনৈতিক ক্রিয়া মানুষেব আত্মাকে বাদ দিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রচিন্তার সাথে আত্মচিন্তাকে সংযুক্ত করে সর্বভূত আত্মদর্শন করতে বলেছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী বলেছেন। এই শিক্ষা স্বাজাত্যের অহমিকা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক শিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই অভিমত পোষণ করেন যে স্বজাত্যের অহমিকা হতে মুক্তিলাভ করে সর্বজাতির সহযোগিতার অধ্যায় সূচনা করাই সর্বজাতির শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি উপনিষদের মন্ত্রটিকেই শিক্ষার মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেছেন—

'য ইমং মধ্বদঃ বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।।'

সামাজিক শিক্ষা প্রসারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রখর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধে ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজের মৌলিক পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। তিনি বড় ইংরেজকে অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান রূপে দেখেছেন। ইংরেজ ছোট হয়েছে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ওপর রাজ্য গ্রাসস্পৃহায়। এতেই ঘটেছে তার আত্মার অবমাননা। শাশ্বত ধর্মের প্রতি অবহেলা করেই ভারতবর্ষে ছোট ইংরেজ অত্যাচারী রূপে প্রকটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অধ্যাত্ম দৃষ্টি বলে অখণ্ড করেই দেখেছেন। তাই তিনি রাষ্ট্রচিন্তার প্রেরণারূপে নিত্যজাগ্রত ধর্মকে স্থাপন করেছেন। তিনি ছোট ও বড় প্রবন্ধে পলিটিক্সের শিক্ষা ও দস্যুবৃত্তিকে নিন্দা করেছেন। কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদে বেদনাবোধ করেছেন। মনুসংহিতার বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাততঃ সমৃদ্ধ হলেও পরিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথ মানুষেব রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে ভয়, লোভ ও দুর্বলতার প্রাধান্য দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভয়, লোভ ও দুর্বলতা হতে সামাজিক মানুষকে মুক্ত হতে হবে। এককথায় অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান না হলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নেই। মানুষের প্রগতিরথ বারবার বিপর্যস্ত হবে। প্রতিটি প্রবন্ধেই সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা, কংগ্রেসী আন্দোলন, বিদেশী বর্জন, সন্ত্রাসবাদের গুপ্তঘাতকতা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে রিভলবার বা চরকা কোনটাই মানুষের কল্যাণ আনে না। বরং সভ্যতার সংকট উপস্থিত করে। অধ্যাত্মসত্যের আহ্বানে মানুষের অন্তবের শুভবুদ্ধি যদি সাড়া দেয় তাহলেই সামাজিক কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা বিদূরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণকে অবলম্বন করে ১৩২১-১৩৪০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনা করেছেন। ১৩৪০ সালে 'কালান্তর' প্রবন্ধটি লিখিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক কাল হতে অন্যকালে মানব সভ্যতার প্রগতি পথের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। সমগ্র গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের একটি বিশিষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়।

'কালান্তর' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সত্তব বছরের রচনা, তিনি এই প্রবন্ধে ইংরাজ

আগমনের ফলে ভাবতবর্ষের ইতিহাসে যে বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল তারই বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এই বিচিত্র ব্যাপারকেই তিনি বলেছেন কালান্তর। কালান্তর শব্দটির ব্যাসবাক্য করলে বোঝা যায় অন্যকাল। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ আগমনের ফলে কালান্তরের সূচনা হয়েছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আঘাতকে শোচনীয় আক্রমণ বলে মনে করেননি। মুসলমানেরা বাহুবলে ভারতের বুকে যে আঘাত হেনেছিল তাতে রাজ্য সংঘটন হলেও চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আগমনে আঘাত রবীন্দ্রনাথের মতে 'আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে।' এই আঘাতে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরেব মধ্যে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চারিত হয় এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হতে থাকে। কালান্তরে ভারতীয মনের মধ্যে চিত্তের দৈন্য অপসারিত হয়েছিল। ইংরেজের চিত্তজ্যোতি সত্যসন্ধানের সততায় ভাস্কর ও প্রাণবান। বুদ্ধির সাধনায় সে জ্ঞানের জগৎ প্রতিদিন জয় করছে। ভারতের ইতিহাসে যখন কালান্তরের ইতিহাস সূচিত হল তখন প্রাণবান মানুষের বুদ্ধির আলস্যে কল্পনার কুহকে আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্যে প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনীয় নিজেকে ভোলাতে চায়নি। মুসলমান শাসন ও ইংরেজ শাসনের তুলনা করলে এককাল হতে অন্যকালের তাৎপর্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কালান্তর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি কালের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। অতীত যুগকে তিনি 'অন্ধকার প্রথানুগত্যের' যুগ বলেছেন। যে যুগে মানুষ জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে আপন অধিকারের খর্বতা ও অসম্মান শিরোধার্য করেনি। সমাজশক্তির কাছে ও ভাগ্যের কাছে ব্যক্তিত্বকে বিকীর্ণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমান যুগ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলা যায়, যে যুগে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা আবিষ্কার করেছে। তাছাড়া ন্যায় অন্যায় বিচারে এমন একটি বিশুদ্ধ আদর্শ গ্রহণ করেছে যে আদর্শ শ্রেণীর মানুষ ভেদে পরিবর্তিত হয় না। মুসলমান যুগে বলা হত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা'—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এ যুগে কোন মূঢ়ের মুখ হতে বের হবেনা দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরোবা। ভারতে আরও আগের যুগে হত্যাপরাধে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ ছিল কিন্তু নূতনযুগের বাণী সব হত্যাপরাধকেই একই পংক্তিভুক্ত করেছে। বস্তুতঃ নূতনযুগ মানুষের ব্যক্তিত্বকে, মানুষের মহিমাকে এবং সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানের আলোককে মূল্য দিয়ে কালান্তরের প্রতিষ্ঠা করেছে।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে আধুনিক সভ্যতার বীজমন্ত্রটি দেখেছেন। তাই কালান্তরের যুগকে তিনি য়ুরোপের সঙ্গে গভীর সহযোগিতার যুগ বলেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপের মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে। ইংরেজ শাসনের প্রথমপট ছিল 'law and order' অর্থাৎ বিধি এবং ব্যবস্থা। য়ুরোপের নবযুগ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসত্যনিষ্ঠ ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাসের গতিকে কাল হতে কালান্তরে পরিচালিত করেছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা ভারতের ইতিহাসে কালান্তর সৃষ্টি করেছে একথা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় শাসনকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারেননি। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও

সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ যুরোপীয় রাজনৈতিক মতবাদকে শ্লাঘ্য মনে করেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—'যুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে যুরোপেরই সংশ্রবে। নবযুগের সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মত রয়ে গেল ভারতবর্ষ।' রাজনীতি ক্ষেত্রে যুরোপ যে সভ্যতার মশালটি ব্যবহার করে তা আলো দেখবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য। চীনে যুরোপের কার্যকলাপ চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচয়। আফ্রিকার কঙ্গোপ্রদেশে যুরোপীয় শাসন অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জাতিদের লাঞ্ছনা যুরোপীয় সভ্যতার কদর্য দিকটাই উদ্‌ঘাটিত করে। সভ্য যুরোপের অমানবিক নিষ্ঠুরতা আয়ারল্যাণ্ডে প্রকটিত হয়েছিল। বীভৎসরূপ দেখা দিয়েছিল জালিওয়ালানাবাগের ঘটনায়। যুরোপীয় যুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মোচন করেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক চেতনায় যুরোপের কল্যাণবুদ্ধি ও মানবপ্রীতি একেবারেই কুণ্ঠিত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, সভ্য মানুষের রাষ্ট্রচিন্তা সমাজবোধ বা আধ্যাত্মিকতা হতে পৃথক কিছু নয়। মনুষ্যত্বের মহিমার উপায় বিশ্বাস শিথিল হলে, বিস্তৃত হলে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি মহা-আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানের প্রথা মানুষকে অকল্যাণের পথে টেনে নেয়। সভ্যতাকে বর্বরতার পথে প্রবর্তিত করে সভ্যতার পথে কালান্তবকে রবীন্দ্রনাথ সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিহীন কালান্তরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কল্পান্ত" বা "মানব সভ্যতার চরম সমাধি"।

'কালান্তব' রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রকাশ করলেও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন বাঁধা মত প্রকাশ পায়নি। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—'রাষ্ট্রনীতির মত বিষয়ে কোন বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোন এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।' তাঁর জীবনে ভারতীয় ও যুরোপীয় সভ্যতাব আদর্শ সম্বন্ধেও তাঁর মনে একটি সুস্পষ্ট চিন্তা রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ মাপকাঠিতে বিচাবিত হয়েছে। কালান্তবের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতাব আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ যুগ প্রয়োজনে সংস্কারযোগ্য। এই চলমান পৃথিবীতে জীবনকে সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্র বচনে চিরকাল স্থাবর করে রাখা যায় না। বিরুদ্ধ আঘাতে জীবনের মধ্যে প্রাণাবেগের সঞ্চার হয়। প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত আসে মুসলমানদের কাছ হতে। কিন্তু তাতে নতুন প্রাণসঞ্চাব হয়নি। মুসলমানের বাহুবলের ধাক্কায় চিন্তারাজ্যে কোন নতুন সৃষ্টির উদ্দাম জাগেনি। কিন্তু ইংরাজ যখন যুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে ভারতবর্ষের দ্বারে এসে দাঁড়ালো তখন যুরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তখনই ভারতবর্ষে সভ্যতা ও শিক্ষাব আদর্শ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সচেতনতা আসে। রাষ্ট্রাধিকার করায়ত্ত করে শক্তি অর্জন করাই সভ্যতা কিনা অথবা বস্তুবিদ্যা আয়ত্ত করে ভোগাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কিনা তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি হল। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যুরোপের প্রেরণা ভারতের পথে শুভকর। কিন্তু যুরোপের অনুকরণ ভারতের

আত্মিক মৃত্যু। সভ্যতা ও শিক্ষার আদর্শকে য়ুরোপীয় বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এই দুই আদর্শ দ্বারা পরীক্ষা করে গ্রহণ করাতে হবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা শিক্ষাকে বিদ্যার্জন বলে গ্রহণ করা হয় এবং সেই বিদ্যাব দ্বারা পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করে। এই বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেইদিক একটি মস্ত কল বলা যেতে পারে। সেখানে নিয়মের রাজত্ব, সবকিছুই কার্যকাবণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। য়ুরোপীয় বিদ্যা নিরলস সাধনায় সেই নিয়ম আবিষ্কার করছে। এইভাবে বস্তুর নিয়ম জেনে বস্তুকে করায়ত্ত করছে। ফলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা তাদের ভাগেই পড়ছে। এই বিদ্যাকে বস্তুতান্ত্রিক বিদ্যা বলে বেদনা বা দুঃখপ্রকাশ করা চলে না। এ বিদ্যার সঙ্গে শয়তানের যোগ থাকতে পারে, তথাপি এই বিদ্যা সত্য। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় ভোগপ্রলুব্ধ মানুষ ঐ বিদ্যার সঙ্গে শয়তানীর যোগ করে শক্তির অহংকাব প্রকাশ করে। কিন্তু এ শিক্ষা মহত্তম আদর্শের পরিচায়ক নয়।

ববীন্দ্রনাথ বলেন, পশ্চিমদেশে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি সেখানকার মানুষকে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত করছে। তাবা বুদ্ধির শক্তিকে গ্রাহ্য করে না। পাড়ায় আগুন লাগলে যদি একখানা চালাও জ্বলে তবে তারা কপালের দোহাই দেয় না। প্রকৃত অভাব যে জলেব সে কথা বোঝে এবং কর্মশক্তির দ্বারা অভাব মোচন কবে। আত্মশক্তিতে এই প্রকার আস্থা বিদ্যা অর্জনের একটি প্রধান শিক্ষা। ভারতবর্ষে এই শিক্ষার বড়ো অভাব। য়ুরোপের আকস্মিক উন্নতি দেখে ভারতবর্ষ যদি ভাবে যে ওদের বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারলেই জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যা বিদূরিত হবে—তাহলে ভারতবর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পাববে না। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে হরগৌরীব আদর্শকে শ্রেষ্ঠমিলন মনে করেন। বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনে সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ না করে মানুষের মহত্তর কল্যাণে আত্মোৎসর্গের আদর্শ গ্রহণ করাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ। যে শিক্ষার দ্বাবা মানুষ শুধু বস্তুকে আয়ত্ব করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না—সেখানে শিক্ষার চবম আদর্শ প্রকটিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন তাই প্রকৃত মিলন। য়ুরোপ বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য নিকেতনের দরজা খুলেছে। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার তার করায়ত্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বের অতিরিক্ত যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে, যা বন্ধনে আবদ্ধ নয় সেই বৈরাগীর সন্ধান তারা পায় না। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষার সেই মহৎ মিলনাত্মক আদর্শ নেই।

> 'তাতে পণ্যদব্য রাশিকৃত হয়, বিশ্বজুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ কবে কোঠাবাড়ী ওঠে, এদিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বল জীবিকার সুযোগ সন্ধান বল নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের ষোল আনা জিত হয়। কিন্তু লোক যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।'

এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে লৌকিক স্বার্থে প্রয়োগে ব্যর্থতার দিকে ইংগিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বস্তুবিজ্ঞানের বিদ্যার দ্বারা সভ্যতার রথটা দ্রুত চলতে পারে। য়ুরোপীয় সমাজজীবনে যে ঐক্য তাও নিয়মের বাঁধনে বাঁধা। যে বাঁধন দড়ির বাঁধন, নাড়ির বাঁধন নয়। তাই দড়ির বাঁধনের ঐক্য মানুষেব অন্তরাত্মাকে উল্লসিত করে

তোলে না। বিশ্বের প্রতি বিরুদ্ধতা আছে, বিশ্বকে নিকট করবার সংকল্প আছে। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা যে মিলন সংঘটিত হবে তাতে বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করবে। ভারতীয় সভ্যতার আদর্শে আত্মিক সাধনাকে মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে। সেই সাধনায় বস্তুবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার মিলিত রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নচর্চার দ্বারা লৌকিক জীবনকে নিরাপদ করা প্রয়োজন। শুক্রাচার্য এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং অমৃতলোকের বৃহস্পতি পুত্রকে এই বিদ্যা শেখবার জন্য দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। পশ্চিম মহৎদেশের লোকেরা সাধনার এই দিকটার ভার নিয়েছে। কিন্তু এ সব সাধনার নিচেকার ভিত। এই ভিত পাকা প্রয়োজন। কিন্তু যদি সমস্ত মনোযোগ এই দিকেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে অভ্রভেদী অট্টালিকা গঠিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার আদর্শগত মিলন কল্যাণকর বলে মনে করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মিলনের এই মহত্তম আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কালান্তরের বহু প্রবন্ধে বিশেষতঃ 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, আগামী দিনের ইতিহাস সর্বজাতির সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। সুতরাং য়ুরোপীয় শিক্ষায় Nationalism নামক যে আত্মম্ভরিতা জাগ্রত হচ্ছে তা মানুষের মহামিলনের পরিপন্থী। তাই কবি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন— 'স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।' তিনি ভারতীয় বিদ্যানিকেতনগুলিতে পূর্ব পশ্চিমের মিলন দেখবার জন্য আন্তরিক বাসনা প্রকাশ করেছেন। য়ুরোপীয় বস্তুবিদ্যা ও ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা সমন্বিত করে মিলনাত্মক শিক্ষার মহান আদর্শের কথাই তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন।

কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক জীবনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দোষ ত্রুটি স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করেছেন। ইংরেজ শাসনে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক্ষ সংস্পর্শে এসে ভারতীয়রা সামাজিক জীবনে নানা প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিল। সনাতন প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য অথবা য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগ আমাদের যেভাবে কর্মচঞ্চল করে তুলেছিল তার বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থখানির প্রথম প্রবন্ধে কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজজীবনের চিন্তায় ও ব্যবহারে যে অনেকখানি বিপ্লব এনেছিল তা আলোচনা করেছেন। ইংরেজের আইন ব্যক্তি ভেদে রক্ষা করেনি। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে একাকার করেছে। সমাজে যারা অস্পৃশ্য বলে গণ্য তাদেরকেও দেবালয়ে প্রবেশাধিকার দেবার কথা উঠেছে। হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক কারণে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এর থেকে ভারতবাসীর মনে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা আলোড়ন জেগেছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলেই এ প্রশ্ন ভারতবাসীর মনে জাগে। রবীন্দ্রনাথ 'বিবেচনা ও

অবিবেচনা' নামক প্রবন্ধে সমাজে এই চলার ঝোঁকটাকে কঠিন কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখেছেন।

বাঙ্গালী সমাজে নূতনত্বের মোহ ও প্রাচীনত্বের আকর্ষণ দুইই একসময় বড়ো হয়ে উঠেছিল। একালে সমাজের সনাতনপন্থী খাঁচার স্তব করে তৃপ্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই উভয়দলই চূড়ান্ত পথের পথিক। এদের অসামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই চূড়ান্ত কল্যাণ নিহিত। সমাজের বিবর্তনের জন্য দুঃসাহসিকতার প্রয়োজন। পৃথিবীর সব বড সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। এই দুঃসাহসের মধ্যে একটি প্রবল অবিবেচনা আছে। তার চলার পদ্ধতির মধ্যে বিবেচনার সংযম আছে। অবিবেচনায় মানুষ ঝোঁকের মাথায় নতুন পথে চলে আর বিবেচনায় মানুষ তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়—উপায় সম্বন্ধে সতর্ক হয়। কাজেই সমাজের বিবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথ উগ্রবিপ্লববাদীদের সমর্থন করেননি। সমাজের কল্যাণের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি সঞ্চার না করে আত্মাভিমানের মদে মত্ত হয়ে লোকসাধারণেব উপকার করতে যাওয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সংযোগ দ্বারাই পার্থক্য বুদ্ধিকে দূর করতে হয়। তাতেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া।' তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারকে দুটো স্বতন্ত্র কাজ বলে মনে করেননি। লোকহিতৈষীরা যদি দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব না করে তাহলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কোন সংস্কারই স্থায়ী হতে পারে না।

সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই যে সমাজের সর্বসাধারণ যদি প্রবুদ্ধ না হয়, তাহলে আইন করে, নীতি নির্দেশ করে সমাজসংস্কার করা যায় না। সমাজ জীবনেব একটি বড়ো ত্রুটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাঙালী সমাজ পর নির্ভর। সমাজ শাসন বা রাজকর্তৃত্বকে নির্বিচারে মেনে চলাই সামাজিক মানুষের চরম দুর্বলতা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বলে নির্বিকার থাকলে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা ঘটে। কারণ 'কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।' য়ুরোপে এর প্রকৃত রূপ দেখা যায়। রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যাপারে য়ুরোপ আমাদের মত নয়। তারা অদৃষ্ট বা দৈবের উপর নির্ভর করে নিষ্ক্রিয় থাকে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্নজল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ কিছুই নেই। এইগুলো পাবার জন্য আমরা রাষ্ট্রের দিকে অথবা ঈশ্ববের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কর্তব্যের কথা আমরা ভাবি না। ভারতবর্ষ 'সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িয়া' চলে। নিজের পথে চলবার শক্তি নেই। আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব। জাতীয় জীবনের এই মর্মান্তিক ত্রুটিকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও বেদনাকরুণ ভঙ্গীতে কোথাও করুণ কৌতুকহাস্যে বারবার প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় জীবনের আরও কয়েকটি দুর্বলতার কথা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। 'বাতায়নিকের পত্রে' শক্তিপূজার কথা উল্লেখ করে তিনি আমাদের শক্তিভক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শক্তির উপর নির্ভরশীল মানুষের ইতিহাস রথ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। শক্তির সঙ্গে যদি সুষমার সংযোগ না ঘটে, প্রেম ও

কল্যাণবুদ্ধি যদি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করে তাহলে সেই শক্তি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলার শক্তি পূজা ও আধুনিক বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেননি। বাঙ্গালীর জীবনের নৈষ্কর্মকে, পরনির্ভর ঔদাসীন্যকে যেমন তিনি নিন্দনীয় মনে কবেছেন তেমনি নিন্দনীয় মনে করেছেন সন্ত্রাসবাদকে, যা বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক কর্তৃক অবলম্বিত হয়েছিল। 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে সেইসব নির্ভীক বীরদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের আচরণে যে ক্রোধের দাহ ছিল, শক্তির যে অহঙ্কার ছিল, দুঃসাহসিকতার যে অবিবেচনা ছিল রবীন্দ্রনাথ সেইদিকও প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সন্ত্রাস সৃষ্টি নয়, প্রেমের ডাকেই ভারতবর্ষের হৃদয়ের আশ্চর্য উদ্বোধন ঘটবে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে যে সত্যের আহ্বান আছে তারই ডাকে ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তির প্রকাশ ঘটবে। এর ফল হয়তো একদিনেই দেখা যাবে না কিন্তু পরিমাণে সেই শক্তি সমাজের মর্মলোকে অবস্থিত থেকে কল্যাণের পথে প্রবর্তিত করবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সাফল্যের জন্য আধিপত্য নষ্ট করা, বিলাতী কাপড় পোড়ানো, চরকায় সুতা কাটা ওই সমস্ত পদ্ধতিকেও রবীন্দ্রনাথ ভ্রমাত্মক বলে মনে করেন। তাঁর ধারণায় এই সব আচরণ ভারতীয় সভ্যতার বিরোধী এবং বিশ্বনীতির প্রতিকূল। সামাজিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণের আদর্শ দ্বারা পবিসীমিত করে নেবার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধেব মধ্যে বিশেষতঃ 'সমস্যা ও সমাধান' নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। মানুষের মধ্যে প্রেম ও কল্যাণবুদ্ধির উদ্বোধন, বিশ্বনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং পাপ ও অকল্যাণকে নিষ্ঠার সঙ্গে দূরীকরণ প্রচেষ্টায় ভালভাবে অভ্যস্ত না হলে সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি কিছুতেই দূর হবে না। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বারবাব বলেছেন।

'কালান্তর' সঙ্কলনটিতে ১৩২১ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত লেখা প্রধানত রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক লগ্ন পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি রচনার কালগত পরিধি। সমলোচক অধ্যাপক ড রথীন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন—

> 'দীর্ঘ সাতাশ বছরের দেশ ও কালের বিবর্তিত রূপটি কবির পরিশীলিত
> চিন্তার মণিদর্পণে ছায়াপাত করেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি
> এই সঙ্কলনটিতে প্রায় শতবর্ষেব ইতিহাসই রচনা করেছেন।'

কবি ভারতে জন্মেও বিশ্বেব অধিবাসী, স্বদেশকে ভালবাসলেও বিশ্বপ্রেমিক, মানুষের কল্যাণ কামনা করলেও মহামানবের সাধনা তাঁর। স্বদেশের মুক্তি চাইলেও আত্মার মুক্তিই তাঁর কাম্য। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা এবং কাব্যচিন্তা কোথাও পৃথক হয়নি, সেইজন্যই ভারতের পটভূমিতে বিশ্বের বাজনীতি এবং মানবনীতিকে তিনি আলোচনা করেছেন অকুণ্ঠিতভাবে এবং বিশ্বাস রেখেছেন সেই নীতিতে—

> 'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি।।'